সহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ

ওয়া আদিল্লাতুহু ওয়া তাওযীহু মাযাহিবিল আয়িম্মাহ

(বিশুদ্ধ সুন্নাহ সম্বলিত ফিক্বহ ও তার প্রমাণাদি এবং ইমামগণের মতামতের বিশ্লেষণ)

১ম খণ্ড (১ম পর্ব)

মূল : আবূ মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম

আধুনিক ফিক্বহী পর্যালোচনায় :

- শাইখ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী
- শাইখ আবদুল আযীয বিন বায
- শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন

অনুবাদ : মাইনুল ইসলাম (মঈন)
সম্পাদনা : ড.মো: আব্দুর রশিদ

প্রকাশনায় : সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন

সহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ • ১ম খণ্ড (১ম পর্ব)

صَحِيْحُ فِقْهُ السُّنَّةِ

وأدلته و توضيح مذاهب الأئمة

(সহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ওয়া আদিল্লাতুহু ওয়া তাওযীহু মাযাহিবিল আয়িম্মাহ)

বিশুদ্ধ সুন্নাহ সম্বলিত ফিক্বহ ও তার প্রমাণাদি এবং ইমামগণের মতামতের বিশ্লেষণ

১ম খণ্ড-১ম পর্ব (ভূমিকা ও ত্বহারাত অধ্যায়)

লেখক: আবূ মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম

আধুনিক ফিক্বহী পর্যালোচনায়:

- শাইখ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী
- শাইখ আবদুল আযীয বিন বায
- শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন

অনুবাদ: মাইনুল ইসলাম (মঈন)

সম্পাদনা: ড. মো: আব্দুর রশিদ

প্রকাশনায়: সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন

www.waytojannah.com

সহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ

লেখক: আবূ মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম

অনুবাদ:
মাইনুল ইসলাম (মঈন)

সম্পাদনা:
ড. মো: আব্দুর রশিদ
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ,
নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী। ০১৫৫৮৩৪১৮৩৬

প্রকাশনায় :
সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ধারাবারিষা, গুরুদাসপুর, নাটোর। ০১৯১২০০৫১২১

পরিবেশনায়:
ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, রাণী বাজার (মাদরাসা মার্কেটের সামনে)
রাজশাহী। ০১৭৩০৯৩৪৩২৫

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারী ২০১৪ ঈসায়ী।

গ্রন্থস্বত্ব : সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ISBN: 978-984-91018-9-5

মুদ্রণে : দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য: ১৬০ (একশত ষাট) টাকা মাত্র।

"Sahih Fiqhus Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawjihu Majahibil Aimmah" By Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim. Noted By Shaikh Nasiruddin Albani, Shaikh Abdul Aziz Bin Baz, Shaikh Muhammad Bin Salih Al-Osaimin.
Translated by: Mynul Islam (Moin), Edited by: Dr. Md. Abdur Rashid, Published by: Salafi Research Foundation, Mob. 01912005121, mosharrof_bd76@yahoo.com.

www.waytojannah.com

প্রকাশকের নিবেদন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সব রকম প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তার কেউ শরীকও নেই। আর আমরা এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তার দাস এবং তার প্রেরিত রাসূল। অতঃপর বলছি, নিশ্চয়ই সবচেয়ে উত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে সেরা নীতি মুহাম্মাদ (ﷺ) এর রীতি-নীতি। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ নতুন আবিষ্কৃত পথ ও মত। এরূপ প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রান্ত ও সুপথ থেকে বিচ্যুত। আর প্রত্যেক ভ্রান্তিরই অবস্থান জাহান্নাম।

আজকের মুসলিম বিশ্ব যদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ'কে গ্রহণ করে এবং শির্ক, বিদ'আত, ত্বগুত, বাতিল বর্জন করতঃ দীন ইসলামের উপর ঈমান আনে; সকল দল-মত ছিন্ন করে মুসলিম (আত্মসর্মপণকারী), মু'মিন (ঈমানদার), মুত্তাকী (যিনি আল্লাহর আদেশ পালনকারী এবং নিষেধ বর্জনকারী), সবির (ধৈর্যশীল), সলিহ (সৎকর্মশীল), সদিক্ব (সত্যবাদী), মুহসিন (সৎকর্মশীল ও কল্যাণকারী) পরিচয়ে গৌরব বোধ করতঃ মুশরিক, কাফির, যালিম, ফাসিক ও মুনাফিকদের পথ ও পন্থা পরিহার করে; তাহলেই মুসলিম জাতি ফিরে পাবে তাদের হারানো ঐতিহ্য। গঠিত হবে সার্বজনিন বিশ্ব ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। প্রতিষ্ঠিত হবে এক ও অখণ্ডিত মুসলিম সমাজ। এ বইটি মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর *(সূরা নিসা ৪:৫৯)*।

যে সকল দীনি ভাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে গুরুত্বপূর্ণ এ বইটি অনুবাদ, কম্পোজ, সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উত্তম প্রতিদান দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী আনুগত্য করার তাওফীক্ব দিন। আমাদের আত্মা, কথা ও কাজ শুদ্ধ করে দিন। আমাদেরকে বিশ্বাস, কথা ও কাজের ভ্রষ্টতা থেকে পবিত্র করুন। নিশ্চয়ই আপনি উত্তম দানশীল ও করুণাময়। আমীন!

প্রকাশক:

ডা. মো: মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ

নির্বাহী পরিচালক

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন

www.waytojannah.com

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবার পরিজন, বংশধর, সহচরবৃন্দ ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের উপর।

আল্লাহর অসীম দয়ায় সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন আধুনিক কালের প্রখ্যাত ফক্বীহ ও শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ আবূ মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম প্রণীত "صحيح فقه السنه" **(সহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ)** গ্রন্থখানি আরবী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদনা শেষ করে বাংলাভাষী পাঠকগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করতে যাচ্ছে (ফালিল্লাহিল হামদ)।

বইটির পূর্ণাঙ্গ আরবী নাম- "صحيح فقه السنه وأدلته و توضيح مذاهب الأئمة" বাংলায় যার **অর্থ: বিশুদ্ধ** সুন্নাহ সম্বলিত ফিক্বহ ও তার প্রমাণাদি এবং ইমামগণের মতামতের বিশ্লেষণ। বইটির মূল **লেখক আবূ** মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম আধুনিক যুগের একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ। তিনি মিশরের অধিবাসী। মিশরের কতিপয় বিদ্বানের কাছ থেকে তিনি ইলমুল হাদীস ও ফিক্বহের জ্ঞান **অর্জন** করেন। অতঃপর ২০০২ সাল মোতাবেক ১৪২০ হিজরীতে সৌদি আরব গিয়ে নাজদ ও হিজাযের আলিমদের কাছে জ্ঞান চর্চা করেন। তিনি এখনও ফিক্বহ শাস্ত্র ও উসূলে ফিক্বহ এর গবেষণার কাজে ব্রত আছেন। "صحيح فقه السنه" **(সহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ)** তাঁর এ অসামান্য গবেষণারই ফসল।

তিনি শাইখ আল্লামা মুস্তফা আল-আদাবী এর অন্যতম ঘনিষ্ঠ ছাত্র। তার উল্লেখযোগ্য উস্তাদগণ **হলেন:** শাইখ আল্লামা মুস্তফা আল-আদাবী, শাইখ মাজদী আরাফাত ও শাইখ আহমাদ আঈসূরী। এ ছাড়াও তিনি কুয়েত ও সৌদির কতিপয় মাশাইখের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন।

তিনি একজন প্রকৌশলী ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি প্রকৌশল পেশা ত্যাগ করে শারঈ জ্ঞান চর্চায় ব্রত হন। ফিক্বহ ও হাদীস বিষয়ে তার অনেকগুলো গ্রন্থ ও সম্পাদনা রয়েছে। যেমন-

১. صحيح فقه السنه (সহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ)

২. فقه السنة للنساء (ফিক্বহুস সুন্নাহ লিন নিসা)

৩. كتاب في أحكام الجمعة (কিতাবু ফি আহকামিল জুম'আহ)

৪. كتاب في أخطاء النساء (কিতাবু ফি আখতায়িন নিসা)

৫. تحقيق كتاب تعظيم قدر الصلاة (তাহক্বীকু কিতাবি তা'যীমু কদরিস সালাত)

Contents

৬. التعليق على شرح البيقونية للشيخ العثيمين (আত-তা'লীক আলা শারহিল বাইকূনিয়্যাতি লিশ শাইখ আল-উসাইমীন) ও

৭. التعليق على نزهة النظر (আত-তা'লীক আলা নুযহাতিন নযর)।

ফিক্বহ শাস্ত্রের ইতিহাসে "صحيح فقه السنه" **(সহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ)** গ্রন্থটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ যাবত সাধারণত মাযহাব ভিত্তিক ফিক্বহ গ্রন্থাবলি রচিত হয়ে আসছে। কিন্তু এ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য সে সব গ্রন্থ থেকে ভিন্ন ও নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

- এটি কোন মাযহাব ভিত্তিক ফিক্বহ গ্রন্থ নয়।
- এটি দলীল ভিত্তিক ফিক্বহ গ্রন্থ।
- এতে শারঈ বিধি-বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।
- দ্বিতীয়ত রাসূল (ﷺ) এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।
- কখনও আবার সাহাবাদের আসার উল্লেখ করা হয়েছে।
- আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈ মুজতাহিদগণের ব্যাখ্যা ও মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।
- তিনি বিভিন্ন মাযহাব এবং মাযহাবের ইমামদের মতামত উল্লেখ করে অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। (এ গ্রন্থ প্রণয়নের পদ্ধতি নিয়ে লেখক তার ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন)।

আর আমাদের এ অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা লেখকের মূলগ্রন্থ ও গ্রন্থের সমস্ত পাদটীকার অনুবাদ করেছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা অধিকাংশই আক্ষরিক অনুবাদকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেছি।

উল্লেখ্য যে, যাবতীয় ইবাদাত সহীহ দলীল ভিত্তিক হতে হবে। প্রমাণহীন কোন বিষয় পাওয়া গেলে তা সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করতে হবে। কত বড় ইমাম, বিদ্বান, পণ্ডিত বা ফক্বীহ বলেছেন তা দেখার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রমাণহীন কথার কোন মূল্য নেই।
আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۞ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ﴾

'সুতরাং তোমরা যদি না জান তাহলে স্পষ্ট দলীলসহ আহলে যিকিরকে (ওহীর অনুসারী) জিজ্ঞেস কর' *(সূরা নাহল: ৪৩-৪৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা দলীলের ভিত্তিতেই মানুষকে আহ্বান জানাতেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ মুহাদ্দিস ও আলিমগণ দলীলের ভিত্তিতে মানুষকে দীনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

www.waytojannah.com

মূলতঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে মাযহাবগত যে পার্থক্য দেখা যায় তা যঈফ বা দুর্বল, জাল বা বানোয়াট হাদীসের অনুসরণ ও সহীহ হাদীসের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন না করার কারণে। অথচ যাদের নামে মাযহাব সৃষ্টি করা হয়েছে তারা শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস মানার জন্য উপদেশ দিয়ে গেছেন এবং সহীহ হাদীসকে তাদের মাযহাব বলে ঘোষণা করে গেছেন। তারা কস্মিনকালেও তাদের নামে মাযহাব সৃষ্টি করতে বা তাদের তাক্বলীদ করতে বলেন নি। বরং তারা তাদের দলীলবিহীন কথা ও ফাৎওয়াকে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। লেখকের ভূমিকায় এ সম্পর্কে তাদের (ইমামদের) উক্তি ও উপদেশগুলো দেখতে পাবেন।

সার্বিক বিবেচনায় এ গ্রন্থখানা সাধারণ মুসলিম, আহলুল হাদীস, আহলুর রায় এবং বিভিন্ন মাযহাবের মুক্বাল্লিদসহ সকলের অনুসরণযোগ্য এক অসাধারণ গ্রন্থ। ইসলামী শরীয়াতের বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সঠিক অনুসরণের জন্য সকল মুসলিমের গ্রন্থখানা পাঠ করা প্রয়োজন ও প্রত্যেকের ঘরে ঘরে তা থাকা দরকার মনে করছি। আল্লাহ সকলকে গ্রন্থখানা পাঠ করে সঠিকভাবে আমল করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

এ গ্রন্থের অনুবাদ ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি যদি কারও নযরে আসে, তাহলে প্রকাশকের ঠিকানায় লিখিতভাবে কিংবা ফোন করে জানালে পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধন করে দেয়া হবে ইনশা আল্লাহ।

যারা বইটি অনুবাদ করার ব্যাপারে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, তাদের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও একনিষ্ঠ দু'আ কামনা করছি। বিশেষ করে পরম শ্রদ্ধেয় স্যার আবূ তালহা মোহাঃ মনিরুল ইসলাম *(সহকারী অধ্যাপক: আরবী বিভাগ, রাজশাহী কলেজ)*, আমার শ্রদ্ধেয় বড় মামা মাওলানা মোঃ খাইরুল আনাম *(ভাইস প্রিন্সিপাল: জবই সুফিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা, সাপাহার, নওগাঁ)*, মাওলানা মোঃ দুরুল হুদা *(ভাইস প্রিন্সিপাল: ধূরইল ডি.এস. কামিল মাদরাসা, মোহন পুর, রাজশাহী)*, মাওলানা মোঃ শফীকুর রহমান মাদানী ও আমার সহপাঠী বন্ধু আবদুল্লাহ *(বি.অনার্স, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)* এর কথা উল্লেখ করছি (আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন!)।

এ বইয়ের সম্পাদক ড. মোঃ আব্দুর রশিদ স্যারকে (আল্লাহ তার জ্ঞানে, আমলে ও পরিবারে বরকত দান করুন!) শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, যিনি এ অনুবাদটির প্রত্যেকটি বাক্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সম্পাদনা করেছেন। আর এ গ্রন্থের প্রকাশক ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি এ গ্রন্থটি অনুবাদে আমাকে উৎসাহ ও সার্বিক সহযোগিতা দান করেছেন। পরিশেষে এ গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক, পাঠক ও আমাদের পিতা-মাতাসহ সকলের জন্য দু'আ করছি, আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে অশেষ সাওয়াব ও প্রতিদান দান করেন এবং জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করেন-আমীন!।

অনুবাদক:
মাইনুল ইসলাম (মঈন)
Email: mynulislam200@gmail.com
তারিখ: ২১/০১/২০১৪ইং

সম্পাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعَلَى آلِهِ، وأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ তা'আলার জন্য, সালাত ও সালাম রহমাতুল-লিল আলামীন মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে (صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة) গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের (ভূমিকা ও ত্বহারাত অধ্যায়) বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হতে যাচ্ছে। লেখক চার খণ্ডে তাঁর মূল্যবান বইটি সমাপ্ত করেছেন।

প্রথম খণ্ড: ভূমিকা, ত্বহারাত, সালাত ও জানাযা অধ্যায়;
দ্বিতীয় খণ্ড: যাকাত, সিয়াম; হাজ্জ-উমরা, শপথ ও মানত এবং পানাহার সংক্রান্ত অধ্যায়;
তৃতীয় খণ্ড: পোষাক ও সৌন্দর্য, বিবাহ-তালাক এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কিত অধ্যায়;
চতুর্থ খণ্ড: হুদূদ (দণ্ড-বিধি),অপরাধ ও দিয়াত এবং কেনা-বেচা সংক্রান্ত অধ্যায় ।

এ পর্যায়ে আমরা প্রথম খণ্ডের ভূমিকা ও ত্বহারাত অধ্যায়ের অনূদিত অংশ প্রকাশ করতে যাচ্ছি। বাকী অংশ পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

*লেখক এ কিতাবের মাধ্যমে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও মাযহাবের ইমামগণের বক্তব্যের আলোকে- বিভিন্ন মাযহাব ও মতাদর্শের মুসলিমবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মে নিয়ে আসার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

*আমরা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করি এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটি আরও ত্বরান্বিত হবে। ফলে সমাজে বাতিলের স্থলে হক প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। আর বাতিলের যাঁতাকলে পিষ্ঠ মানবতা মুক্তির স্বাদ পাবে ও পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হবে। আমরা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আরও বলতে পারি যে- যারা আল্লাহকে রব, মুহাম্মাদ (ﷺ) কে রাসূল ও ইসলামকে দীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট তারা ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতিসত্তার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

তোমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর এবং তোমরা পৃথক পৃথক হয়ে যেও না। (সূরা আলে-ইমরান:১০৩)

*তবে কেউ দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত পোষণ করলে আমরা সে সব মতামতকেও স্বাগত জানাব। এভাবে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পারিক মহব্বত গড়ে উঠবে। কেননা ইসলামে কিছু কিছু বিষয়ে একাধিক আমল করার সুযোগ আছে। যেমন বিতর সালাত ১ রাকাত বা ৩ রাকাত বা ৫ রাকাত বা ৭ রাকাত বা ৯ রাকাত পড়া যায়। তাকবীরে তাহরীমার পর পঠিত একাধিক সানা সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত- সালাতে যে কোন একটি পড়াই যথেষ্ট। তাই এ ক্ষেত্রে একটি মত সঠিক আর অন্যটি ভুল এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই।

*আমরা পাঠক-পাঠিকাদের সবিনয় অনুরোধ জানাতে চাই, তারা যেন লেখকের কথা ও ভূমিকা অংশ ধৈর্য ধরে পুরোটা পাঠ করেন। লেখক স্বীয় বক্তব্যে ইলমে ফিক্বহের গুরুত্ব, গ্রন্থটি প্রণয়ন পদ্ধতিসহ বেশ

www.waytojannah.com

কিছু বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন। ভূমিকায় ইলমে ফিক্বহের উৎপত্তি বিষয়ে মহানাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর যুগ থেকে শুরু করে সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈর যুগ এবং হিজরী ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শতকের মানুষের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন বিষয়ে ইমামদের মতভেদ, মতভেদের কারণ ও মাযহাব অনুসরণ বিষয়ে ইমামদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও এতে তাক্বলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্যসহ আরও কিছু বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আমরা কিতাবটির ভূমিকাংশে কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াত ও বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করেছি। মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা সেই পুনরাবৃত্তি পরিহার করি নি।

* ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কিত আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। যেখানে মৃত্যুপরবর্তী জীবনের ব্যাপারে পার্থিব কোন বই-পুস্তকে সামান্যতম ধারণাও নেই, সেখানে ইসলাম এর পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেশ করেছে। আমাদের প্রাণ প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) তো ইসরা বা মিরাজের রাতে জান্নাত-জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। ইলমে ফিক্বহ বা ইসলামী আইন শাস্ত্র মানব জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। গ্রন্থকার ত্বহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করা সংক্রান্ত অধ্যায়ে তেমনি মুসলিম জীবনে অতীব প্রয়োজনীয় কিন্তু কিছু লজ্জাজনক মাসআলা-মাসায়েলের আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। যার অনেকটাই রাসূল (ﷺ) ও উম্মুল মু'মিনীনদের জীবন থেকে নেয়া। সাহাবীগণের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় রাসূল (ﷺ) ও উম্মুল মু'মিনীনগণ এ সব মাসআলা-মাসায়েলের সমাধান দিয়েছেন। সঙ্কোচবোধ তাদেরকে সঠিক জ্ঞানার্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি। পরবর্তী কালে ফক্বীহগণ ক্ষেত্রমত এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা আশা করি বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলিম পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ এ আলোচনা হতে যার যার প্রয়োজনীয় অংশ থেকে শিক্ষা নেবেন।

*আমরা মনে করি একবিংশ শতকের শুরুতে প্রকাশিত এই বইটি আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ইলমে ফিক্বহ এর ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন। এ ধরনের মূল্যবান গ্রন্থ ইতিপূর্বে আমাদের নযরে আসে নি। আমাদের জানামতে বইটি বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরাই সর্বপ্রথম প্রয়াস নিয়েছি। এ রকম একটি উঁচু মানের কিতাবের অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজটি যথেষ্ট কঠিন। তদুপরি আল্লাহর অসীম দয়ার উপর ভরসা করে আমরা বইটির অনুবাদ কাজে হাত দেই। অন্যদিকে খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজে কর্মরত শ্রদ্ধেয় ডাক্তার মোঃ মোশাররফ হোসেনের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও অনুবাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডে তার সক্রিয় অংশ গ্রহণ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকলে সাধারণ ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিও কুরআন-সুন্নাহর গবেষণায় অনন্য অবদান রাখতে পারেন ডাক্তার মোঃ মোশাররফ হোসেন তার উজ্জ্বল উপমা। আল্লাহ তার ঈমান-আমলে আরও নিষ্ঠা ও বরকত দান করুন।

*বাংলা অনুবাদ ও কম্পিউটার কম্পোজের কাজটি সম্পন্ন করেছেন- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কৃতি ছাত্র মাইনুল ইসলাম (মঈন)। সম্পাদক হিসাবে আমি অনুবাদ কর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার চেষ্টা করেছি। আমি আরবী টেক্সট সামনে রেখে সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদটি একাধিকবার পাঠ করেছি ও প্রয়োজনমত ব্যাপক সংশোধন করেছি। বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ অবহিত আছেন যে, মূল পাঠের ভাবধারা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অবিকৃত রেখে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের কাজটি বেশ কঠিন। বিজ্ঞ লেখক যেখানে কিতাবের ভূমিকায় ইমাম খত্ত্বাবী, ইমাম গাযালী, ইবনুল কায়্যিম, নাসিরুদ্দীন আলবানীর মত বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের বক্তব্যও উল্লেখ করেছেন।

www.waytojannah.com

Contents

*অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবী শব্দগুলো আমরা যথাসম্ভব অবিকৃত রেখেছি; আর অন্যান্য বাংলা শব্দের বানানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব বাংলা একাডেমী প্রণীত 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'-এর বানান অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।

*কিতাবটি দীনি বিষয় সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ও লেখকের বক্তব্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার আশঙ্কায় আমরা ভাবানুবাদ পরিহার করে মূল টেক্সটের সরাসরি বাংলা অনুবাদ করেছি। আমার দৃষ্টিতে অনুবাদ করতে গিয়ে আলোচ্য কিতাবের কোন অংশই ছাড়া পড়ে নি। যদিও আমাদের দেশের অধিকাংশ অনূদিত পুস্তকে এ সমস্যাটি আমি লক্ষ করেছি।

*অনূদিত এ কিতাবটি যদি পাঠক-পাঠিকাদের নিকট সমাদৃত হয়, তার কৃতিত্ব মহিয়ান আল্লাহ তা'আলার। অনুবাদে কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকলে তা আমাদের ইলম ও যোগ্যতার কমতির কারণেই হয়েছে, আল্লাহ যেন আমাদের এ ধরনের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন। যদি কোন পাঠক এই অনুবাদের ব্যাপারে তথ্যভিত্তিক কোন সংশোধনী বা যে কোন পরামর্শ দিতে চান, তবে তা সাদরে গৃহীত হবে।

*বইটির জটিল স্থানগুলোর অনুবাদের ব্যাপারে আমার শ্রদ্ধাভাজন সহকর্মী জনাব আবূ তালহা মোহাঃ মনিরুল ইসলাম *(সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী কলেজ)* আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বাংলা বানান ও বাক্য বিন্যাসের ব্যাপারে আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী জনাব মোঃ আব্দুল হাই সিদ্দিকী *(সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী)* আমাদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ অনূদিত পাণ্ডুলিপিটি আগা-গোড়া দেখে দিয়েছেন। প্রচ্ছদের ব্যাপারে অমাদের একান্ত সুহৃদ ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ *(সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)* প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমার বিভাগের স্নেহাস্পদ সহকর্মী জনাব মুহাম্মাদ আবূ সালেহ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল্যবান সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমার অপর সহকর্মী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় সাহায্য করায় আমি সবিশেষ উপকৃত হয়েছি। নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ ও সম্মানিত উপাধ্যক্ষ আমাকে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদনের ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সাহায্য করেছেন। এ ছাড়াও বইটি অনুবাদকর্মের বিভিন্ন স্তরে যারা অক্লান্ত শ্রম, মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন, তাদের সকলের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দো-জাহানের কামিয়াবী কামনা করছি।

সর্বোপরি আমাদের পিতা-মাতা, সন্তানাদী, শিক্ষকমণ্ডলী, আত্মীয়-স্বজনসহ সারা বিশ্বের মুসলিম ভাই-বোন যারা ঈমান নিয়ে ইন্তিকাল করেছেন-তাদের সকলের জন্য মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ যেন তাদের জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করেন। আর যারা জীবিত আছেন তাদের সকলের জন্য ইসলামী জিন্দেগী ও ঈমানী মওতের প্রার্থনা করছি। সে সঙ্গে সারা বিশ্বের সকল মানুষের রব মহান আল্লাহর দরবারে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা প্রদানের আকুল আকুতি পেশ করছি।

সম্পাদক:
ড. মো: আব্দুর রশিদ
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ,
নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী। drarasid@gmail.com
২২-০২-২০১৪ ঈসায়ী

www.waytojannah.com

সূচীপত্র

১. আরবী পরিভাষা সমূহ ১৩

ভূমিকা (১৮-৯০)

২. লেখকের ভূমিকা ১৮
বইটির বিন্যাস পদ্ধতি ২২
এ গ্রন্থ প্রণয়ন পদ্ধতি ২৭
৩. ইলমে ফিক্বহ এর উৎপত্তি ৩২
৪. মহানাবী (ﷺ) এর যুগে ফিক্বহ শাস্ত্র ৩২
৫. সাহাবাদের যুগে ফিক্বহ শাস্ত্র ৩৩
সাহাবাদের মতভেদের কারণ ও এর চিত্র ৩৩
৬. তাবেঈদের যুগে ফিক্বহ শাস্ত্র ৩৫
৭. তাবেঈদের পরবর্তী যুগে ফিক্বহ শাস্ত্র ৩৬
৮. আহলুল হাদীস ও আহলুর রা'য় এর মাঝে মতভেদের কারণ ৩৮
৯. ১ম ও ২য় শতাব্দীতে মানুষের অবস্থা ৪৩
১০. ২য় শতাব্দীর পর মুজতাহিদগণের নামে মাযহাব প্রকাশ ৪৩
১১. ৪র্থ শতাব্দীর পর মানুষের মাঝে যা ঘটেছিল ৪৪
১২. সতর্কবাণী:
১ম সতর্কবাণী: কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করা ওয়াজিব ৪৬
২য় সতর্কবাণী: অনুসৃত ইমামদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান ৫৪
দিক নির্দেশনা:
(১) জেনে রাখুন! যে, ইমামগণ (রাহি.) নিষ্পাপ নন ৫৪
(২) গ্রহণযোগ্য ইমামদের কেউ উম্মতের কাছে ব্যাপকভাবে গৃহীত হবেন না ৫৫
(৩) হাদীসের বিরোধিতার ক্ষেত্রে ইমামগণের ওযর তিন ভাগে বিভক্ত ৫৫
(৪) স্পষ্ট দলীলের অনুসরণ ৫৭
(৫) ইমামগণ তাদের তাক্বলীদ না করার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। ৫৮
আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) ৫৯
মালিক বিন আনাস (রাহিমাহুল্লাহ) ৫৯
শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ৬০
আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) ৬১
ইমামগণের অনুসারীগণ কর্তৃক ইমামদের কিছু কথা পরিহারের নমুনা ৬৩
(৬) মুসলিম কি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করতে বাধ্য? ৬৪

www.waytojannah.com

(৭) মুকাল্লিদরা (দলীলবিহীন অনুসরণকারী) দুটি বিষয়ে প্রতারিত হয় ৬৮
(৮) সংশয়: মুজতাহিদ ছাড়া সাধারণ ভাবে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি আমল করা নিষিদ্ধ ৭৩
(৯) সংশয়: জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জেনে থাক এর বাস্তবায়ন: ৭৪
(১০) মুকাল্লিদদের (দলীলবিহীন অনুসরণকারী) তর্ক-বিতর্ক ৭৬
(১১) তাক্বলীদ (দলীলবিহীন অনুসরণ) ও ইত্তেবার (দলীলভিত্তিক অনুসরণ) মধ্যে পার্থক্য ৭৯
(১২) ইমামদের তাক্বলীদকারীদের (দলীলবিহীন অনুসরণকারী) ব্যাপারে সতর্কতা ৮১
(১৩) দলীলের অনুসরণ করার মানে এ নয় যে,
এর দ্বারা ইমামের মতামতের বিরোধিতা করা হলো ৮২
(১৪) মতানৈক্যের মধ্যে কি কোন প্রশস্ততা ও রহমত রয়েছে? ৮৪

কিতাবুত ত্বহারাত (৯১-২৮০)

১৩. ত্বহারাতের পরিচয় ও গুরুত্ব ৯১
১৪. পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব ৯১
১৫. ত্বহারাতের প্রকারভেদ ৯২
১৬. প্রকৃত পবিত্রতার বিবরণ ৯৩
১৭. নাপাকীর (নাজাসাত) প্রকারভেদ ৯৩
১৮. রক্ত কি নাপাক ? ১০২
১৯. নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি ১০৯
২০. নাপাক দূর করার জন্য পানি কি যথেষ্ট ১১২
২১. ইসতিনজা এর পরিচয় এবং তার হুকুম ১১৪
২২. ইসতিনজার কতিপয় বিধিমালা ১১৭
২৩. বহুমূত্র বা এ জাতীয় রোগী কিভাবে ইসতিনজা করবে? ১১৮
২৪. মল-মূত্র ত্যাগের বিধি ১২০
২৫. কোন ব্যক্তির জন্য কি দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয? ১২৪
২৬. স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ ১২৬
২৭. খাতনা করা ১২৭
২৮. মিসওয়াকের পরিচয় এবং শরীয়াতে এর বিধান ১৩০
২৯. যে সময় মিসওয়াক করা উত্তম ১৩০
৩০. দাড়ি লম্বা করা ১৩২
৩১. ত্বহারাতে হুকমিয়্যাহ বা বিধানগত পবিত্রতার বর্ণনা ১৩৪
৩২. ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ঝরে পড়া পানি দ্বারা ওযূ করার বিধান ১৩৫

৩৩.মহিলাদের ব্যবহার করা অতিরিক্ত পানি দিয়ে পুরুষদের গোসল করা বৈধ কিনা ১৩৭
৩৪.ওযূর সংজ্ঞা ও এর শারঈ প্রমাণ ১৩৯
৩৫.ওযূর ফযীলত ১৪০
৩৬.সংক্ষিপ্তভাবে ওযূর পূর্ণাঙ্গ নিয়মাবলী ১৪৪
৩৭.ওযূর রুকনসমূহ ১৪৭
৩৮.ওযূর সুন্নাতসমূহ ১৫৯
৩৯.ওযূ ভঙ্গের কারণ সমূহ ১৬৫
৪০.যে সকল কাজে ওযূ নষ্ট হয় না ১৭৯
৪১.যে সমস্ত কাজে ওযূ করা মুস্তাহাব ১৮৯
৪২.মোজার উপর মাসাহ করা ১৯২
৪৩.যে কারণে মোজার উপর মাসাহ করার বিধান বাতিল হবে ১৯৯
৪৪.জাওরাব ও জুতার উপর মাসাহ প্রসঙ্গে ২০১
৪৫.জাওরাবের উপর মাসাহ ২০১
৪৬.জুতার উপর মাসাহ ২০৩
৪৭.মাথার আবরণীর উপর মাসাহ (পাগড়ী, ঘোমটা, টুপি, ব্যান্ডেজ) ২০৪
৪৮.যে সব কারণে গোসল ওয়াজিব হয় ২০৮
৪৯.মুস্তাহাব গোসল ২১৮
৫০.গোসলের মুস্তাহাবসমূহ (পূর্ণাঙ্গ গোসলের বিবরণ) ২২১
৫১.গোসল সংক্রান্ত কতিপয় মাসায়েল ২৩৩
৫২.জানাবাত সংক্রান্ত মাসায়েল ২৩৬
৫৩.তায়াম্মুম ২৪৩
৫৪.শরীয়াতে তায়াম্মুমের বৈধতা ২৪৩
৫৫.যে সব অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ ২৪৫
৫৬.তায়াম্মুমের বিশুদ্ধ পদ্ধতি ২৬১
৫৭.তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ ও তায়াম্মুমের সাথে সংশ্লিষ্ট মাসায়েল ২৬৩
৫৮.হায়য ও নিফাস প্রসঙ্গ ২৬৬
৫৯.হায়য ও নিফাস অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ ২৬৯
৬০.হায়য অবস্থায় যেসব কাজ বৈধ ২৭৪
৬১.নিফাস বা প্রসবোত্তর রক্তস্রাব ২৭৬
৬২.ইস্তিহাযা বা রোগজনিত রক্তস্রাব ২৭৭
৬৩.ইস্তিহাযার বিধান ২৭৯

আরবী পরিভাষা সমূহ

[বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থে অত্র কিতাবে ব্যবহৃত নিম্নোক্ত আরবী পরিভাষা সমূহ আমরা অতিরিক্ত সংযোজন করেছি, যা মূল কিতাবের অংশ নয়।]

হাদীসের পরিচয়

হাদীস (حَدِيْث) এর শাব্দিক অর্থঃ নতুন, প্রাচীন ও পুরাতন এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যে সব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে তাই হাদীস। এর আরেক অর্থ হলোঃ কথা। ফক্বীহগণের পরিভাষায় নাবী কারীম (ﷺ) আল্লাহর রাসূল হিসেবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীস বলা হয়। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তার গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অর্ন্তভুক্ত করেন। এ হিসেবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

১। **ক্বওলী হাদীসঃ** কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা বিবৃত হয়েছে তাকে ক্বওলী (বাণী সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয়।

২। **ফে'লী হাদীসঃ** মহানাবী (ﷺ)-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্ম সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয়।

৩। **তাকরীরী হাদীসঃ** সাহাবীগণের যে সব কথা বা কাজ নাবী কারীম (ﷺ)-এর অনুমোদন ও সমর্থন প্রাপ্ত হয়েছে, সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থন মূলক) হাদীস বলে।

সুন্নাহ (السنة): হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ্ (السنة) সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি নাবী কারীম (ﷺ) অবলম্বন করতেন তাকে সুন্নাত বলা হয়। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই সুন্নাত। কুরআন মাজিদে মহত্তম ও সুন্দরতম আদর্শ (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে।

খবর (خبر): হাদীসকে আরবী ভাষায় খবরও (خبر) বলা হয়। তবে খবর শব্দটি হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিকেই বুঝায়।

আসার (أثر): আসার শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর হাদীসকে নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আসার এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে- সাহাবীগণ থেকে শরীয়াত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে আসার বলে।

সাহাবী (صحابى): যিনি ঈমানের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবী বলা হয়।

তাবেঈ (تابعى) : যিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবেঈ বলা হয়।

তাবে-তাবেঈ (تابع تابعى) : যিনি কোন তাবেঈ এর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবে-তাবেঈ বলা হয়।

মুহাদ্দিস (محدث) : যিনি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলা হয়।

শাইখ (شيخ) : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শাইখ বলা হয়।

শাইখান (شيخان) : সাহাবীগনের মধ্যে আবূ বকর (رضي الله عنه) ও উমর (رضي الله عنه)– কে একত্রে শাইখান বলা হয়। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী (রাহি.) ও ইমাম মুসলিম (রাহি.)-কে এবং ফিক্বহ-এর পরিভাষায় ইমাম আবূ হানীফা (রাহি.) ও আবূ ইউসুফ (রাহি.)-কে একত্রে শাইখান বলা হয়।

হাফিয (حافظ) : যিনি সনদ ও মতনের বৃত্তান্ত সহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাফিয বলা হয়।

হুজ্জাত (حجة) : অনুরূপভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত বলা হয়।

হাকিম (حاكم) : যিনি সব হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হাকিম বলা হয়।

রিজাল (رجال) : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর-রিজাল বলা হয়।

রিওয়ায়াত (رواية): হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন- এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ (سند): হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সনদ বলা হয়। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন (متن): হাদীসে মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন বলে।

মারফূ (مرفوع): যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফূ হাদীস বলে।

মাওকূফ (موقوف) : যে হাদীসের বর্ণনা- সূত্র উর্ধ্ব দিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে। অর্থাৎ কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদনকে মাওকূফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আসার।

মাকতূ (مقطوع): যে হাদীসের সনদ কোন তাবেঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতূ হাদীস বলা হয়।

তা'লীক (تعليق): কোন কোন গ্রন্থকার হাদীসের পূর্ণ সনদ বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক বলা হয়।

মুদাল্লাস (مدلس): যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শাইখের (উস্‌তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শাইখের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শাইখের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তাঁর নিকট সেই হাদীস শুনেন নি– সে হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এইরূপ করাকে 'তাদ্‌লীস' আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লীস বলা হয়।

মুযতারাব (مضطرب): যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন ও সনদকে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব বলা হয়। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই হাদীসের ব্যাপারে অপেক্ষা করতে হবে অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদ্‌রাজ (مدرج): যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন, সে হাদীসকে মুদ্‌রাজ এবং এইরূপ করাকে 'ইদরাজ' বলা হয়।

মুত্তাসিল (متصل): যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়ে নি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুনকাতি (منقطع): যে হাদীসের সনদে ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নি, মাঝখানে কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি হাদীস, আর এই বাদ পড়াকে ইনকিতা বলা হয়।

মুরসাল (مرسل): যে হাদীসের সনদে ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবেঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

মু'আল্লাক (معلق): সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'আল্লাক হাদীস বলা হয়।

মু'দাল (معضل): যে হাদীসে দুই বা ততোধিক রাবী ক্রমান্বয়ে সনদ থেকে বাদ পড়েছে তাকে মু'দাল হাদীস বলে।

মুতাবি ও শাহিদ (متابع و شاهد): এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম রাবীর হাদীসের মুতাবি বলা হয়। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি না হয় তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবা'আত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মা'রূফ ও মুনকার (معروف و منكر): কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন মাকবূল (গ্রহণযোগ্য) রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে তাকে মুনকার বলা হয় এবং মাকবূল রাবীর হাদীসকে মা'রূফ বলা হয়।

সহীহ (صحيح) : যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবত (ধারণ ক্ষমতা) গুণ সম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটি ও শায মুক্ত তাকে সহীহ হাদীস বলে।

হাসান (حسن) : যে হাদীসের মধ্যে রাবীর যাবত (ধারণ ক্ষমতা) এর গুণ ব্যতীত সহীহ হাদীসের সমস্ত শর্তই পরিপূর্ণ রয়েছে তাকে হাসান হাদীস বলা হয়। ফক্বীহগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে শরীয়াতের বিধান নির্ধারণ করেন।

যঈফ (ضعيف) : যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যঈফ হাদীস বলে।

মাওযূ' (موضوع) : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা কথা রটনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' হাদীস বলে।

রাবীর সংখ্যা বিচারে হাদীস প্রধানত দু'প্রকার। যথা: ১. মুতওয়াতির (متواتر) ও ২. আহাদ (أحاد)।

১. মুতওয়াতির (متواتر): বৃহৎ সংখ্যক রাবীর বর্ণিত হাদীস, মিথ্যার ব্যাপারে যাদের উপর একাট্টা হওয়া অসম্ভব, সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ সংখ্যা বিদ্যমান থাকলে হাদীসকে মুতওয়াতির (متواتر) বলা হয়।

২. আহাদ (أحاد): أحاد তিন প্রকার। যথা:

মাশহুর (مشهور): যে কোন স্তরে হাদীস বর্ণনা কারীর সংখ্যা যদি দুই এর অধিক হয়, কিন্তু মুতওয়াতির এর পর্যায়ে পৌঁছে না তাকে মাশহুর (مشهور) বলে।

আযীয (عزيز): যে কোন স্তরে হাদীস বর্ণনা কারীর সংখ্যা যদি দু'জন হয় ।

গরীব (غريب): যে কোন স্তরে হাদীস বর্ণনা কারীর সংখ্যা যদি একজন হয় ।

শায (شاذ): একাধিক নির্ভযোগ্য রাবীর বিপরীত একজন নির্ভযোগ্য রাবীর বর্ণনাকে শায হাদীস বলে।

কিয়াস (قياس): অর্থ অনুমান, পরিমাপ, তুলনা ইত্যাদি। পরিভাষায়: শাখাকে মূলের সঙ্গে তুলনা করা, যার ফলে শাখা ও মূল একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

তাক্বলীদ (تقليد): দলীল উল্লেখ ছাড়াই কোন ব্যক্তির মতামতকে গ্রহণ করা।

ইজতিহাদ (اجتهاد): উদ্দিষ্ট জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা চালানোকে ইজতিহাদ বলে।

শরীয়াত (شريعة): অর্থ: আইন, বিধান, পথ, পন্থা ইত্যাদি। পরিভাষায়: মহান আল্লাহ স্বীয় দীন হতে বান্দার জন্য যা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন তাকে শরীয়াত বলে।

Contents

মাযহাব (مذهب): অর্থ- মত, পথ, মতবাদ ইত্যাদি। ফিক্বহী পরিভাষায়: ইবাদাত ও মু'আমালাতের ক্ষেত্রে শারঈ হুকুম পালনের জন্য বান্দা যে পথ অনুসরণ করে এবং প্রত্যেক দলের জন্য একজন ইমামের উপর অথবা ইমামের ওসীয়ত কিংবা ইমামের প্রতিনিধির উপর নির্ভর করে তাকে মাযহাব বলে।

নাযর (نظر): কোন বিষয়ে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চিন্তা-ভাবনা করাকে নাযর বলে।

আম (عام): সীমাবদ্ধ করা ছাড়াই যা দুই বা ততোধিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে তাকে আম বলে।

খাস (خاص): আম এর বিপরীত, যা নির্দিষ্ট বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইজমা (اجماع): কোন এক যুগে আলিমদের কোন শারঈ বিষয়ের উপর এক মত পোষণ করাকে ইজমা বলে।

মুসনাদ (مسند): যার সনদগুলো পরস্পর এমনভাবে মিলিত যে, প্রত্যেকের বর্ণনা সুস্পষ্ট।

ফিক্বহ (فقه): ইজতিহাদ বা গবেষণার পদ্ধতিতে শারঈ হুকুম সম্পর্কে জানার বিধানকে ফিক্বহ বলে।

আসল বা মূল (اصل): এমন প্রথম বিষয়, যার উপর ভিত্তি করে কোন কিছু গড়ে উঠে। যেমন- দেয়ালের ভিত্তি।

ফারা বা শাখা (فرع): আসলের বিপরীত যা কোন ভিত্তির উপর গড়ে উঠে।

ওয়াজিব (واجب): যা আমল করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে আর পরিত্যাগ করলে শাস্তি পাওয়া যাবে।

মানদূব (مندوب): যা আমল করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে আর পরিত্যাগ করলে শাস্তি হবে না।

মাহযূর (محظور): যা পরিত্যাগ করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে আর আমল করলে শাস্তি পাওয়া যাবে।

মাকরূহ (مكروه): যা পরিত্যাগ করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে আর আমল করলে শাস্তি হবে না।

ফাৎওয়া (فتوى): জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির নিকট থেকে দলীল ভিত্তিক শারঈ হুকুম সুস্পষ্ট বর্ণনা করে নেয়াকে ফাৎওয়া বলে।

নাসিখ (ناسخ): পরিবর্তিত শারঈ দলীল যা পূববর্তী শারঈ হুকুমকে রহিত করে দেয় তাকে নাসিখ বলে।

মানসূখ (منسوخ): আর যে হুকুমটি রহিত হয়ে যায় সেটাই মানসূখ।

মুতলাক্ব (مطلق): যা প্রকৃতিগত দিক থেকে জাতির সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে কিন্তু অনির্দিষ্টভাবে একটি অর্থকে বুঝায়।

মুকাইয়্যাদ (مقيد): যা মুতলাক্বের বিপরীত অর্থাৎ জাতির সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে না। বরং নির্দিষ্ট একটি অর্থকে বুঝায়।

হাক্বীকাত (حقيقة): শব্দকে আসল অর্থে ব্যবহার করাকে হাক্বীকত বলে। যেমন- সিংহ শব্দটি এক প্রজাতির হিংস্র প্রাণীকে বুঝায়।

মাজায (مجاز): শব্দ যখন আসল অর্থকে অতিক্রম করে তার সাথে সাদৃশ্য রাখে এমন অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে মাজায বলে। যেমন- সাহসী লোককে সিংহের সাথে তুলনা করা।

www.waytojannah.com

লেখকের ভূমিকা (مقدمة المؤلف)

الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى وآله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليمًا كثيرًا.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আসমান ও জমীনে তাঁর কোন শরীক নেই । আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং তার পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ নাবী। তাঁর (মুহাম্মাদ ﷺ) উপর, তাঁর পরিবার বর্গের উপর এবং তাঁর সকল সাহাবার উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত সদা-সর্বদা অজস্র সালাম ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক।

অতঃপর সমস্ত মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত শারঈ জ্ঞান এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে ইসলামী সাধারণ পণ্ডিতগণ তাদের রচনাবলীর প্রারম্ভে ও মূল্যবান গ্রন্থাবলিতে একটি রীতির প্রচলন করেছেন যে, "জ্ঞানের মর্যাদা অর্জিত জ্ঞানের মর্যাদার উপর নির্ভরশীল এবং তার ঐতিহ্যের মান-মর্যাদা তার শাখার উপর প্রভাব বিস্তার করে"।

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিদ্বানদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কল্যাণময় ও উপকারী জ্ঞান হলো: বান্দার কর্মের বিধি-বিধান সম্পর্কীয় জ্ঞান। যা পরবর্তীতে **"ফিক্বহুল ইসলামী"** বা ইসলামী জ্ঞান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।
[আল্লাহ তা'আলার বাণী এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত বহন করছে:

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান (ফিক্বহ) আহরণ করতে পারে এবং তারা যখন আপন সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ) থেকে বেঁচে থাকে *(সূরা আত-তাওবা:১২২)*]।
মহানাবী (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ بِالدِّينِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের প্রজ্ঞা (ফিক্বহ) দান করেন"।[১] এমন কি নাবীগৃহে পালিত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর জন্য দীনের ফক্বীহ হওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে দু'আ করে তিনি বলেছিলেন:

"اللهم فقهه فى الدين و علمه التأويل"

"হে আল্লাহ! আপনি তাকে দীনের প্রজ্ঞা দান করুন ও ব্যাখ্যা করার জ্ঞান দান করুন" (*মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল ২৩৯৭, সহীহ*)। ফলে মহানাবী (ﷺ) এর দু'আর বরকতে তিনি কুরআনের

[১] মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী ৭১, মুসলিম ১০৩৭ মু'আবিয়াহ বর্ণিত হাদীস।

Contents

মুফাস্‌সির, উম্মতের মধ্যে পণ্ডিত ব্যক্তি ও জ্ঞানের সাগর হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তার এ খ্যাতি অব্যাহত আছে, কখনও তা নিঃশেষ হবে না।

"ফিক্বহুল ইসলামী" বা ইসলামী জ্ঞানের মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না এবং একে সীমাবদ্ধ করাও সম্ভব নয়। কেননা-

ক। এ জ্ঞানের বিধানগুলো একজন মুসলিমের জীবন চলার সাথে সম্পৃক্ত। যা তার মাঝে ও তার প্রভুর মাঝে এবং তার মাঝে ও আল্লাহর অন্যান্য বান্দার মাঝে সম্পর্ক তৈরি করে। সুতরাং এর দ্বারা বান্দা তার প্রভুর সাথে প্রকাশ্যে ও গোপনে সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচনা করতে পারে। আর এ সম্পর্ক গড়ে উঠে ত্বহারাত, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জসহ অন্যান্য ইবাদাত সম্পাদনের মাধ্যমে।

খ। এ জ্ঞানের মাধ্যমে ইসলামের পতাকা বিস্তার করা সম্ভব হয় ও কুরআনের নিদর্শন সমুন্নত হয়। আর এটা জিহাদ, মাগাযী, জীবন-কাহিনী, নিরাপত্তা, চুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়।

গ। এ জ্ঞানের মাধ্যমে বৈধ রিযিক অন্বেষণ করা যায় এবং পাপ ও অপরাধের গণ্ডি থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়। এটা ক্রয়-বিক্রয়, পছন্দের স্বাধীনতা (খিয়ার), সুদ, খরচ করা ও এ সংক্রান্ত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়, যা একে অপরের অর্থনৈতিক লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত।

ঘ। এ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে শরীয়াত মোতাবেক সম্পদ হস্তান্তর; যেমন- ওয়াকফ্, ওসীয়াত ও অনুরূপ অর্থনৈতিক বিধি-বিধান সম্পর্কে জানা যায়।

ঙ। এ জ্ঞানের মাধ্যমে উত্তরাধিকার বন্টন আইনের (ফারায়েজ) সঠিক বিধান জানা যায়। ফলে উক্ত জ্ঞানার্জনকারী অর্ধেক জ্ঞানার্জনের সৌভাগ্য অর্জন করে। এর ফলে সুশৃঙ্খলভাবে ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে যথাযথ মালিকের কাছে সম্পদ অর্পণ করা সম্ভব হয়।

চ। এ জ্ঞানের মাধ্যমে শারঈ দাম্পত্য জীবন ও ত্বালাকসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে সুখী জীবন-যাপন করা যায়।

ছ। এ জ্ঞানের মাধ্যমে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত জরূরী বিষয় সমূহ যেমন অপরাধ, রক্তপণ, দণ্ড-লঘুদণ্ডসহ প্রভৃতি বিধানের ব্যাপারে ইসলামে নিরাপত্তার যে গুরুত্ব রয়েছে তা জানা যায়। ফলে নিরাপদ ও আরাম আয়েশে জীবন যাপন করা সম্ভব হয়।

জ। অনুরূপভাবে খাদ্য, কুরবানী, মানত (নযর) ও শপথের বিধান জানা যাবে এবং ন্যায়-পরায়ণতার ভিত্তিতে ও দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিচার-ফায়সালা, তার নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি ও বিধানের বর্ণনা জানা যাবে। ফলে উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে তার অধিকার পৌঁছানো যাবে ও ছিনিয়ে নেয়া বস্তু তার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

এ সমস্ত মূল্যবান নিয়ামতের কারণে আলিমগণ ফিক্বহুল ইসলামী লেখার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ফলে তারা অসংখ্য নিয়ম-নীতি তৈরি করেছেন। আর বহু খণ্ডে বিভক্ত হাজার হাজার গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

www.waytojannah.com

এ সমস্ত মহামতি বিদ্বানগণ বিভিন্ন শ্রেণীর ফিক্বহ গ্রন্থ রচনা এবং তাদের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। ফলে তাদের স্বীয় বোধগম্যতার প্রতি টান থাকার কারণে ও তাদের ঝোঁক প্রবণতায় ভিন্নতা থাকার কারণে তাদের প্রণীত গ্রন্থগুলোর মাঝে মতানৈক্য তৈরি হয়েছে।

তাই কেউ স্বীয় মাযহাবের গণ্ডির মধ্যে থেকে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং তাতে অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করেছেন। কেউ আবার বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত ফিক্বহী মাযহাব সমূহের গণ্ডির মধ্যে থেকে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে কেউ আবার বিতর্কিত মাসআলাগুলোর দলীলসমূহ ও দলীল গ্রহণের পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ করেছেন।

তাদের মধ্যে একদল হলেন অগ্রগামী। যারা ইজতিহাদ, বিশ্লেষণ ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ফলে মহানাবী (ﷺ) এর সমস্ত সুনানের দলীলের আলোকে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ জন্য তারা নবুওয়াতের দীপাধার হতে দলীল গ্রহণ করে সামনে পথ চলেছেন। সুনানের বাহন যে দিকে গেছে তারাও সে দিকে ভ্রমণ করেছেন। সুনান যে পথের অভিমুখী হয়েছে তারাও সে পথের অভিমুখী হয়েছেন। এর ফলে তারা সঞ্চিত জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যা সর্বোত্তম নিয়ম-কানুন ও হিদায়াতমূলক রীতির উপর গড়ে উঠেছে।

এ প্রকার ফিক্বহ হল মহানাবী (ﷺ) এর সাহাবাদের পক্ষ থেকে চলে আসা মূল ফিক্বহ। সাহাবাগণ এটাকে তাবেঈদের কাছে সঠিক ভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে তাদের পরবর্তী তাবে-তাবেঈনগণ তাদের কাছ থেকে তা ভালভাবে গ্রহণ করেছেন। ফলে তারা এই উত্তম রীতিতে ও সঠিক পন্থায় গ্রন্থ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন।[২]

এ প্রকার দীনি ফিক্বহের ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিম তার 'তাহযীবু সুনান' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন:[৩]

"যে বিষয়ের প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় এবং যে বিষয়টির সর্বোত্তম লক্ষ্য হাসিলের জন্য প্রতিযোগীগণ প্রতিযোগিতা করেছেন, প্রতিদ্বন্দ্বীগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ও কর্মঠগণ যা উদ্ধারের পিছনে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন, তা হলো শেষ নাবী ও সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল (ﷺ) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান। রাসূল (ﷺ) এর অনুসরণ ছাড়া কেউ নাজাত পাবে না। তার সাথে সম্পৃক্ততা ছাড়া কেউ উভয় জগতে সফলকাম হতে পারবে না। যে ব্যক্তি তার আদর্শ গ্রহণে ধন্য হয়েছে সে মুক্তি পেয়েছে ও সফলতা অর্জন করেছে। যে তাঁর থেকে বিমুখ হয়েছে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হয়েছে। কেননা সৌভাগ্যের পরশ তাঁকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ঈমানের কেন্দ্র তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। সুতরাং তাঁকে ছাড়া আল্লাহর নিকটে পৌঁছা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়। তাঁকে (রাসূল ﷺ) ছাড়া হিদায়াত অন্বেষণ করা মানে স্বয়ং পথ ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলার কাছে পৌঁছানোর জন্য তিনি (আল্লাহ) যে পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সে পথ ব্যতীত কিভাবে

---

[২] প্রতিষ্ঠিত ফিক্বহ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন!' ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন' (১/৫-৬ ও তার পরবর্তী অংশ) এবং আল হাযবী প্রণীত, 'আল-ফিক্বরুস সামী ফী তারীখিল ফিক্বহিল ইসলামী'।

[৩] দেখুন! 'তাহযীবু সুনানি আবি দাউদ' (১/৫-৭), আনসারুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ প্রেস, মিশর কর্তৃক ১৩৬৭ হিঃ সনে মুদ্রিত। শাইখ আহমাদ শাকির ও মুহাম্মাদুল ফিক্বহীর দ্বারা তাহক্বীককৃত। ইবনে হাযাম (রাহি) প্রণীত 'আহকাম' গ্রন্থে (১/১০৩,১২৫) এরূপ ভাবার্থে বর্ণিত হয়েছে।

Contents

তার কাছে পৌঁছানো সম্ভব? যে ব্যক্তি এ পথে চলতে চায়, তার জন্য এটা পথ প্রদর্শক। আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ) কে এ পথের আহ্বানকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁকে এ পথের প্রত্যেকটি প্রবেশদ্বারে আহ্বায়ক ও হিদায়াতকারী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। আর এ পথেই হিদায়াত রয়েছে। সুতরাং যে এ পথ ভিন্ন অন্য পথে চলতে চায় তার জন্য হিদায়াতের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং সে আল্লাহর হিদায়াত ও সৌভাগ্যের পথ থেকে বঞ্চিত হবে। বরং যখনই অতিরিক্ত ইজতিহাদের প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে তখন আল্লাহর পথ থেকে পলায়নপরতা ও দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে। এর কারণ হলো: সে সরল-সঠিক পথে চলা থেকে বিরত থেকেছে। যথার্থ রীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মানুষের অভিমতকে মেনে নিয়েছে। বেশি তর্ক করার মাধ্যমে নিজেকে সন্তুষ্ট রেখেছে। চিরস্থায়ী ভাবে তাক্বলীদের পথকে বেছে নিয়েছে। অন্যান্য তাক্বলীদকারী বান্দাদের পরিবারভুক্ত হয়ে থাকাকে পছন্দ করেছে। ইলমের সোজা রাস্তায় সে চলতে পারে নি। জ্ঞান-সোপানের মর্যাদায় সে আরোহণ করতে পারে নি। তার অন্তরে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয় নি। তার হৃদয় জ্ঞানের বাগিচায় ভ্রমণ করে নি। বরং সে এমন ওলান থেকে দুধ পান করেছে যেটা সতীত্বের দিক দিয়ে পবিত্র নয়। সে লবণাক্ত পানশালায় নেমে তার হৃদয় ও জিহ্বা দিয়ে পানশালার পানি ঘোলাটে করে ফেলেছে।

এ অশুভ পরিণতি থেকে লজ্জাস্থান, জীবন ও ধন-সম্পদ মহান আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ চাচ্ছে যিনি হালাল-হারামের বিধান দাতা এবং অধিকারসমূহ শরীয়াত ও বিধান দাতার (আল্লাহ) কাছে উদ্ধার কামনা করছে। অতএব যে নিজেকে সৌভাগ্যবান করতে আগ্রহী এবং যার অন্তর সচেতন ও জাগ্রত, তার উচিত- ঐ বিষয়ে সাহায্য করার প্রয়াস চালানো হতে বিরত থাকা, যা তার কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। আর দুনিয়াবী জীবনে যাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে অথচ তারা ধারণা করছে তারা সঠিক কাজই করছে, তাদের পথ থেকেও তার বিরত থাকা উচিত। কেননা আল্লাহ এমন একটি দিনের ব্যবস্থা রেখেছেন যে দিন বাতিলপন্থিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং হক্বপন্থিরা লাভবান হবেন।

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾

অর্থাৎ: আর সে দিন যালিম ব্যক্তি নিজের হাত দুটো কামড়িয়ে বলবে– 'হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সঠিক পথ অবলম্বন করতাম' *(সূরা : ফুরকান-২৭)* ।

﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾

স্মরণ কর, যে দিন আমি প্রত্যেক মানুষকে তাদের ইমামসহ ডাকব। অতঃপর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হবে না *(সূরা : আল-ইসরা-৭১)*।

সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) ছাড়া অন্যকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাঁর সুন্নাতকে পিছনে ফেলে রেখেছে এবং তার চোখের সামনে মানুষের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়েছে, সে অচিরেই বুঝতে পারবে যে, ক্বিয়ামতের দিন সে কোন মালপত্র হারিয়েছে এবং আমলনামা ওযনের সময় সে বুঝতে পারবে যে, কতটুকু মূল্যবান বস্তু অথবা ভোগ-বিলাসের নিকৃষ্ট বস্তু সে উপস্থিত করেছে"।[৪]

[৪] 'তাক্বরীবু উলূমি ইবনিল কাইয়্যিম' গ্রন্থে (পৃ:১০-১৪) আল্লামা বাকর আবি যায়দ (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) এর ভূমিকা হতে গৃহীত।

www.waytojannah.com

এ থেকেই আমার পছন্দের বিন্যাস অনুযায়ী ফিক্বহের অধ্যায়সমূহ সংকলন করার সুদৃঢ় ইচ্ছা ও কল্পনা মনে উদয় হয়েছে।[৫] এই আশা করে যে, যেন আমি দীনি ফিক্বহের ক্ষেত্রে কল্যাণ পেতে পারি।

আমাকে তিনটি কারণ বইটিকে এ পদ্ধতিতে ও বিন্যাসে সাজাতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রথমত: পুরাতন ফিক্বহ শাস্ত্রগুলোর কিছু নেতিবাচক মনোভাব। সেটা গঠনগত দিক থেকে হতে পারে কিংবা বিষয়বস্তুগত দিক থেকে হতে পারে:[৬]

ক। গঠনগত, বিন্যাসগত ও অধ্যায়গত দিকগুলো হলো: এ সমস্ত কিতাবের মধ্যে কিছু কিতাবের বিষয়বস্তুগুলো এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে, একটি বিষয় অন্যটির মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে কাঙ্ক্ষিত মাসআলাটি উদ্‌ঘাটন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমন কি বিশেষজ্ঞদের কাছেও এটা দুষ্কর হয়ে যায়। বিশেষ করে এ সমস্ত কিতাবে বিষয়ভিত্তিক কোন সূচিপত্র উল্লেখ করা হয় নি, যা উল্লেখ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গবেষকদের কাছে সহজ সাধ্য হত।

আরেকটি হলো: পদ্ধতিগত দিক। যদিও এ সমস্ত গ্রন্থের পদ্ধতি ও রীতিগুলো তৎকালীন যুগের জন্য উপযুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে তা বুঝা অনেক কঠিন। সংক্ষিপ্ত ইবারত ও দীর্ঘ কথাকে স্বল্প কথার মাধ্যমে সংক্ষেপ করণের রীতি এ সব গ্রন্থে লক্ষণীয়। ফলে তা দুর্বোধ্যতা ও দুর্বলতার দিকে নিয়ে যায়। এ ত্রুটিগুলো মতন তথা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায় যা ব্যাপকভাবে পরবর্তী মনীষীগণের মাধ্যমে সংকলিত হয়েছে। আর এগুলোই পাঠক ও ফিক্বহ বিশেষজ্ঞদের নিকট উত্তম গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

এ গ্রন্থগুলোর আরেকটি দিক হলো: এগুলোতে ঐতিহাসিক প্রমাণ বহন করে এমন পরিভাষাগত বাক্যের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য সে সময়ের মানুষ ছাড়া আর অন্য কেউ বুঝে না।

খ। বিষয়বস্তুগত দিক থেকে যে নেতিবাচক দিক রয়েছে তা হলো: এ গ্রন্থগুলোর কিছু কিছু গ্রন্থ সমসাময়িক যুগের বিশেষ প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতির আলোকে লেখা হয়েছে। যা শুধু সে যুগে উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধান দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী যুগে নতুন আরেকটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

যেমন এ কিতাবগুলোর কিছু কিতাব (বিশেষ করে পরবর্তী যুগে) মাযহাব প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে, যেখানে কোন উপযুক্ত দলীল পেশ করা হয় নি এবং মাসআলাগুলোকে একটি অপরটির সাথে তুলনা করা হয় নি অথবা প্রাধান্যও দেয়া হয় নি।

তদুপরি, অধিকাংশ মাযহাবী গ্রন্থগুলো মাযহাব প্রীতির রোগে আক্রান্ত হয়েছে যা ক্রোধের সৃষ্টি করে। এ সব গ্রন্থে সাধারণত মাযহাবকে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। হয়তো বা এ স্বজনপ্রীতিটা ইমামের কোন বক্তব্যের কারণেই অথবা ইমামের অনুসারী ও ছাত্রের বাড়াবাড়ীর কারণেই

---

[৫] ইনশা আল্লাহ অতি সত্বর আমি আমার গ্রন্থ প্রণয়নের পদ্ধতি আলোচনা করব।

[৬] শাইখ সুলাইমান আল আওদাহ (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) প্রণীত 'যওয়াবিতু লিদ্দিরাসাতিল ফিক্বহিয়্যাহ' পৃ:৩৩-৩৮, সামান্য পরিবর্তন করে।

www.waytojannah.com

Contents

হয়েছে। কিংবা সে মাযহাবের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পছন্দনীয় বিষয়ের কারণেই হয়েছে অথবা এ সমস্ত মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থের কারণে হয়েছে। এছাড়াও এসব গ্রন্থে অধিকহারে জাল-যঈফ হাদীসের ছড়া-ছড়ি হয়েছে। এ সব দুর্বলতার দিকে কোন ইঙ্গিত দেয়া হয় নি।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক ফিক্বহ শাস্ত্রে অনেক নেতিবাচক দিক লক্ষ করা যায়ঃ

বর্তমান যুগের গ্রন্থগুলো যদিও উত্তম বিন্যাসে বিন্যাসিত ও যুগোপযোগী, গবেষক ও সাধারণ পাঠকের কাছে খুবই প্রিয় এবং যদিও এ সব গ্রন্থে মাযহাব প্রীতির প্রভাব পড়ে নি, তবুও এ সব গ্রন্থে অসংখ্য নেতিবাচক বিষয় মিশ্রিত হয়ে আছে। বরং এ সব নেতিবাচক দিকগুলো কখনও অনেক ভয়াবহ ও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এ নেতিবাচক দিকগুলো বিষয়বস্তু সংক্রান্ত এবং এমন ফলাফল সংক্রান্ত যা বিশেষভাবে গবেষণা করা প্রয়োজন। এগুলো কখনও নতুন মাসআলার এবং উদ্ভাবিত সমস্যার সৃষ্টি করে। এই নেতিবাচক দিকগুলো হলোঃ

ক। এ সব গ্রন্থে গবেষণাগত দুর্বলতা লক্ষ করা যায় এবং এগুলোতে পূর্ববর্তী ফিক্বহ ও হাদীস গ্রন্থ হতে রেফারেন্স গ্রহণ করে কোন গবেষণা করা হয় নি। যা মূলতঃ গবেষণা, ফাৎওয়া ও লেখনীর ক্ষেত্রে পথ চলার জন্য মূল হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হয়। এর ফলে আমরা দেখি যে, যে বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মুসলমান ঐকমত্য পোষণ করেছেন, সে বিষয়ে কেউ আবার মতভেদ করেছে। অথবা এমন মতামতকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে যা বিরল, পরিত্যক্ত ও কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কিংবা সে তার মনমতো কিছু মতামতের ক্ষেত্রে রাফেজী ও তার অনুরূপ ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের ফিক্বহ শাস্ত্রে বিচরণ করেছে। আর এটাকে সে মুসলমানদের কাছে ইসলামী ফিক্বহ হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছে এবং বুঝাতে চেয়েছে যে, এটা মুসলমান বিদ্বানদের অভিমত!![৭]

খ। এ গ্রন্থগুলোর কিছু গ্রন্থ বিদ্বানদের মতামতে ভরপুর। এ মতামতগুলোর ক্ষেত্রে কোন প্রকার দলীলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় নি এবং একটিকে আরেকটির উপর প্রাধান্যও দেয়া হয় নি। ফলে গবেষক ও পাঠকগণ এ ক্ষেত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। এমনকি কিছু কিছু গ্রন্থের লেখক এ সমস্ত মতামতের যে কোন একটি অভিমতকে গ্রহণ করার স্বাধীনতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এ যুক্তি দেখিয়ে যে, এই মতামতগুলো পূর্ববর্তী কোন কোন বিদ্বানেরই বক্তব্য।[৮]

গ। এ সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশ গ্রন্থে দলীলের বিশুদ্ধতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয় নি এবং প্রাধান্যও দেয়া হয় নি। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিলেও তা বিদ্বানদের নীতিমালার আলোকে হয় নি।

ঘ। এ সব গ্রন্থের কিছু গ্রন্থকে ফিক্বহী গবেষণা মূলক নীতির আলোকে রচনা করা প্রয়োজন। কেননা কিছু কিছু গ্রন্থ বক্তৃতাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে জ্ঞানের পরশ লক্ষ করা যায় না।

ঙ। কখনও আবার এ সব গ্রন্থ ইসলামের শত্রুদের আরোপিত মতামত ও সংশয় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং কিছু কিছু বিধান যেমনঃ শান্তির বিধান, যুদ্ধের বিধান, কর সংক্রান্ত বিধান, আন্তর্জাতিক

---

[৭] 'যওয়াবিতু লিদ্দিরাসাতিল ফিক্বহিয়্যাহ' পৃঃ ৪৫।

[৮] এ মাসআলার ব্যাপারে সতর্কবাণী শীঘ্রই আসবে।

www.waytojannah.com

Contents

সম্পর্কিত বিধান, বিধর্মী ও মুশরিকদের সাথে আদান-প্রদানের বিধান, বিচার-ফায়সালাগত বিধান, দাসত্বের বিধান, বহু বিবাহের বিধান প্রভৃতি বিধানসমূহ দুর্বল কথার মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। কেননা সে এক্ষেত্রে প্রতিহত করার স্থানে অবস্থান করেছে। যার ফলে তার মধ্যে ইসলামকে দোষ মুক্ত করার আগ্রহ থাকার কারণে কিছু প্রতিষ্ঠিত বিধানকে বাতিল করেছে এবং কিছু দুর্বল মতামতকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করেছে।[৯]

চ। যেমনটি এ গ্রন্থগুলো প্রভাবিত হয়েছে প্রভুর হিদায়াত ও নাবীর সুন্নাত হতে বিভ্রান্ত উম্মতের কর্মকাণ্ড দ্বারা। ফলে তা মানুষের জন্য ওযর-আপত্তি ও অযৌক্তিক কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছে। যা নিষিদ্ধ ও হারাম কাজগুলোকে সহজ করে দিয়েছে। বাস্তবতার চাপ সৃষ্টি করে তা মানুষের উপর অবধারিত করে দিয়েছে এবং ভারি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। ফলে স্পষ্ট দলীলগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে এবং সহীহ আসারগুলোকে যঈফ (দুর্বল) বানিয়ে ফেলেছে।[১০]

ছ। আধুনিক ফিক্বহ শাস্ত্রগুলো নতুন উদ্ভাবিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এ ক্ষেত্রে তারা ওযূহাত দেখিয়েছে যে, এ সব বিষয়গুলো পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ আলোচনা করেন নি। বর্তমান যুগে এর সাথে অনেক ঘটনা জড়িত এবং এসব বিষয়ের সাথে মানুষের অনেক প্রয়োজন সম্পৃক্ত আছে, যার ব্যাপারে ইসলামের কোন সঠিক বিধান পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে এ সব বিষয়ের সমাধান দিতে গিয়ে সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রণ করে ফেলেছে। আমরা যদি জীবন বীমা, আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং কৃত্রিম প্রজননসহ আরও অন্যান্য বিষয়াবলির দিকে লক্ষ করি, তাহলে অনেক আশ্চর্য বিষয় খুঁজে পাব।[১১]

এ ছাড়াও আধুনিক যুগের অধিকাংশ গ্রন্থগুলো গবেষণা মূলক হওয়া সত্ত্বেও তা একই বিষয়ের উপর লিখিত। যদিও পরিপূর্ণ ফিক্বহ গ্রন্থ পাওয়া যায়, কিন্তু তা পূর্বোল্লেখিত অধিকাংশ নেতিবাচক দিক থেকে মুক্ত নয়।

তৃতীয়তঃ মুহাদ্দিস ও ফক্বীহদের মাঝে অগ্নিযুদ্ধ ও সৃষ্ট ঘৃণা বোধঃ

আমি হাদীস বিভাগের অনেক ছাত্র ভাইকে দেখেছি যে, তারা ইলমুল ফিক্বহ শিক্ষা করা থেকে বিরত থাকে এবং পবিত্র সুন্নাহকে দিরায়াত (উপলব্ধি) ছাড়া শুধু রিওয়ায়াত (বর্ণনা) গত দিক থেকে গ্রহণ করতে ব্যস্ত থাকে। আবার ফিক্বহ শাস্ত্রের অধিকাংশ ছাত্রকে দেখেছি যে, তারা হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন, তার সনদ পরিচিত ও মতন মুখস্থ করা থেকে বিরত থাকে। অথচ তারা মাযহাবী ফিক্বহী গ্রন্থ আয়ত্তকরণ ও সংক্ষিপ্ত ফিক্বহী গ্রন্থগুলো মুখস্থ করার ক্ষেত্রে নিবেদিত থাকে। এ ঘৃণাবোধ অতীত থেকেই বিদ্যমান। যাকে উত্তেজিত করেছে কিছু সংখ্যক হাদীস সংকলক ও মুষ্টিমেয় ফক্বীহ। এটা মূলতঃ তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হয়েছে। ফলে তারা একে অপরকে নিন্দা করে ও বাঁকা চোখে দেখে।

---

[৯] 'যওয়াবিতু লিদ্দিরাসাতিল ফিক্বহিয়্যাহ' পৃঃ ৪১,৪২ ।

[১০] প্রাগুক্ত পৃঃ৪২।

[১১] প্রাগুক্ত পৃঃ৪৭।

www.waytojannah.com

Contents

ইমাম খাত্ত্বাবী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৩৮৮ হিঃ) বলেন:[১২]

"আমাদের যামানায় বিদ্বানদের দেখা যায় যে, তারা দু'টি দলে ও মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে:
১। হাদীস ও আসার এর অনুসারী। ২। ফিক্বহ ও যুক্তির (নাযর) অনুসারী।
তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে একটি অপরটির মুখাপেক্ষী। কেননা ভিত্তির দিকে লক্ষ্য করে হাদীস হচ্ছে আসল এবং স্থাপনার দিকে লক্ষ্য করে ফিক্বহ হচ্ছে তার শাখা-প্রশাখা। স্থাপনা যদি মূল ভিত্তির উপর না রাখা হয়, তাহলে সেটা অকার্যকর হবে এবং ভিত ছাড়া বিল্ডিং তৈরি করলে সেটি অকেজো ও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আমি উভয় দলকে পেয়েছি নিকটতম প্রতিবেশী ও পাশাপাশি দু'টি বাড়ীর মত। প্রত্যেকটি দল একে অপরের ব্যাপক প্রয়োজনে আসে। তাদের উভয়কেই তার সাথীর নিকট জরুরী ভিত্তিতে দরকার হয়। তারা যেন হিজরতকারী ভাইয়ের মত। কোন প্রকার প্রাধান্য ছাড়াই সঠিক পথে চলার জন্য একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে যারা হাদীস ও আসারের অনুসারী তাদের অধিকাংশই রিওয়ায়াত বা বর্ণনার অনুরাগী, বিভিন্ন পদ্ধতি একত্রিতকারী, গরীব ও শা'য হাদীস অনুসন্ধানকারী, যার অধিকাংশই জাল অথবা মাকলুব বা পরিবর্তিত। তারা মতনের দিকে লক্ষ্য করে না, অর্থও বুঝে না এবং এর গোপন ভেদ ও গুঢ় রহস্যও উদ্ভাবন করতে পারে না। বরং ফক্বীহদের সমালোচনা করে, তাদের বাঁকা চোখে দেখে এবং সুন্নাত বিরোধী বলে আখ্যা দেয়। তারা এটা বুঝতে পারে না যে, তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা খুব সামান্য এবং এটাও বুঝে না যে, ফক্বীহদের গালি দেয়া পাপের কাজ।
অপরদিকে যারা ফিক্বহ ও যুক্তির (নাযর) এর অনুসারী তাদের অধিকাংশই স্বল্প হাদীস ছাড়া তেমন হাদীস বর্ণনা করে না। তারা সহীহ হাদীসকে যঈফ থেকে পৃথক করে না। উত্তম হাদীসকে নিম্নমানের হাদীস থেকে আলাদা করে না। তাদের কাছে যে হাদীস পৌঁছে তা তাদের দাবীকৃত মাযহাবের অনুকূলে হয়ে গেলে এবং তাদের বিশ্বাসকৃত মাযহাবের মত অনুযায়ী হলে বিতর্কিত বিষয়ে তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করতে আপত্তি করে না। কোন যঈফ ও মুনকাতি হাদীস যদি তাদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করে তাহলে সেই যঈফ ও মুনকাতি হাদীস গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পরিভাষা তৈরি করে। এমনি করে ক্রমাগতভাবে কোন নির্ভরযোগ্যতা ছাড়া ও নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়াই তাদের মাঝে বিভিন্ন মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে রাবীর বর্ণনা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটে এবং তাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

মূলতঃ হাদীস ও ফিক্বহ শাস্ত্র হলো, অকৃত্রিম দু'ভাই স্বরূপ এবং পরিপূর্ণতার দিক দিয়ে উভয়ে খুবই নিকটবর্তী। এ জন্য ইবনুল মাদানী (রাহি.) বলেন: "হাদীসের অর্থ নিয়ে গবেষণা করাটা অর্ধেক জ্ঞানার্জন করার সমান। আর রিজাল শাস্ত্র সম্পর্কে জানাও অর্ধেক জ্ঞানার্জনের সমান"।[১৩] সুতরাং হাদীস ও ফিক্বহ শাস্ত্র যেন একজন আলিমের জন্য একই পাখির দু'ডানা স্বরূপ।

শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:[১৪] " ফিক্বহ শাস্ত্র রচনাকারী যদিও ফিক্বহ শাস্ত্র ও ইলমুল উসূল সম্পর্কে সুদক্ষ হয় এবং সহায়ক সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করে এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়,

---

[১২] 'মা'আলিমুস সুনান' (১/৭৫)
[১৩] আল খত্বীব প্রণীত 'আল জা'মি লিআখলাক্বির রাবী ওয়াস সা'মি' (২/২১১) ।
[১৪] 'আদাবুত ত্বলাব' পৃ: ৪৫-৪৬ ।

www.waytojannah.com

যার গুণাগুণ বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। কিন্তু যদি তিনি হাদীস শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করেন, হাদীস শাস্ত্রে অদক্ষ হন, সহীহ ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে না জেনে গ্রন্থ রচনা ও প্রণয়ন করেন তাহলে তার গ্রন্থটি ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত হবে। কেননা কিয়দংশ ছাড়া ফিক্বহ শাস্ত্রের সম্পূর্ণটাই হাদীস শাস্ত্র হতে গৃহীত। এ বিধানটি কুরআনুল কারীম স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে। সুতরাং যদি কেউ হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞানী না হয়, সে ব্যাপারে যদি দক্ষ না হয় এবং গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে যদি হাদীস শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করে তাহলে শাস্ত্রবিদগণ তাদের শাস্ত্র দিয়ে কি করবেন?!"

এ জন্যই ফিক্বহের সুক্ষ্ম আর মাসআলার ক্ষেত্রে ন্যায়-পরায়ণ ও শক্তিশালী মাযহাব হলো- মুহাদ্দিসদের মাযহাব। কেননা তারা নবুওয়াতের ঝরণা থেকে পান করেছেন এবং রিসালাতের প্রদীপ থেকে আলো গ্রহণ করেছেন। এখানেই তারা আসা-যাওয়া করেছেন।[১৫]

"সে ব্যক্তি কতই না মন্দ মুহাদ্দিস! যাকে হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা জানেন না। অথচ তিনি হাদীস সংকলন করার কাজে ব্যস্ত থাকেন। আর সে ব্যক্তি কতই না মন্দ ফক্বীহ! যাকে বলা হয় রাসূল (ﷺ) এর এ বাণীর অর্থ কি? তখন তিনি তার অর্থ ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বলতে পারেন না"।[১৬]

সালাফদের ত্বরীকা ও রীতি-নীতি ছিল রিওয়ায়াতকে দিরায়াতের সাথে এবং দিরায়াতকে রিওয়ায়াতের সাথে মিলিয়ে নেয়া। আর এই রীতি গ্রহণের ব্যাপারেই তারা উপদেশ দিয়েছেন।

মাসআব আযযুবাইরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মালিক বিন আনাসকে বলতে শুনেছি, তিনি তার দুই ভাগ্নে তথা আবূ উয়াইস এর দুই ছেলে আবূ বকর ও ইসমাঈলকে বলেনঃ "আমি তোমাদের দু'জনকে এ বিষয়টিকে ভালবাসতে ও অনুসন্ধান করতে দেখছি। তথা হাদীস শ্রবণ করতে দেখছি। তখন তারা দু'জন বললেন, হাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন। তখন মালিক বিন আনাস বললেনঃ যদি তোমরা হাদীস দ্বারা মানুষের উপকার করতে চাও এবং আল্লাহও যদি তোমাদের দ্বারা উপকার করিয়ে নিতে চান, তাহলে হাদীস স্বল্প করে সংগ্রহ কর, কিন্তু হাদীসের ব্যাপারে গভীর জ্ঞানার্জন করার চেষ্টা কর"।[১৭]

আমার কথা হলঃ সহীহ সুন্নাহ ও আসার হতে সুক্ষ্ম ফিক্বহ শাস্ত্র গ্রহণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য যা বিদ্বানদের নীতিমালার আলোকে পূর্ববর্তী উম্মাহ ও ফক্বীহদের বোধগম্যতার মাধ্যমে প্রবহমান।

---

[১৫] সালিহ আল উসাইমীন প্রণীত 'তাযকিরাতুল হাদীসী ওয়াল মুতাফাক্বিহ' পৃঃ৬।

[১৬] ইবনুল যাওযী প্রণীত 'সইদুল খতির' পৃঃ ৩৯৯-৪০০ ।

[১৭] রমাহ রমযী প্রণীত 'আল-মুহাদ্দিসুল ফাযিল' পৃঃ ২৪১ ও আল-খতীব 'নাসীহাতু আহলিল হাদীস' (পৃঃ ৩৭) যা- 'তাযকিরাতুল হাদীসী ওয়াল মুতাফাক্বিহ' (পৃঃ ২৮) হতে গৃহীত হয়েছে।

Contents

এ গ্রন্থ প্রণয়ন পদ্ধতি (المسلك في هذا الكتاب)

অতঃপর উল্লেখিত তিনটি বিষয় আমাকে এ গ্রন্থটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হতে উৎসাহিত করেছে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এর দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের উপকার দান করেন এবং তিনি যেন এটাকে তার দীনের পাণ্ডিত্য অর্জনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটি পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করেন। আর আমি অন্যের মাঝে যে নেতিবাচক দিকগুলো দেখে সমালোচনা করেছি, তা থেকে যেন তিনি আমাকে দূরে রাখেন। এ ধরনের নেতিবাচক বিষয়ের ক্ষেত্রে আমিও নিজেকে ত্রুটিমুক্ত মনে করছি না।

নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে আমি এ গ্রন্থকে সাজিয়েছিঃ

১। সামান্য কিছু ভিন্নতা ছাড়া আমি এর লেখনী ও অধ্যায়গুলোকে অধিকাংশ ফিক্বহ গ্রন্থের কাছাকাছি নিয়মে সাজিয়েছি। প্রথমেই আমি ইবাদাত সংক্রান্ত আলোচনা দিয়ে শুরু করেছি। যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, ত্বহারাত (পবিত্রতা), সালাত, জানাযা, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জ অধ্যায়। ইবাদাত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোও আমি এর সঙ্গে সংযোজন করেছি। যেমনঃ শপথ, মানত, পানাহার, শিকার, যবেহ প্রভৃতি অধ্যায়। এর পর আমি এর সাথে পারিবারিক তথা ব্যক্তিগত বিষয়াবলীর বিধান এবং এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোও উল্লেখ করেছি। যেমনঃ পোশাক, সৌন্দর্য, নাযর ও মীরাস সংক্রান্ত অধ্যায়। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে حدود (দণ্ডবিধি), جنايت (অপরাধ সমূহ) ও ديات (রক্তপণ) অধ্যায়। এরপর ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায়। এভাবেই গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে।

২। এ গ্রন্থের ভূমিকায় আমি মাযহাবের উৎপত্তি, বিদ্বানদের মতভেদের কারণ এবং তাক্বলীদ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করেছি। যা একজন শিক্ষার্থীর জন্য ফিক্বহ শাস্ত্র পাঠের পূর্বে জানা আবশ্যক।

৩। আমি এ গ্রন্থের বিষয়গুলো এবং বিষয়ের শব্দগুলো সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় সাজাতে চেষ্টা করেছি। যাতে গবেষক ও সাধারণ পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। সাথে সথে আমি সুক্ষ্মতা ও উদ্দেশ্য হাসিলের দিকে লক্ষ্য রেখে যথাসম্ভব এর ইবারতগুলো ফক্বীহদের ইবারতের কাছাকাছি করে সাজানোর ব্যাপারে খেয়াল রেখেছি। কখনও কখনও আমি বিভিন্ন ফিক্বহ গ্রন্থ থেকে সংকলন করে উত্তম ইবারতও নির্বাচন করেছি।

৪। পাঠকের স্মৃতিতে যুগপৎ সংঘটিত হয়, এমনভাবে আমি এর মাসআলাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে যুক্তি ভিত্তিক সাজিয়েছি। যাতে তা দ্রুত বুঝা যায় ও সহজে গ্রহণ করা যায়।

৫। বিস্তারিত শিরোনাম রচনার ক্ষেত্রে আমি গুরুত্ব দিয়েছি। যাতে স্পষ্টভাবে এর উদ্দেশ্য বুঝা যায়। এছাড়াও শিরোনামের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। যাতে আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়ে যায় এবং বিষয়বস্তুগুলোকে একটি অপরটি থেকে পার্থক্য করা যায় ও চিন্তা-চেতনাগুলোকে একই বিষয়ের মধ্যে সাজানো যায়।

৬। মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে সমস্ত দলীল একত্রিত করে ও তা বাছাই করে এবং মাসআলা সংক্রান্ত হাদীসগুলো সহীহ-যঈফ নির্ণয় করে আমি যথাসম্ভব কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে উপযুক্ত দলীল পেশ করার চেষ্টা করেছি। আমার সাধ্য অনুযায়ী এ দলীলগুলো সংক্ষিপ্তভাবে টীকায় উল্লেখ করেছি। কোন মাসআলার ক্ষেত্রে যদি কোন ইজমা থাকে তাহলে আমি তার সূত্রও উল্লেখ করে দিয়েছি।

www.waytojannah.com

৭। যদি কোন মাসআলার ক্ষেত্রে মতভেদ পাওয়া যায় (যা অধিকাংশ ফিক্বহী মাসআলার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে), তাহলে আমি সে মতভেদ উল্লেখ করতে অলসতা করি নি। আর তা করবই বা কেন? কেননা কাতাদাহ বলেছেন: "যে ব্যক্তি মতভেদ সম্পর্কে জানে না, সে ব্যক্তি নাসিকা দিয়ে ফিক্বহ এর ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে নি"।[১৮]

মূলতঃ মতভেদ সম্পর্কে অজ্ঞতা এমন হক্বকে বাতিল করার দিকে নিয়ে যায়, যা হয়তো সে জানে না। কেননা হক্বটা শুধু বিদ্বানদের যে কোন একজনের কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সে যে মাপেরই বিদ্বান হোক না কেন। এজন্য ওসমান বিন আত্বা তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: "যে ব্যক্তি মানুষের মতভেদ সম্পর্কে জানে না তার ফাৎওয়া দেয়া উচিত নয়। এরূপ যদি না করে তাহলে সে তার কাছে যে জ্ঞান রয়েছে তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য জ্ঞানকে বাতিল করে দিতে পারে"।[১৯]

যদি কোন মাসআলার ক্ষেত্রে মতভেদটা গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে আমার উপস্থাপন পদ্ধতি হল, আমি সকল মতামতসহ বিদ্বানদের মধ্যে যারা এ মতামতগুলো দিয়েছেন তাদের কথা উল্লেখ করেছি। মতামতগুলো সংকলনের ক্ষেত্রে আমি যথাসম্ভব স্ব-স্ব ইমামের গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছি। অথবা বিদ্বানদের নিকট নির্ভরযোগ্য মাযহাবী গ্রন্থগুলোর উপর নির্ভর করেছি। সাথে সাথে আমি টীকাতে এ সমস্ত মতামতের নির্ভরযোগ্যতার কথা উল্লেখ করে দিয়েছি।

অতঃপর আমি এ সমস্ত মতামতের ক্ষেত্রে যে দলীলগুলো জানতে পেরেছি তা বর্ণনা করে দিয়েছি। সাথে সাথে যদি দলীলটি স্পষ্ট না হয়, তাহলে আমি দলীল গ্রহণের পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছি। কখনও আবার যে সব দলীলের ব্যাপারে প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে এবং বিপরীত পক্ষ থেকে এর যা উত্তর দেয়া হয়েছে সে বিষয়টিও উল্লেখ করে দিয়েছি। যাতে এর দ্বারা পরিপূর্ণ উপকার পাওয়া যায়। এভাবেই আমি সকল মাসআলার ক্ষেত্রে বিদ্বানদের মতামতগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি।

৮। আমি শুধু এ মতামতগুলো সংকলন ও দলীলগুলো বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করি নি। কেননা প্রাধান্য দেয়া ছাড়াই শুধু মতামত পেশ ও দলীল বর্ণনা করা হলে, সাধারণ পাঠক এর সঠিকতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হতাশা ও দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে পড়ে যাবে। কারণ একজন গবেষক যখন সমস্ত মতামত একত্রিত করল এবং তা বাছাই করল। কিন্তু প্রাধান্য দিল না, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যরা এর সঠিকতা নির্ণয় করতে সক্ষম হবে না। তাই আমি সকল মতামত বুঝার চেষ্টা করেছি এবং সেগুলো সনদ ও মতনগত দিক থেকে যাচাই-বাছাই করেছি। সর্বোপরি এর উদ্দেশ্য বুঝেছি, একটিকে আরেকটির সাথে তুলনা করেছি এবং যথাসম্ভব এ ক্ষেত্রে আমি বিদ্বানদের নীতিমালা আরোপ করারও চেষ্টা করেছি। যেন প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমতটিই গ্রহণ করা যায়। যে মাপেরই ব্যক্তি হোক না কেন, এ ক্ষেত্রে আমি কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার চেষ্টা করি নি। মূলতঃ একনিষ্ঠ গবেষক তিনি, যিনি হক্ব এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্য অন্বেষণের চেষ্টা করেন। এর পরে তার আর কোন যায় আসে না যে, সে কি বলল বা অমুকে কি বলল। বিশেষ করে একনিষ্ঠ গবেষক তিনি, যিনি হক্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক ইমামের মতামত ত্যাগ করে অন্য ইমামের মতামত গ্রহণ করতেও পরওয়া করে না।

---

[১৮] 'জা'মিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহ' (২/৪৬)।
[১৯] 'জা'মিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহ' (২/৪৬)।

Contents

এ ক্ষেত্রে আমি সুদৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করেছি যে, সর্বদা আমি শরীয়াতের দলীলের সাথেই থাকব। এখান থেকেই শ্রবণ করব, এর দিকেই মনোযোগ দিব এবং এর উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করব। এর আগে বেড়ে কোন কথা বলব না। যা বলা যায় না তা বলব না। যে অর্থের সম্ভাবনা রাখে না; সে অর্থ করার চেষ্টাও করব না এবং নিজের অথবা মানুষের প্রবৃত্তির অনুসরণ করব না। এর মূল উদ্দেশ্য হল, যদি প্রাধান্যের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য দিকটা স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে, আমার যোগ্যতা অনুযায়ী তা প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করব। আর যদি প্রাধান্যের ক্ষেত্রে সঠিক দিকটা স্পষ্ট না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে আমি নীরবতা পালন করব। কেননা দলীল-প্রমাণ ছাড়া প্রাধান্য দেয়া বৈধ নয়।

ইবনু আব্দিল বার বলেন: "বিদ্বানদের মতভেদের সময় কুরআন, সুন্নাহ ও এ দু'য়ের নীতিমালার আলোকে গঠিত ইজমা ও কিয়াস থেকে দলীল গ্রহণ করা ওয়াজিব। এটা এমন নয় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এ গুলো থেকে যে দলীল পাওয়া যাবে না। যদি দলীলগুলো সমপর্যায়ের হয়ে যায়, তাহলে কুরআন সুন্নাহর দিক দিয়ে যে দলীলটা বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ সে দিকেই ধাবিত হতে হবে। আর যদি তা স্পষ্ট না হয় তাহলে নীরবতা পালন করতে হবে। নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া কোনটিকে অকাট্যভাবে গ্রহণ করা বৈধ হবে না"।[২০]

কখনও আবার সমস্ত মতামতের মধ্যে দুইটি শক্তিশালী মতামতকে নির্বাচন করেছি অথবা আমার কাছে যে মতামতগুলো দুর্বল মনে হয়েছে সেগুলোকে দুর্বল বলেছি। সুতরাং এগুলো মূলতঃ আংশিক প্রাধান্য যা সঠিক মাসআলার কাছাকাছি নিয়ে যাবে।

যদি কোন অভিমত স্পষ্টভাবে অন্যের উপর প্রাধান্য পায়, তাহলে আমি অকাট্য দলীলের মাধ্যমে শক্তিশালী কথার দ্বারা তা উল্লেখ করেছি। সাথে সাথে পূর্বোল্লেখিত নিয়মের মত করেই এ মতের প্রবক্তাদেরও উল্লেখ করেছি। এরপর সংক্ষিপ্তভাবে মতভেদের বিষয়টিরও ইঙ্গিত দিয়েছি। কখনও আমি বাতিল, অগ্রহণযোগ্য যা বর্ণনা ও উল্লেখ করা নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত নয়, এমন মতভেদগুলো আলোচনা করা থেকে বিরত থেকেছি। তবে কোন উপকার থাকলে তা উল্লেখ করেছি।

মতামত নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছি যে, সালাফদের মতসমষ্টি থেকে আমি বের হব না। সুতরাং পূর্বে বলা হয় নি এমন কোন নতুন মতামত নিয়ে আসার কোন চেষ্টা আমি করি নি। কেননা পূর্ববর্তীদের এসব মতামতের উপর সীমাবদ্ধ থাকাটা তাদের পক্ষ থেকে ইজমা হিসেবে ধরে নিতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, এদের মতামতের মধ্যেই হক্ব সীমাবদ্ধ রয়েছে। হক্ব এদের মতামতের বাইরে যেতে পারে না। যদিও এসব মতামতের মধ্যে কোনটির সাথে হক্ব সংশ্লিষ্ট তা নিয়ে তারা মতভেদ করেছেন। সুতরাং এ ধারণা করা যাবে না যে, সমস্ত উম্মতের মাঝে যে কোন এক যুগে হক্ব গোপন থাকতে পারে।

আমি এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, আমার নির্বাচনগুলো আমি ব্যতীত অন্যের জন্য অবধারিত হওয়াটা আবশ্যক নয়। যদিও আমার এই নির্বাচনগুলো উপকার দিতে পারে ঐসকল ব্যক্তিদের যারা মাসআলাকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। আর যে শিক্ষার্থী মাসআলাকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম তার ক্ষেত্রে এ উপকার হবে যে, আমি তার জন্য বিক্ষিপ্ত মাসআলাগুলো একত্রিত করে দিলাম।

---

[২০] 'জা'মিউ বায়ানিল ইলম' (১/৮০)।

www.waytojannah.com

ফলে কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়াই তার কাছে যেটা সঠিক বলে বিবেচিত হবে সেটাকেই সে প্রাধান্য দিবে। আর যদি কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি আমার এ কথাগুলো অবগত হওয়ার পর তা শক্তিশালী মনে না করেন, তাহলে তিনি যেন আমার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দেন। আমার উপর তাকে যে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, এ জন্য তিনি যেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

মূলতঃ যখন মহিয়ান আল্লাহর দীনের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায়, তখন হক্বপন্থি বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি তার দয়া প্রদর্শনও বৃদ্ধি পায়।

উল্লেখিত বিন্যাস ও পদ্ধতিতে আমি আমার এ গ্রন্থের অধিকাংশ অংশকেই সাজিয়েছি। এমনকি আমি যখন "كتاب البيوع" এর শুরুর দিকে পৌঁছলাম তখন আমি ভ্রমণে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। এমন সময় প্রকাশকও (আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন) গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য পিড়াপিড়ি করছিলেন। তখন আমাদের ভাই শাইখ ফুয়াদ সিরাজ (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) প্রণিত "المحرمة البيوع" নামক সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা আমার এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করলাম। তবে বিভিন্ন মতামত সমূহের মধ্যে মতভেদ ও প্রাধান্যের ব্যাপারে যে শর্তটি আমি আমার গ্রন্থে আরোপ করেছি সে শর্তের আলোকে অত্র আলোচনাটি লিপিবদ্ধ করা হয় নি। আর যে আলোচনার পরিপূর্ণটা গ্রহণ করা যায় না, তার অধিকাংশটা ছাড়াও যায় না। আমার শর্তালোকে এ অংশটুকু আলোচনা করতে হলে পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা, দীর্ঘ সময় ও বিশেষ গুরুত্বের প্রয়োজন। বিশেষ করে এ গ্রন্থের আলোচনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ নব উদ্ভাবিত মাসআলার জন্য এটা করা প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে আমি "كتاب البيوع" এর আলোচনা শুরুও করেছিলাম। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সফরে যেতে বাধ্য হওয়াই এটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠে নি। সুতরাং আমি আশা করব যে, পাঠকরা যেন আমার এই ওযরটি গ্রহণ করেন। যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছায় আমি কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য যাত্রা শুরু করেছিলাম। ইনশা আল্লাহ আগামী সংস্করণে এ বিষয়ে একটি অধ্যায় আলোচনা করার চেষ্টা করব।

পরিশেষে আরেকটি কথা না বলেই পারছি না যে, যারা মাসআলা প্রণয়নের ব্যাপারে, কিতাব ধার দেয়ার ব্যাপারে, লেখার ব্যাপারে, কপি করার ব্যাপারে, সংকলনের ব্যাপারে, ছাপানোর ব্যাপারে অথবা অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের ব্যাপারে এ কাজটি সম্পন্ন এবং এভাবে প্রকাশ করার জন্য যে কোন ভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ও একনিষ্ঠভাবে দু'আ করছি। বিশেষ করে আমাদের ভাই শাইখ ফুয়াদ সিরাজ (আল্লাহ তার জ্ঞানে, আমলে ও পরিবারে বরকত দান করুন), শাইখ হানী আল-হাজ্জ (আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন), আমার সম্মানিত দু'ভাই মুস্তফা আশ-শামী ও ফাইসাল আব্দুল ওয়াহিদ (আল্লাহ তাদের হিফাযত করুন) এবং সম্মানিত ভাই সাইয়্যিদ ফাতহী এর কথা উল্লেখ করছি। আল্লাহর কাছে দু'আ করছি তিনি যেন তাদের অশেষ সাওয়াব ও প্রতিদান দান করেন এবং আমাদেরকে তাদের সাথে চিরস্থায়ী জান্নাতে একত্রিত করেন।

www.waytojannah.com

Contents

আমি এ গ্রন্থের নাম রেখেছি "صحيح فقه السنه و توضيح مذاهب الأئمة" (বিশুদ্ধ সুন্নাহ সম্বলিত ফিক্বহ ও ইমামগণের মতামতের বিশ্লেষণ)। বিদ্বানদের কাছে নিজ ত্রুটি প্রকাশ করতে আমার কোন অসুবিধা নেই এবং এটা জানাতেও কোন সমস্যা নেই যে, এ ক্ষেত্রে আমার ক্ষমতা খুবই স্বল্প।

যদি আমি ভুল করি, তাহলে ভুল থেকে কে নিষ্কৃতি পেয়েছে? আর যদি আমাকে ভুল বুঝা হয়, তাহলে কার পক্ষ থেকে আমাকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে?

আমি জানি যে, মানুষকে যেহেতু ত্বরাপ্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ভুল করে ও তার পদস্খলন হয়। যদি আমি সঠিক করে থাকি তাহলে তা শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে। আর যদি ভুল করে থাকি তাহলে তা আমার নিজের পক্ষ থেকে ও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ) এ থেকে মুক্ত। এ ক্ষেত্রে আমি দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবির পংক্তি পেশ করলাম-

لقد مضيتُ وراءَ الركبِ ذا عرجٍ ... مؤمّلاً جبرَ ما لاقيتهُ من عَرَجِ

فإن لحقت بهم من بعدما سبقوا ... فكم لربِّ الورى في الناسِ من فَرَجِ

وإن ضللتُ بقفرِ الأرضِ منقطعاً ... فما على أعرج في الناسِ من حَرَجِ

"আমি খঞ্জত্ব নিয়ে একটি অভিযাত্রী দলের পিছনে অগ্রসর হয়েছি,
আমার এই খঞ্জত্বের শক্তিটুকুর উপর ভরসা করেই।
যদি তাদের অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার পরও আমি তাদের সাথে মিলিত হতে পারি (তবে এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই)।
সৃষ্টি কুলের স্রষ্টা, মানুষের জন্য কতই না সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।
আর আমি যদি জনমানবহীন অরণ্যে একাকি বিভ্রান্ত হয়ে যায়,
তবে মানব সমাজে একজন খঞ্জ ব্যক্তির জন্যে কিবা ক্ষতি হবে"।

আমি আল্লাহর কাছে কামনা করছি, তিনি যেন এ কর্মের দ্বারা আমাকে ও আমার শিক্ষার্থী ভাইদেরকে উপকার দান করেন। আমি তাঁর (আল্লাহর) সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ নিয়ত কামনা করছি। কেননা অন্তর তার হাতেই রয়েছে। আমি এ আশাও করছি যে, তাঁর সৃষ্টি জীবের কাউকে যেন এই একনিষ্ঠ নিয়্যাতের মধ্যে অংশীদার না করেন। আর এই নিষ্ঠার সম্পূর্ণ প্রতিদান যেন সাক্ষাৎ এর দিন (ক্বিয়ামতের দিন) আমাকে দান করেন!

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। তবে যিনি আল্লাহর কাছে সুস্থ অন্তরে আসবেন তার ব্যাপার টি আলাদা। *(সূরা : শু'আরা-৮৮,৮৯)*

আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গের উপর এবং তাঁর সাহাবাদের উপর আল্লাহর দয়া, শান্তি ও বরকত অবতীর্ণ হোক!

নিবেদক
দয়ালু পালনকর্তা, সমস্ত জাহানের মালিক আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা ভিখারী
আবূ মালিক কামাল ইবনু সাইয়্যিদ সালিম

www.waytojannah.com

ভূমিকা (تمهيد)

ইলমে ফিক্বহ এর উৎপত্তি (نشأة علم الفقه)[২১]

মহানাবী (ﷺ) এর যুগে ফিক্বহ শাস্ত্র (الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم)

জেনে রাখুন! রাসূল (ﷺ) এর স্বর্ণযুগে ফিক্বহ শাস্ত্র রচিত হয় নি। বর্তমান যুগের ফক্বীহগণ যেমনটি তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিভিন্ন বিধানের রুকনসমূহ, শর্তসমূহ, আদাব বা শিষ্টাচারসমূহ প্রণয়ন ও দলীল দ্বারা একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করার যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, রাসূল (ﷺ) এর যুগে ধর্মীয় বিধান নিয়ে এরূপ আলোচনা হয় নি। বর্তমান যুগের ফক্বীহগণ তাদের কর্মের রূপরেখা তৈরি করেছেন এবং এ রূপরেখাগুলোর সমালোচনা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যে বিধানকে যতটুকু সীমাবদ্ধ রাখা দরকার ততটুকু সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এরূপ অনেক কার্যক্রম বর্তমান যুগের ফক্বীহদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। আর রাসূল (ﷺ) এর স্বর্ণযুগের রূপরেখাটা ছিল এরূপ যে, তিনি যখন ওযূ করেছেন তখন সাহাবাগণ তাঁর ওযূ করা দেখেছেন। "এটা ওযূর রুকন, ঐটা আদব" এরূপ কোন বর্ণনা ছাড়াই সাহাবাগণ তাঁর ওযূর পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তারা মহানাবী (ﷺ) কে সালাত আদায় করতে দেখেছেন এবং যে ভাবে তিনি সালাত আদায় করেছেন সে ভাবেই তারা সালাত আদায় করেছেন। মহানাবী (ﷺ) হাজ্জ পালনের সময় জনগণ তা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর মত করেই তারা হাজ্জের কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন। মহানাবী (ﷺ) এর অধিকাংশ সময়টা এভাবেই কেটেছে। তিনি তাঁর উম্মতকে এমন কোন বিস্তারিত বর্ণনা দেন নি যে, ওযূর ফরয ৬টি বা ৪টি। তিনি এমনটি কখনও ভাবেন নি যে, মানুষ ধারাবাহিকতা ছাড়া ওযূ করবে। ফলে এ ওযূকে সঠিক বা ভুল বলে রায় দেয়া হবে। (তবে আল্লাহ চাইলে তা ভিন্ন ব্যাপার)। মহানাবী (ﷺ) এ সংক্রান্ত বিষয়ে খুব কমই জিজ্ঞাসিত হতেন। জনগণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তার কাছে ফাৎওয়া চাইলে তিনি সে বিষয়ে ফাৎওয়া দিতেন। কোন সংকট দেখলে তা নিরসন করতেন। তিনি মানুষকে ভাল কাজ করতে দেখলে তার প্রশংসা করতেন। আর গর্হিত কাজ করতে দেখলে তা প্রত্যাখ্যান করতেন। সমাজে ঘটে যাওয়া কোন বিচার ফায়সালার ব্যাপারে তার কাছে যে ফাৎওয়া চাওয়া হত, তার সঠিক সমাধান দিতেন। কেউ অন্যায় করলে তার প্রতিবাদ করতেন। প্রত্যেক সাহাবী যথাসম্ভব (আল্লাহ যা তার জন্য সহজ করে দেন) তাঁর ইবাদাত, ফাৎওয়া ও কোন সমাধান অবলোকন করে তা মুখস্থ করে নিতেন এবং তা মনে রাখতেন। তারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো অনুধাবন করতেন। ফলে তাদের নিকট সঞ্চিত নিদর্শনের মাধ্যমে কেউ তাকে জায়েয বলতেন, কেউ মুস্তাহাব বলতেন, কেউ আবার মানসূখ (রহিত) বলতেন। কোন দলীলের দিকে দৃষ্টিপাত না করে নিজের আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তির ভিত্তিতে তারা মহানাবী (ﷺ) এর কাছ থেকে দীনি জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন। এভাবেই রাসূল (ﷺ) এর সোনালী যুগ অতিবাহিত হয়েছে।

---

[২১] এ আলোচনাটি আমি আল্লামা দেহলভী প্রণীত 'আল-ইনসাফ' গ্রন্থ হতে কিছু সহজ করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করেছি।

Contents

সাহাবাদের যুগে ফিক্বহ শাস্ত্র (عهد الصحابة رضي الله عنهم)

এর পর সাহাবাগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী হয়ে যান। তাদের মাঝে বিভিন্ন ঘটনার উদ্ভব ঘটে ও মাসআলা-মাসায়েলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে তারা বিভিন্ন ফাৎওয়ার সম্মুখীন হন এবং তাদের মেধা ও সংরক্ষিত জ্ঞান অনুযায়ী এর সমাধান দেন। যদি এগুলো সম্ভব না হত তাহলে ইজতিহাদ করে ফাৎওয়া দিতেন। রাসূল (ﷺ) যে বিধানের যে হুকুম দিয়েছেন তার কারণ জানার চেষ্টা করতেন। যেখানেই পাওয়া যাক না কেন রাসূল (ﷺ) এর কোন বিধানের ব্যাপারে অবগত হলে তারা তা বাস্তবায়ন করতেন। কোন ইবাদাত রাসূল (ﷺ) এর পদ্ধতির আলোকে বাস্তবায়ন হওয়ার ক্ষেত্রে তারা কখনও কার্পণ্য বা আলস্য করতেন না।

সাহাবাদের মতভেদের কারণ ও এর চিত্র (أسباب اختلاف الصحابة وصوره)

রাসূল (ﷺ) এর সাহাবাদের মাঝে তৎকালীন সময়ে যে মতানৈক্য সংঘটিত হয়, তার কয়েকটি নমুনা নিম্নে আলোচিত হলো:

১। কোন সাহাবা কোন বিষয়ের ফায়সালা অথবা ফাৎওয়ার বিধান শুনতেন, যা অপরজন শুনেন নি। ফলে যিনি শুনেন নি তিনি ঐ বিষয়ে তার ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে ফাৎওয়া দিতেন। এটা কয়েকভাবে হতে পারে-

(ক) হয়ত তার ইজতিহাদটা হাদীস মোতাবেক হয়ে যেত। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- একদা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, যার স্বামী তার মহর নির্ধারণ না করেই মারা গেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে এ বিষয়ে ফায়সালা দিতে দেখি নি। ফলে তারা বিষয়টি নিয়ে একমাস যাবৎ মতভেদ করেন এবং এর সঠিক উত্তর জানার চেষ্টা করেন। পরিশেষে ইবনে মাসউদ তার ইজতিহাদের মাধ্যমে ফাৎওয়া দিয়ে বললেন, মহিলার বংশীয় নারীদের মহরের ন্যায় তার মহর নির্ধারিত হবে। এর কমও দিবে না, বেশিও দিবে না এবং তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে ও সে স্বামীর মীরাস পাবে। তখন মা'কাল বিন ইয়াসার দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, "আপনার ফায়সালার ন্যায় রাসূল (ﷺ) জনৈকা মহিলার ফায়সালা দিয়েছিলেন"। এটা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এতো আনন্দিত হলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি কখনও এতো আনন্দিত হন নি।

(খ) তাদের মাঝে মুনাজারাহ বা তর্ক বিতর্ক দেখা দিত। ফলে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হাদীস প্রাধান্য পেত। এরপর তারা ইজতিহাদ ত্যাগ করে শ্রুত বিষয়ের দিকে ফিরে যেতেন। যেমন: আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) এর প্রথম মতামত ছিল যে, "যে ব্যক্তি জুনুবী অবস্থায় সকাল করবে সে সিয়াম পালন করতে পারবে না"। ফলে রাসূল (ﷺ) এর কিছু সংখ্যক স্ত্রী তাকে এর বিপরীত খবর দিলে, তিনি (আবূ হুরাইরা) স্বীয় অভিমত পরিত্যাগ করেন।

www.waytojannah.com

(গ) তাদের কাছে হাদীস পৌঁছেছে। কিন্তু তা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে নয়। ফলে তারা ইজতিহাদ ত্যাগ করেন নি। বরং হাদীস নিয়ে সমালোচনা করেছেন। এর উদাহরণ হলো: একদা ফাতিমা বিনতে কায়েস উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) এর কাছে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, তিনি তিন তালাক প্রাপ্তা হলে রাসূল (ﷺ) তার জন্য কোন ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান নির্ধারণ করে দেন নি। উমার (রাঃ) তার এ সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে বললেন: "আমরা কোন মহিলার কথা শুনে আল্লাহর কিতাবকে ত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি না, সে সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে"। আর আয়িশা (রা.) তাকে বলেন, হে ফাতিমা! "কোন বাসস্থান ও ভরণ পোষণ নির্ধারণ করা হয় নি" তোমার এ কথাটির সত্যতার ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় কর।

(ঘ) মূলতঃ তাদের কাছে কোন হাদীসই পৌঁছে নি। এর উদাহরণ হলো: আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) নারীদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, তারা যখন (জানাবাতের) গোসল করবে তখন যেন তাদের চুলের বেনী খুলে দেয়। এই ফাৎওয়াটি আয়িশা (রা.) শুনার পর বলেন, কি আশ্চর্য লাগছে, ইবনে উমার (রাঃ) মহিলাদের চুলের বেনী খুলার নির্দেশ দিচ্ছেন, তাহলে (হাজ্জের সময়) নারীদের চুল মুণ্ডন করতে নির্দেশ দেন না কেন! অথচ আমি ও রাসূল (ﷺ) একই পাত্রে (জানাবাতের) গোসল করতাম (তখন বেনী খুলতাম না) এবং তিন বারের বেশি সময় পানি ঢালতাম না।

২। **সাহাবাগণ রাসূল (ﷺ) কে কোন কাজ করতে দেখলে, সেটাকে কেউ সুন্নাত বলতেন, কেউ আবার জায়েয বলেন:** এর উদাহরণ হলো:

সাহাবাগণ রাসূল (ﷺ) কে তওয়াফের ক্ষেত্রে রমল করতে (বীরের ন্যায় চলতে) দেখেছেন, ফলে জমহুর (অধিকাংশ) আলিম তওয়াফের ক্ষেত্রে রমল করাকে সুন্নাত মনে করেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, মূলতঃ রাসূল (ﷺ) এটা করেছিলেন মুশরিকদের উক্তি "ইয়াসরিবের জ্বর মুসলমানদের দুর্বল করে দিয়েছে" এ ধারণার কারণে। এটা সুন্নাত নয়।

৩। **ধারণার কারণে মতভেদ:** এর উদাহরণ হলো: রাসূল (ﷺ) হাজ্জ করেছেন এবং মানুষেরা তাঁর হাজ্জ প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে তাদের কেউ মনে করেন যে, তিনি হাজ্জে তামাত্তু করেছেন। কেউ মনে করেন, তিনি হাজ্জে কিরান করেছেন। আবার কেউ মনে করেন যে, তিনি হাজ্জে ইফরাদ করেছেন।

৪। **ভুল-ভ্রান্তির কারণে মতভেদ:** এর উদাহরণ হলো: বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) রজব মাসে উমরা করেছেন। আয়িশা (রা.) এ কথা শুনে বলেন: "ইবনে উমার (রাঃ) এটা ভুল করে বলেছেন"।

৫। **হাদীস সংরক্ষণের ত্রুটির কারণে মতভেদ:** এর উদাহরণ হলো: ইবনে উমার (রাঃ) রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করে বলেন: "মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবার ক্রন্দনের ফলে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে"। আয়িশা (রা.) এর সঠিক সমাধান দিয়ে বলেন, ইবনে উমার (রাঃ) একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধারণার ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো: "একদা রাসূল (ﷺ) জনৈকা ইয়াহুদীর কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, এমতাবস্থায় তার পরিবারবর্গ তার জন্য ক্রন্দন করছিল। অতঃপর মহানাবী (ﷺ) বললেন, তারা তার জন্য ক্রন্দন করছে, অথচ তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে"। এর ফলে ইবনে উমার ধারণা করেছিলেন যে, ক্রন্দন করাটাই কবরে শাস্তি হওয়ার কারণ এবং তিনি আরও ধারণা করেছিলেন যে, এ হুকুমটা সার্বজনীনভাবে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য।

Contents

৬। বিধানের কারণের মধ্যে মতভেদ: এর উদাহরণ হলো: জানাযার জন্য দাঁড়ানো। কেউ বলেন, এটা মূলতঃ ফেরেস্তাদের সম্মানের জন্য দাঁড়ানো হয়। ফলে মু'মিন ও কাফির সবাই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কেউ বলেন, মৃত্যুর ভয়ের জন্য দাঁড়ানো হয়। ফলে এ ক্ষেত্রেও মু'মিন ও কাফির সবাই অন্তর্ভুক্ত। আবার কেউ বলেন, "একদা মহানাবী (ﷺ) এর পাশ দিয়ে এক ইয়াহুদীর জানাযা অতিক্রম করছিল তখন তিনি তার মাথার উপর দিয়ে লাশটি অতিক্রম করাকে অপছন্দনীয় মনে করে দাঁড়িয়ে গেলেন। এতে বুঝা গেল, বিধানটি কাফেরের জন্য খাস।

৭। বিতর্ককারীদের মাঝে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ: এর উদাহরণ হল: মহানাবী (ﷺ) ক্বিবলাকে সামনে রেখে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। ফলে এক দলের মতে, এ হুকুম হল সার্বজনীন হুকুম এবং এ বিধান রহিত হয় নি। আর জাবের (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) কে তাঁর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে ক্বিবলাকে সামনে রেখে পেশাব করতে দেখেছেন। ফলে তিনি মনে করেন, এর ফলে পূর্বের নিষেধাজ্ঞাটি রহিত হয়ে গেছে। অন্যদিকে ইবনে উমার (رضي الله عنه) ক্বিবলাকে পেছনে রেখে রাসূল (ﷺ) কে হাজাত সম্পূর্ণ করতে দেখেছেন। ফলে এর দ্বারা তিনি পূর্বের সকল মতামতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরূপ আরও মন্তব্য রয়েছে।

তাবেঈদের যুগে ফিক্বহ শাস্ত্র (الفقه في عهد التابعين)

মোট কথা, মহানাবী (ﷺ) এর সাহাবাদের যুগে তাদের মতামতের ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। অতঃপর তাবেঈরা যথাসাধ্য তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করতেন। এর পর তারা মহানাবী (ﷺ) এর হাদীস ও সাহাবাদের মতামত থেকে যা শুনতেন তা মুখস্থ করে নিতেন ও মনে রাখতেন। তারা মতভেদগুলো যথাসাধ্য সমন্বয় করার চেষ্টা করতেন। একটি মতামতকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দিতেন। তাদের দৃষ্টিতে কিছু মতামতকে বাতিল করে দিতেন, যদিও বড় সাহাবাদের পক্ষ থেকে কোন আসার (সাহাবীর বাণী) প্রমাণিত হোক না কেন। যেমনটি কোন কোন ক্ষেত্রে (পরিস্থিতির আলোকে) মহানাবী (ﷺ) এর মতের উল্টো করাটাও তাদের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করেছিল।

ফলে প্রত্যেক তাবেঈ বিদ্বানের অনুকূলে একটি করে মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি অঞ্চলে বিভিন্ন ইমামের আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন: মদীনায় সাঈদ বিন মুসাইয়িব ও সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার। এদের পরে সেখানে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন যুহরী, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও রবীয়াহ বিন আব্দুর রহমান। মক্কাতে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, আত্বা বিন আবি রিবাহ। কুফায় ছিলেন ইবরাহীম আন-নাখঈ ও শা'বী। বসরাতে ছিলেন হাসান বসরী। ইয়ামানে ত্বাউস বিন কায়সান এবং সিরিয়ায় ইমাম হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন মাকহুল । মহান আল্লাহ তাদের অন্তরকে ইলম দ্বারা সিক্ত করেছেন এবং তাতে তারা মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তাবেঈগণ তাদের কাছ থেকে হাদীস, সাহাবাদের ফাৎওয়া ও তাদের মতামত এবং এ সমস্ত বিদ্বানের মাযহাব ও তাদের বিভিন্ন বিশ্লেষণ গ্রহণ করেছেন। যাদের ফাৎওয়ার প্রয়োজন হয়েছে তারা তাদের কাছে ফাৎওয়া চেয়েছেন। তাদের মাঝে বিভিন্ন মাসআলা মাসায়েলের উদ্ভব ঘটেছে এবং নানা প্রকার বিচার-ফায়সালা তাদের নিকট উত্থাপিত হয়েছে।

www.waytojannah.com

সাঈদ বিন মুসাইয়িব ও ইবরাহীম আন-নাখঈ এবং তাদের মতো আরও অনেকেই ফিক্বহ শাস্ত্রের অধ্যায় রচনা করেছেন। সাঈদ বিন মুসাইয়িব ও তার অনুসারীগণ মনে করতেন যে, হারামাইনের অধিবাসীগণ ফিক্বহ শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। তাদের মাযহাবের মূল ভিত্তি ছিল উমার (رضي الله عنه) ও উসমান (رضي الله عنه) এর ফাৎওয়া এবং তাদের বিচার ফায়সালা। ইবনে উমার (رضي الله عنه), আয়িশা ও ইবনে আব্বাসসহ মদীনার কাজীদের বিচার ফায়সালাও তাদের মাযহাবের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত ছিল।

অপর দিকে নাখঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ও তাঁর অনুসারীগণ মনে করতেন যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) ও তার অনুসারীগণই ফিক্বহ শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। তাদের মাযহাবের মূল ভিত্তি ছিল ইবনে মাসউদের (রা.) ফাৎওয়া। আলী (رضي الله عنه) এর বিচার ফয়সালা ও তার ফাৎওয়া। শুরাইহসহ কুফার অন্যান্য কাজীদের বিচার ফায়সালাও তাদের মাযহাবের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত ছিল। প্রত্যেক দলই বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা ও দলীল অন্বেষণের বিষয় খেয়াল রাখতেন। যে বিষয়ে বিদ্বানগণ ঐকমত্য পোষণ করতেন, সে টিকে তারা দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করতেন। আর কোন বিষয়ে যদি বিদ্বানদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিত তাহলে, শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ অভিমতটিই তারা গ্রহণ করতেন। তাদের অর্জিত জ্ঞান দ্বারা যদি কোন মাসআলার সমাধান দিতে না পারতেন, তাহলে তারা তাদের কথা ত্যাগ করে বিভিন্ন ইঙ্গিত ও মাসআলার দাবীটির অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। ফলে প্রত্যেক বিষয়ে তাদের নিকট অসংখ্য মাসআলার উদ্ভব ঘটে।

তাবেঈদের পরবর্তী যুগে ফিক্বহ শাস্ত্র (الفقه بعد عهد التابعين)

অতঃপর মহান আল্লাহ তাবেঈদের পরবর্তী যুগে ইলম বহনকারী একটি দলের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। তারা তাবেঈদের কাছ থেকে দীনি জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তাদের শাইখদের রীতি-নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। তারা রাসূল (ﷺ) এর হাদীসের সনদ গ্রহণ করেছেন। সাহাবী ও তাবেঈদের মতামত দ্বারা দলীল স্থাপন করেছেন। মূলতঃ তারা এটা জানতেন যে, তাদের (সাহাবী ও তাবেঈদের) কাছ থেকে যে দীনি জ্ঞান অর্জন করা হয় তা হয়তো, রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকেই গৃহীত যা তারা সংরক্ষিত করে 'মাওকূফ' হাদীসে পরিণত করেছেন। অথবা তারা যে মাসআলাটি ইস্তিমবাত (উদ্ভাবন) করেছেন তা মানসূস বা শারঈ দলীল থেকেই গৃহীত। আর তারা যে ইজতিহাদটি করেছেন তা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই করেছেন। বাস্তবেই তারা (সাহাবা ও তাবেঈগণ) ছিলেন প্রত্যেক বিষয়ে তাদের পরবর্তী ধারক বাহকদের চেয়ে উত্তম কর্মী, অত্যধিক বিশুদ্ধ মতামত প্রদানকারী, যামানার দিক থেকে সবার অগ্রগামী এবং জ্ঞান সংরক্ষণে অত্যধিক তৎপর। তাদের (সাহাবা ও তাবেঈগণের) মধ্যে যে মতভেদগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে সে গুলো ছাড়া তাদেরই রেখে যাওয়া পথ ও পদ্ধতি দ্বারাই দীনের আমল নির্দিষ্ট হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, (কোন পরিস্থিতির কারণে) রাসূল (ﷺ) এর হাদীস তাদের মতের প্রকাশ্য বিরোধী হয়েছে।

Contents

গ্রন্থ রচনার এই যুগে তাদেরকে ঐশী অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়েছিল। ফলে ইমাম মালিক ও মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবূ জি'ব মদীনায়, ইবনে জুরাইয ও ইবনে উয়াইনা মক্কায়, সাওরী কুফায় এবং রবীঈ বিন সবীহ বসরায় কিতাব রচনা করেন। ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) মদীনাবাসীদের মধ্যে হাদীস বর্ণনায় বেশি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। সনদের দিক থেকে তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তৎকালীন সাতজন ফক্বীহর চেয়ে তিনিই উমারের ফায়সালা, আব্দুল্লাহ বিন উমার ও আয়িশা (রা.) এবং তাদের অনুসারীদের মতামতের ব্যাপারে অধিক অবগত। তিনি এবং তার মতো অনেকের মাধ্যমেই রিওয়ায়াত ও ফাৎওয়ার জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার কাছে যখন কোন বিষয়ের সমাধান চাওয়া হত, তখন তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন ও ফাৎওয়া দিতেন, ফলে সকলে উপকৃত হতেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) দৃঢ়ভাবে ইবরাহীম আন-নাখঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ও তার অনুসারীদের মাযহাবকে গ্রহণ করেছিলেন। তার মাযহাব থেকে তিনি কখনও বিচ্ছিন্ন হতেন না (তবে আল্লাহ চাইলে কিছুটা ব্যতিক্রম হত)। তার মাযহাবকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তিনি সচেষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে তিনি সূক্ষ্ম নজর রাখতেন। মাসআলার শাখা-প্রশাখা রচনা করতেন। ফিক্বহশাস্ত্র সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অপরিসীম। এখানে তার (আবূ হানীফার) প্রসিদ্ধ অনুসারী আবূ ইউসূফ (রাহিমাহুল্লাহ) এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সময় মুহাম্মাদ বিন হাসান সমসাময়িক বিদ্বানদের মধ্যে গ্রন্থ প্রণয়নে সুদক্ষ পণ্ডিত ছিলেন এবং অধ্যয়নে মনোনিবেশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। তার (মুহাম্মাদ বিন হাসান) ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) ও আবূ ইউসূফ (রাহিমাহুল্লাহ) এর নিকট ফিক্বহ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। অতঃপর মদীনায় গিয়ে ইমাম মালিক রচিত 'মুয়াত্তা' অধ্যয়ন করেন। এর পর নিজ দেশে ফিরে যান। অতঃপর 'মুয়াত্তা' এর যেসব মাসআলা তার অনুসারীদের মাযহাবের সাথে মিলে যেত, সেগুলো আলাদা করে এক এক করে সাজাতেন। আর যদি না মিলত তাহলে দেখতেন যে, যদি সাহাবা ও তাবেঈদের একটি দলের মতামত তার মাযহাবের অনুসারীদের সাথে মিলে যাচ্ছে, তাহলে তিনি সেটিকেই প্রাধান্য দিতেন। যদি তিনি কোন দুর্বল কিয়াস অথবা ব্যাখ্যা (তাখরীজ) পেতেন, যা এমন সহীহ হাদীস বিরোধী যে সহীহ হাদীসের উপর ফক্বীহগণ এবং অধিকাংশ বিদ্বান আমল করতেন, তাহলে তিনি তা (দুর্বল কিয়াস অথবা ব্যাখ্যা) ত্যাগ করে সালফে সালেহীনের বিশুদ্ধ অভিমতটিই গ্রহণ করতেন। তারা (মুহাম্মাদ বিন হাসান ও আবূ ইউসূফ) উভয়ে ইমাম আবূ হানীফার (রাহিমাহুল্লাহ) মতো যথাসাধ্য নাখঈ এর দলীলকেই গ্রহণ করতেন। এজন্য মৌলিকতার সামঞ্জস্য থাকায় তাদের এবং ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবকে একটিই মাযহাব মনে করা হত, যদিও মূল ও শাখাগত ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে তারা স্বতন্ত্র মুজতাহিদ ছিলেন, যা ইমাম আবূ হানীফার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল।

তাদের মাযহাবের প্রকাশকাল এবং ফিক্বহী মূলনীতি ও শাখা প্রণয়নের সূচনা লগ্নে ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) এর আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর তিনি তাদের প্রাথমিক কর্মকাণ্ডে এমন কিছু বিষয় লক্ষ করেন, যা তাকে তাদের পথে চলতে বাধা দেয়। যেমন: তিনি তাদেরকে মুরসাল ও মুনকাতি হাদীস গ্রহণ করতে দেখেন, যাতে অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তিনি তাদের লক্ষ করেছেন যে, বিতর্কিত বিষয়গুলো সমন্বয় সাধনের উপযুক্ত কোন কায়দা বা নিয়ম-কানুন তাদের কাছে ছিল না। ফলে তাদের ইজতিহাদে অনেক ভুলভ্রান্তি স্থান পেয়েছে। এটা লক্ষ করেই তিনি কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করে গ্রন্থাকারে তা লিপিবদ্ধ

www.waytojannah.com

করেন। ফিক্বহ শাস্ত্রের মূলনীতির বিষয়ে এটাই সর্বপ্রথম লিখিত গ্রন্থ। ইমাম শাফেঈ তৎকালীন সময়ে আরও যে বিষয়গুলো লক্ষ করেছেন তা হলো, সাহাবাদের মতামতগুলো তার সময়ই একত্রিত হয়েছে এবং এগুলো ব্যাপকতা লাভ করে বিভিন্ন মতানৈক্য ও শাখা-প্রশাখার উদ্ভব ঘটেছে। তিনি দেখলেন যে এর অধিকাংশই এমন সহীহ হাদীস বিরোধী যেগুলো তাদের কাছে পৌঁছে নি। তিনি (শাফেঈ) সালফে সালেহীনদের দেখেছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে তারা হাদীসের দিকেই ফিরে গেছেন। সুতরাং তিনিও তাদের বিতর্কিত অভিমতগুলোকে পরিত্যাগ করেন এবং বলেন: "তারাও মানুষ আমরাও মানুষ"।

ফক্বীহদের একটি দলকে তিনি দেখেছেন যে, তারা কিয়াস দ্বারা এমন কিছু রায়কে মিশ্রিত করেছেন, যা শরীয়াত অনুমোদন দেয় নি। ফলে এর একটিকে অন্যটি থেকে তারা পৃথক করেন নি।

মোট কথা, তিনি (ইমাম শাফেঈ) যখন এ সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো লক্ষ করলেন, তখন ফিক্বহ শাস্ত্রের মূল মন্ত্রে মনোনিবেশ করে এর কিছু নীতিমালা ও শাখা-প্রশাখা প্রণয়ন করলেন এবং কিছু গ্রন্থ রচনা করলেন, যাতে মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হতে পারে। তার এ কর্মপদ্ধতির উপর ফক্বীহগণ একাত্মতা ঘোষণা করলেন। অতঃপর তারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ ভাবেই ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) এর মাযহাব বিস্তার লাভ করে।

আহলুল হাদীস ও আহলুর রা'য় এর মাঝে মতভেদের কারণ

(أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي)

জেনে রাখুন! তাবেঈ ও তার পরবর্তী যুগের একদল আলিম রায়ের মাঝে ডুবে থাকাকে অপছন্দ করতেন এবং একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ফাৎওয়া প্রদান ও মাসআলা উদ্ভাবন করাকে ভয় পেতেন। হাদীস বর্ণনা করাই ছিল তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে হাদীস ও আসার গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কাজটি প্রসারতা লাভ করে। বিভিন্ন পুস্তিকা ও পাণ্ডুলিপি লেখালেখির কাজ শুরু হয়। অতঃপর তারা তৎকালীন সময়ের বড় বড় বিদ্বানের সাক্ষাৎ লাভের জন্য হিজাজ, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, ইয়ামান ও খোরাসানের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে হাদীসগুলোকে গ্রন্থে একত্র করেন ও বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির অনুকরণে গ্রন্থ প্রণয়ন করার প্রয়াস চালিয়ে যান। ফলে তাদের কাছে এতো হাদীস ও আসার একত্র করা সম্ভব হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে কখনও সম্ভব হয় নি। প্রত্যেক অঞ্চলের ফক্বীহ সাহাবী ও তাবেঈদের যে আসারসমূহ মুফতীদের কাছে গোপন হয়েছিল এ সময়ে তাদের কাছে তা একত্রিত হয়ে যায়। এর পূর্বে কারও পক্ষে নিজ অঞ্চল ও স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের হাদীস সংকলন ছাড়া দূরবর্তী কোন অঞ্চলে গিয়ে হাদীস সংকলন করা সম্ভব হয় নি। এ সময়ে গ্রন্থায়ন, আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে হাদীসের সনদগত অস্পষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট করা সম্ভব হয়েছে।

অতঃপর বর্ণনা শাস্ত্রের বিধান তৈরি ও হাদীস জানার পর সে সময়ের মুহাক্কিকগণ ফিক্বহের দিকে মনোনিবেশ করেন। এ সময় তাদের কাছে পূর্ববর্তী কোন ব্যক্তির তাক্বলীদের উপর ঐকমত্য পোষণ করা হবে এমন কোন রায়ের অস্তিত্ব ছিল না, যদিও প্রত্যেকটি মাযহাবের নীতিমালা বিরোধী হাদীস ও আসার লক্ষ করা যেত। এ যুগে ও এর পূর্ববর্তী যুগে যে সমস্ত মাসআলা-মাসায়েলের সমালোচনা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে তারা মারফূ, মুত্তাসিল, মুরসাল অথবা মাওকূফ হাদীসর মধ্যে যে কোন একটি হাদীস পেয়েছেন কিংবা শাইখাইন, সমস্ত খলীফা অথবা বিভিন্ন অঞ্চলের ফক্বীহ ও কাজীদের আসার সমূহের

Contents

মধ্যে কোন আসার পেয়েছেন। ফলে এভাবেই আল্লাহ তাদের জন্য সুন্নাতের উপর আমল করা সহজ করে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, হাদীসের রিওয়ায়াতের ব্যাপারে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী, হাদীসের স্তর জানার ক্ষেত্রে সুপণ্ডিত ও ফিক্বহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হলেন, আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ)। এরপর ইসহাক বিন রাহওয়াই (রাহিমাহুল্লাহ)। ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) কে বলেন: "আপনারা আমাদের চেয়ে সহীহ খবরের ব্যাপারে বেশি অবগত। সুতরাং কোন সহীহ খবর পেলে আমাকে জানাবেন। কুফা, বসরা অথবা সিরিয়ার যে কোন অঞ্চলই হোক না কেন আমি সেখানে গিয়ে তা সংগ্রহ করব"।

এদের উত্তরসূরী হিসেবে একটি দল মনে করল যে, তাদের পূর্ব অনুসারীগণ যথেষ্ট পরিমাণ হাদীস সংগ্রহ ও সরবরাহ করেছেন এবং এর মূলনীতির উপর ফিক্বহ শাস্ত্র রচনা করেছেন। ফলে তারা অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করলেন। যেমন:

(১) ইয়াযিদ বিন হারুন, ইয়াইয়া আল কাত্তান, আহমাদ ও ইসহাকসহ আরও যে সমস্ত হাদীস বিশারদ যে হাদীসগুলো সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তা বাছাই করার কাজ।
(২) বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের ফক্বীহ এবং বিদ্বানগণ যে ফিক্বহ শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে মাযহাব রচনা করেছেন, সে সমস্ত হাদীসগুলো একত্রিত করার কাজ।
(৩) প্রত্যেক হাদীসের উপযুক্ত বিধান দানের কাজ এবং
(৪) প্রত্যেক এমন হাদীসের উপযুক্ত বিধান দানের কাজ যে হাদীসগুলো পূর্ব যুগ থেকেই ব্যাখ্যা করা হয় নি, এর মধ্যে শা'য ও ফা'য এর মত বিরল বর্ণনার হাদীসও রয়েছে।

এ সব মহৎ কাজগুলো এ যুগের বিদ্বানগণ সম্পূর্ণ করেন। এক্ষেত্রে যারা বড় অবদান রেখেছেন তারা হলেন, ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, আবদ বিন হুমাইদ, দারেমী, ইবনে মাজাহ, আবূ ই'য়ালা, তিরমিযী, নাসাঈ, দারাকুত্বনী, হাকেম ও বাইহাক্বী (রাহিমাহুমুল্লাহ) সহ আরও অনেকেই।

অন্যদিকে এদের বিপরীতে ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ), সুফইয়ান ও তাদের পরবর্তীদের যুগে এমন একটি দলকে দেখা গেছে, যারা মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করাকে অপছন্দ করতেন না এবং ফাৎওয়া প্রদান করতে ভয় পেতেন না। বরং তারা হাদীস বর্ণনা করতে ও তা রাসূল (সা:) এর দিকে সম্বোধন করতে ভয় পেতেন। এমন কি শা'বী বলেন: "যিনি রাসূল (ﷺ) এর বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা করবেন, তিনি আমাদের কাছে খুবই প্রিয় ব্যক্তি। তবে কেউ রাসূল (ﷺ) এর বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে কোন কম-বেশি করলে, তার দায়ভার সে নিজেই বহন করবে"।

ফলে তাদের প্রয়োজনে হাদীস, ফিক্বহ ও মাসআলা-মাসায়েল লিপিবদ্ধের কাজ শুরু হয়। তার কারণ হল, তাদের কাছে তেমন কোন হাদীস ও আসার ছিল না, যার দ্বারা তারা হাদীস বিশারদদের নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী ফিক্বহী মাসআলা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবে। সে সময় বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্বানদের মতামতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার জন্য, মতামতগুলো সংকলন ও সে ব্যাপারে আলোচনা

www.waytojannah.com

করার জন্য তাদের অন্তর সুপ্রসন্ন হয় নি। এ ব্যাপারে তারা নিজেদেরকেই দায়ী করেন। তারা তাদের ইমামদেরকে এমন বিশ্বাস করতেন যে, তারা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন। তাদের অন্তর তাদের অনুসারীদের প্রতি ব্যাপকভাবে ঝুঁকে পড়েছিল। যেমনটি ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "ইবরাহীম নাখঈ সালিমের চাইতে ফিক্বহ শাস্ত্রে বেশি অভিজ্ঞ। যদি সাহাবাদের মর্যাদা বেশি না হত তাহলে আমি বলতাম যে, ইবনে উমার (رضي الله عنه) এর চাইতে আলকামাহ ফিক্বহ শাস্ত্রে বেশি অভিজ্ঞ"।

তাদের ছিল তীক্ষ্ম মেধা শক্তি, সচেতন যুক্তি-তর্ক ও দ্রুত এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ের দিকে ধাবিত হওয়ার জ্ঞান, যার মাধ্যমে তারা তাদের অনুসারীদের মতামতের বিবিধ মাসআলার জওয়াব উদ্ভাবন করতে সক্ষম হতেন। ফলে তারা ব্যাখ্যার নিয়মানুসারে ফিক্বহ শাস্ত্র রচনা করেন। এভাবে বিভিন্ন মাযহাবের ব্যাখ্যার কার্যক্রম চালু হয়ে তা ব্যাপকতা লাভ করে। প্রত্যেক মাযহারের মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ বিদ্বান ছিলেন, তাদের কাছে বিভিন্ন বিচার-ফায়সালা ও ফাৎওয়ার দায়িত্ব অর্পিত হত। ফলে তাদের গ্রন্থগুলো জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তা ছড়িয়ে পড়ে।

এ সময় মাদরাসাতুল হাদীস ও মাদরাসাতুল ফিক্বহ নামে দু'ধরণের মাদরাসার সূচনা হয়। এ দু'টিকে (হাদীস ও ফিক্বহ) লক্ষ্য করে আল্লামা খত্ত্বাবী 'মা'আলিমুস সুনান' গ্রন্থ রচনা করে বলেন:[২২]

"আমাদের যামানায় বিদ্বানদের দেখা যায় যে, তারা দু'টি বিষয় অর্জন করেছে এবং দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে:

১. হাদীস ও আসার এর অনুসারী।

২. ফিক্বহ ও যুক্তির (নাযর) অনুসারী।

তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে একটি অপরটির মুখাপেক্ষী। কেননা ভিত্তির দিকে লক্ষ্য করে হাদীস হচ্ছে আসল এবং স্থাপনার দিকে লক্ষ্য করে ফিক্বহ হচ্ছে তার শাখা-প্রশাখা। স্থাপনা যদি মূল ভিত্তির উপর না রাখা হয়, তাহলে সেটা অকার্যকর হবে এবং ভিত ছাড়া বিল্ডিং তৈরি করলে সেটি অকেজো ও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আমি উভয় দলকে পেয়েছি নিকটতম প্রতিবেশী ও পাশাপাশি দু'টি বাড়ীর মত। প্রত্যেকটি দল একে অপরের ব্যাপক প্রয়োজনে আসে। তাদের উভয়কেই তার সাথীর নিকট জরুরী ভিত্তিতে দরকার হয়। তারা যেন হিজরতকারী ভাইয়ের মতো। কোন প্রকার প্রাধান্য ছাড়াই সঠিক পথে চলার জন্য একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে যারা হাদীস ও আসারের অনুসারী তাদের অধিকাংশই রিওয়ায়াত বা বর্ণনার অনুরাগী, বিভিন্ন পদ্ধতি একত্রিতকারী, গরীব ও শা'য হাদীস অনুসন্ধানকারী, যার অধিকাংশই জাল অথবা মাকলূব বা পরিবর্তিত। তারা হাদীসের মূল ভাষ্যের দিকে লক্ষ্য করে না, অর্থও বুঝে না এবং এর গোপন ভেদ ও গুঢ় রহস্যও উদ্ভাবন করতে পারে না। বরং ফক্বীহদের সমালোচনা করে, তাদের বাঁকা চোখে দেখে এবং সুন্নাত বিরোধী আখ্যা দেয়। তারা এটা বুঝতে পারে না যে, তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা খুব সামান্য এবং এটাও বুঝে না যে, ফক্বীহদের গালি দেয়া পাপের কাজ।

---

[২২] আল্লামা খত্ত্বাবী প্রণীত'মা'আলিমুস সুনান' (১/৭৫-৭৬)।

Contents

অপরদিকে যারা ফিক্‌হ ও নাযর (যুক্তি) এর অনুসারী তাদের অধিকাংশই স্বল্প হাদীস ছাড়া তেমন হাদীস বর্ণনা করে না। তারা সহীহ হাদীসকে যঈফ থেকে পৃথক করে না। উত্তম হাদীসকে নিম্নমানের হাদীস থেকে আলাদা করে না। তাদের কাছে যে হাদীস পৌঁছে তা তাদের দাবীকৃত মাযহাবের অনুকূলে হয়ে গেলে এবং তাদের বিশ্বাসকৃত মাযহাবের মত অনুযায়ী হলে বিতর্কিত বিষয়ে তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করতে আপত্তি করে না। কোন যঈফ ও মুনকাতি হাদীস যদি তাদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করে তাহলে সেই যঈফ ও মুনকাতি হাদীস গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পরিভাষা তৈরি করে। এভাবে ক্রমাগতভাবে কোন নির্ভরযোগ্যতা ও নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়াই তাদের মাঝে বিভিন্ন মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে রাবীর বর্ণনা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটে এবং তাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

এদের মধ্যে একটি দল ছিল, (আল্লাহ তাদের তাওফীক্ব দান করুন) যদি তাদের কাছে তাদের মাযহাবের বিদ্বানগণ ও তাদের দলনেতারা নিজের পক্ষ থেকে ইজতিহাদ করে কোন কথা বর্ণনা করেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে তারা নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টা তালাশ করেন এবং তারা কোন চুক্তি বা অঙ্গীকার চাইতেন না। ফলে আমি ইমাম মালিকের অনুসারীদের পেয়েছি যে, তারা তাদের মাযহাবের মধ্যে ইবনে কাসিম, আশহাব ও তাদের উভয়ের মত মহৎ ব্যক্তিদের বর্ণনা ছাড়া অন্য কোন বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন না। যদি আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকাম ও তার সমপর্যায়ের বর্ণনা তাদের কাছে আসত তাহলে সেটাকে তারা তেমন গুরুত্ব দিতেন না। ইমাম আবূ হানীফা (রাহি.) এর অনুসারীদের দেখবেন যে, তারা স্বীয় অনুসারীদের মধ্যে হতে আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ বিন হাসান, আলিয়্যাহ এবং তার (আবূ হানীফার) গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রদের বর্ণনা ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করতেন না। যদি তাদের কাছে হাসান বিন যিয়াদ আল্‌লু'লু এবং তার মত বর্ণনাকারীদের কোন মতামত আসত, যা ইমাম আবূ হানীফার মতের বিরোধী তাহলে তারা তা গ্রহণও করতেন না এবং বিশ্বাসও করতেন না। অনুরূপভাবে আপনি ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এর অনুসারীদের দেখবেন যে, তারা তার মাযহাবের মধ্যে মাযিনী, রাবীঈ বিন সুলাইমান আল মারাদী এর বর্ণনাকে প্রাধান্য দেন। যদি তাদের কাছে খুযায়মাহ, জারমী এবং তাদের মত বিদ্বানের কোন বর্ণনা আসে, তাহলে তার দিকে তারা ভ্রুক্ষেপ করতেন না এবং এটাকে তার (শাফেঈর) মতামত বলে গণ্য করতেন না। এভাবে ধর্মীয় বিধানের ক্ষেত্রে স্ব-স্ব মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেক মাযহাবের ইমাম ও উস্তাদের গোঁড়ামীর অভ্যাস ছিল। তাদের অবস্থা যদি এ রূপই হয় যে তারা শাখাগত মাসআলা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত শাইখদের ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট না হন, তাহলে কিভাবে তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজ সম্পূর্ণ করা সহজ হবে? আর কিভাবে তারা সকল ইমামের ইমাম ও মহান প্রভুর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) এর রিওয়ায়াত ও বর্ণনার প্রতি ভরসা রাখবে? অথচ রাসূল (ﷺ) এর হুকুম পালন করা ওয়াজিব ও তাঁর আনুগত্য করা আবশ্যক, তাঁর হুকুমের নিকট আত্মসমর্পণ করা ও তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা আমাদের উপর অপরিহার্য। এমনকি তিনি যে ফায়সালা দিয়েছেন সে ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোন দ্বিধা রাখা যাবে না এবং তাঁর সমাধান ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্তরে কোন প্রকার বিদ্বেষ রাখা যাবে না। ভেবে দেখেছেন কি যে, কোন ব্যক্তি যখন নিজের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে এবং তার নিজের অধিকারের ব্যাপারে প্রতিপক্ষের প্রতি উদার হয়ে তাদের কাছ থেকে অবৈধ টাকা বা সম্পদ গ্রহণ করে এবং এর প্রতিদানে তাদের দোষত্রুটি ঢেকে রাখে। সুতরাং অন্যের পক্ষে যখন সে প্রতিনিধিত্ব করবে তখন কি তার অধিকারের ক্ষেত্রে এরূপ করা বৈধ হবে? যেমন দুর্বলের প্রতিনিধিত্ব করা, ইয়াতিমের অভিভাবক হওয়া

www.waytojannah.com

এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির উকিল হওয়া! এরূপ করলে সে ওয়াদার খিয়ানতকারী ও দায়িত্বের প্রতি **বিশ্বাস** ঘাতকতাকারী ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে বিবেচিত হবে কি? এই দৃষ্টান্তটি বাস্তবে হতে পারে কিংবা **নিছক** উদাহরণ হতে পারে।

কিন্তু কিছু সংখ্যক দল রয়েছে যারা সত্যের পথকে কঠিন মনে করেছে। এ ক্ষেত্রে তারা সহনশীলতা দেখানোকে ভাল মনে করেছে। এরা দ্রুত প্রাপ্তিকে পছন্দ করেছে। ফলে তারা জ্ঞানের পথকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। সামান্য জ্ঞানের উপর তারা সীমাবদ্ধ থেকেছে এবং উসূলে ফিক্বহ এর পরিভাষাগত সামান্য কিছু শব্দের উপর অনড় থেকেছে যেগুলোকে তারা 'ইলাল' বা কারণ হিসেবে নামকরণ করে থাকে। এ গুলোকেই তারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও অনুসরণের ক্ষেত্রে নিজেদের জন্য মডেল বানিয়ে নিয়েছে। এটাকে তারা নিজেদের বিবাদের সময় ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। এটাকে অনর্থক কথা ও ঝগড়া-ঝাটির মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। এর দ্বারা তারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং এর উপর ভিত্তি করে একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। এ বিবাদের সমাধানের জন্য যখন তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সমাধান দিয়ে থাকেন। ফলে তিনি ঐ যুগের একজন উল্লেখযোগ্য ফক্বীহ হিসেবে অভিহিত হন। তার দেশে ও শহরে তিনি সম্মানিত একজন নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

এ দলটিকে শয়তান সুক্ষ্ম কৌশলে কুমন্ত্রণা দিয়েছে এবং নিপুণ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের মাঝে ঢুকে পড়েছে। শয়তান তাদের বলে, তোমাদের কাছে যা আছে তা তো সংক্ষিপ্ত জ্ঞান, এটা নগণ্য পণ্যের মতো, এর দ্বারা প্রয়োজন ও পরিপূর্ণতায় পৌঁছা যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে বিভিন্ন কথার সাহায্য নাও, এর সাথে বিচ্ছিন্ন কথা মিলিয়ে দাও এবং বিদ্বানদের নীতিমালার সহযোগিতা নাও; যাতে কোন ব্যক্তির মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধি পায়। এভাবেই ইবলিস তাদের প্রতি তার ধারণাকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে এবং তাদের অনেকেই তার আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে। তবে মু'মিনদের একটি দল ইবলিসের অনুসরণ করে নি। সুতরাং বিবেকবান ব্যক্তিবর্গের জন্য পরিতাপ! শয়তান তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের লক্ষ্যস্থল ও সঠিক পথ থেকে ধোঁকা দিয়ে কোন দিকে পথ দেখাচ্ছে? আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। ইমাম খত্ত্বাবীর (রাহিমাহুল্লাহ) উক্তি এখানে শেষ হল।

Contents

১ম ও ২য় শতাব্দীতে মানুষের অবস্থা

জেনে রাখুন! ১ম ও ২য় শতাব্দীতে মানুষ কোন মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ করতেন না। এ ব্যাপারে আবূ তালিব আল মক্কী 'কূতুল কুলূব' গ্রন্থে বলেন "গ্রন্থাবলী ও দলসমূহ নব আবিষ্কৃত। বিভিন্ন বক্তব্য, একই মাযহাবের মাধ্যমে ফাৎওয়া দেয়া, সে মাযহাবের অভিমতকেই গ্রহণ করা, সকল ক্ষেত্রে সে মাযহাবেরই উদ্ধৃতি দেয়া এবং সে মাযহাবের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করার আগ্রহ ১ম ও ২য় শতাব্দীর মানুষের মাঝে ছিল না"।

ইবনে হুমাম 'তাহরীর' গ্রন্থে বলেন: "তারা একবার এক জনের কাছে ফাৎওয়া চাইতেন, আবার অন্য জনের কাছেও চাইতেন। তারা কোন একজনের ফাৎওয়ার উপর অটল থাকা আবশ্যক মনে করতেন না"।

সে সময়ের বিদ্বানগণ ২টি স্তরে বিভক্ত ছিলেন। একদল কিতাব, সুন্নাহ ও আসার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আগ্রহী ছিলেন। এমন কি তারা অধিকাংশ ঘটনার ক্ষেত্রে মানুষের ফাৎওয়ার ও তাদের প্রশ্নের সমাধান দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতেন। ফলে তাদের অধিকাংশ উত্তর কুরআন, সুন্নাহ ও আসারের উপর নির্ভরশীল ছিল। এ শ্রেণীর বিদ্বানকে "মুজতাহিদ" (গবেষক) নামে অভিহিত করা হত।

অপর একদল বিদ্বান কুরআন ও সুন্নাহ এর এতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যা দ্বারা বিস্তারিত দলীলের মাধ্যমে ফিক্বহের মূলমন্ত্র ও মৌলিক মাসআলাগুলোর জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়েছিল। কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ হতে দলীল গ্রহণের মাধ্যমে তাদের কাছে প্রবল মতামত অর্জিত হয়েছে। আর কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে তারা নীরব ভূমিকা পালন করেছেন এবং এর জন্য তারা বিদ্বানদের পরামর্শের মুখাপেক্ষী হয়েছেন। কেননা সাধারণ মুজতাহিদের কাছে পরিপূর্ণ ভাবে ফাৎওয়া প্রদানের যে উপকরণ থাকে তাদের কাছে সে সকল উপকরণ ছিল না। সুতরাং এ শ্রেণীর বিদ্বানগণ কোন ক্ষেত্রে মুজতাহিদ এবং কোন ক্ষেত্রে মুজতাহিদ নন। অথচ সাহাবা ও তাবেঈদের যুগ থেকে এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে যে, তাদের কাছে যখন হাদীস পৌঁছতো তখন তারা কোন শর্ত আরোপ করা ছাড়াই তার উপর আমল করতেন।

২য় শতাব্দীর পর মুজতাহিদদের মাযহাবের প্রকাশ

২য় শতাব্দীর পর মুজতাহিদদের স্ব-স্ব মাযহাবের আবির্ভাব ঘটে। এরূপ মানুষ খুব কমই ছিলেন যারা স্ব-স্ব মুজতাহিদদের মাযহাবের উপর নির্ভর করতেন না। এ সময়ে যে সকল মুজতাহিদ ফিক্বহ বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন, তারা নিম্নোক্ত দু'টি অবস্থা থেকে মুক্ত ছিলেন না:

১। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মুজতাহিদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল পূর্বের মুজতাহিদগণ যে মাসআলাগুলোর উত্তর দিয়েছেন সেগুলো বিস্তারিত দলীলসহ, সমালোচনাসহ ও সংশোধনসহ বুঝার চেষ্টা করা এবং একটিকে আরেকটির উপর প্রধান্য দেয়া। এ শ্রেণীর মুজতাহিদদের জন্য আবশ্যক ছিল পূর্বের ইমামের ফাৎওয়াটিকে সুন্দর করা এবং এতে কিছু সংযোজন করা। যদি তার সংযোজনটা তার অনুসৃত মাযহাবের ইমামের মতামত অনুযায়ী হওয়ার ক্ষেত্রে কম হত, তাহলে তাকে একই মাযহাবের ভিন্ন ধারার চিন্তাবিদ হিসেবে গণ্য করা হত। আর যদি সংযোজনটা বেশি হত, তাহলেও তাকে মাযহাবের দিক থেকে আলাদা

www.waytojannah.com

ভাবা হত না। এতদসত্ত্বেও তাকে মাযহাবের একজন অনুসারী হিসেবেই সম্বোধন করা হত এবং তাকে ঐ ব্যক্তি হতেও আলাদা ধরা হত, যে ব্যক্তি স্বীয় মাযহাবের মৌলিক বিষয়ে ও শাখা বিষয়ের অনেক ক্ষেত্রে অন্য ইমামের প্রতি সহানুভূতিশীল। এ সময়ে এমন কিছু গবেষণা পাওয়া গেছে, যে বিষয়ে পূর্বে কোন সমাধান দেয়া হয় নি। যেহেতু ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটতেই থাকে। আর (ইজতিহাদের) দরজাও তো উন্মুক্ত রয়েছে। ফলে তারা স্বীয় ইমামের উপর ভরসা না করে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের আসারের মাধ্যমে এর সমাধান গ্রহণ করেছেন। তবে পূর্বের সমাধানের চেয়ে এটা খুব কমই হত। একে সেই মাযহাবের দিকে সম্বন্ধিত একজন সাধারণ মুজতাহিদ হিসেবে ধরা হত।

২। অপর শ্রেণীর মুজতাহিদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল সমসাময়িক যুগে উদ্ভাবিত এমন ফাৎওয়ার মাসআলা সম্পর্কে জানা, যে ব্যাপারে পূর্ববর্তীগণ কোন আলোচনা করেন নি। এ ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় অনুসৃত মাযহাবের ইমামের তৈরিকৃত সকল মূলনীতির উপর সহানুভূতিশীল হয়ে ফাৎওয়া দিতেন। এ নীতি পূর্বোল্লেখিত প্রথম শ্রেণীর নীতির চেয়ে মারাত্মক। এর কারণ হিসেবে তারা বলেন: ফিক্বহ এর মাসআলাগুলো একটি অপরটির সাথে জড়িত বা সম্পর্কিত। এর শাখাগুলো তার মূল নীতিমালার সাথে সম্পৃক্ত। যদি তিনি তাদের মাযহাবের সমালোচনা ও সংশোধন শুরু করেন, তাহলে তিনি এমন কাজকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিবেন যা তিনি করতে সক্ষম নন। তিনি সারা জীবনেও তা সমাধান করে শেষ করতে পারবেন না। সুতরাং পূর্বের নীতির দিকে দৃষ্টি দেয়া ছাড়া ও শাখা-প্রশাখাগুলোকে পূর্বের নীতির সাথে জড়িত করা ছাড়া তার কোন পথ নেই। এ সময় কুরআন, সুন্নাহ, সালাফদের আসার ও কিয়াস দ্বারা ইমামের মতের উপর এরূপ কিছুটা সংযোজন করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে তা প্রয়োজন অনুযায়ী খুবই কম। আর এ ধরনের মুজতাহিদকে সে মাযহাবের একজন মুজতাহিদ হিসেবে ধরা হয়।

৪র্থ শতাব্দীর পর মানুষের মাঝে যা ঘটেছিল

অতঃপর এ শতাব্দী পর অপর একদল মানুষ ছিল, যাদের কেউ ডান পন্থি, কেউ আবার বামপন্থি। তাদের মাঝে যা ঘটেছিল তার বর্ণনা নিম্নরূপ:

ইলমে ফিক্বহ ও তার ব্যাখ্যার ব্যাপারে মানুষের মাঝে মতভেদ ও ঝগড়া-বিবাদ লক্ষ করা যেত। ইমাম গাযালী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেন:

খোলাফায়ে রাশেদার যুগের সমাপ্তির পর অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ গোষ্ঠী খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তারা ফাৎওয়ার জ্ঞান ও বিধানের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। যার ফলে তারা ফক্বীহদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছিল এবং সর্বাবস্থায় তাদের (ফুক্বাহাদের) সঙ্গী হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। তবে কিছু সংখ্যক আলিম পূর্বের নীতিতে অনড় ছিলেন এবং দীনের হক্ব দলকে শক্তভাবে ধরে রেখেছিলেন। যখন তাদের ডাকা হত তখন তারা পলায়ন করতেন ও এড়িয়ে যেতেন। সে যুগের লোকেরা আলিমদের সম্মান লক্ষ্য করল এবং আলিমদের উপেক্ষা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সমসাময়িক নেতৃবর্গের আগ্রহ প্রত্যক্ষ করল। ফলে এ যুগের মানুষেরা সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের আশায় জ্ঞান অন্বেষণের পথ বেছে নিল।

Contents

তাদের স্বপক্ষে মানুষ যুক্তিবিদ্যা, যুক্তিতর্ক, সাওয়াল জওয়াব ও বিবাদের পথ উন্মুক্ত হয় এমন কিছু রচনা করল। এভাবে অনেক ঘটনার সূত্রপাত হয়।

অপরদিকে একদল তাক্বলীদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত। তাদের মাঝে এ বিশ্বাস পিপীলিকার ন্যায় চলাচল করতে লাগল অথচ তারা তা নিজেরা বুঝতে পারত না। এর কারণ হল, ফক্বীহগণ প্রতিযোগিতা করতেন ও তাদের মাঝে বিবাদ লেগে থাকত। কেউ কোন ফাৎওয়া প্রদান করলে তার ফাৎওয়া প্রত্যাখ্যান করে পাল্টা জবাব দেয়া হত। পূর্বের আলিমগণ কর্তৃক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত বিতর্ক বন্ধ হত না। অনেক সমস্যা কাজীদের নিকট আসত আর তারা এর সমাধান দেয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তারা আমানতদার না হওয়ার কারণে তাদের ফায়সালা গৃহীত হত না। তবে জনসাধারণের এ ব্যাপারে সন্দেহ না হলে এবং ইতিপূর্বে বলা হয়েছে এমন হলে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

আর কখনও কখনও তারা তাক্বলীদ প্রত্যাখ্যান করে কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমলের দাবীর মুখে তাদের ইমামদের কথাকে সংক্ষিপ্ত করেছেন এবং মতানৈক্যগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের পছন্দনীয় ইমামদের নির্বাচন করেছেন। ফলে তাদের পর নির্ভেজাল তাক্বলীদের যুগের আবির্ভাব ঘটেছে। যার ফলে তারা হক্ব থেকে বাতিলকে পার্থক্য করতে পারেন না এবং উদ্ভাবনী ফাৎওয়া থেকে বিবাদকে আলাদা করতে পারেন না। এভাবে তাদের মাঝে মাযহাবের গোঁড়ামীর আবির্ভাব ঘটে। এ থেকে বিভক্তির সূচনা হয় এবং তারা একে অপরকে বিভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেন। এমনকি কেউ যদি স্বীয় মাযহাবের একটি মাসআলার ক্ষেত্রেও বিপরীত মত অবলম্বন করেন তাহলে তাকে মিল্লাত বহির্ভূত বলে আখ্যায়িত করা হতো। মাযহাবের ইমাম যেন আল্লাহর প্রেরিত নাবী। তার আনুগত্য করা যেন ফরয হয়ে পড়েছে। এর পর এমন লোকের আবির্ভাব ঘটল যিনি ফাৎওয়া দিতেন যে, হানাফী অনুসারীগণের ইমাম শাফেঈর অনুসারী হওয়া না জায়েয এবং শাফেঈদের সাথে হানাফীদের বিবাহ দেয়া না জায়েয। তবে অন্যান্য লোকজন "আহলে কিতাবকে বিবাহ করা জায়েয" এর উপর ভিত্তি করে শাফেঈদের সাথে হানাফীদের বিবাহ জায়েয মনে করতেন।

এ বিদ'আতের আবির্ভাবের ফলে মাসজিদে হারামে চার জায়গায় চার ইমামের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান সৃষ্টি হয়[২৩] এবং বিভিন্ন দল ও উপদলের সূচনা হতে থাকে। প্রত্যেকেই স্বীয় মাযহাবের লোকজনকে সহযোগিতা করত। এরূপ বিদ'আতের আবির্ভাবের ফলে সুযোগ বুঝে ইবলিস তার স্থান দখল করে বসে। সাবধান! এতে মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি ও অনৈক্য দেখা দেয়। আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন!

এর পর আরও অধিক ফেতনা-ফাসাদের যুগ আসল এবং তাক্বলীদে (দলীলবিহীন অনুসরণ) ভরপুর হয়ে গেল। মানুষের অন্তর হতে সুকৌশলে আমানত ছিনিয়ে নেয়া হলো। এমনকি তারা দীনের ব্যাপারে নিরর্থক কথা বলা পরিত্যাগ করে এ কথা বলে তুষ্ট হল যে:

﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾

নিশ্চয় আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক মতাদর্শের উপর পেয়েছি তাই আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি *(সূরা যুখরুফ-২৩)*। তারা আরও বলল যে, আল্লাহর কাছে আমরা অভিযোগ সোপর্দ করলাম, তিনিই সাহায্যকারী। তার প্রতি আমাদের আস্থা ও নির্ভরতা।

---

[২৩] এটা আল-মা'সূমী 'হাদিইয়্যাতুস সুলতান' গ্রন্থে (পৃ:৪৮) উল্লেখ করেছেন।

www.waytojannah.com

এতদসত্ত্বেও আল্লাহর বান্দার মধ্য হতে একটি হক্বপন্থি দল থেকেই গেছে, যাদেরকে কেউ অপমানিত করলেও তাদের কোন ক্ষতি হয় না। তারাই আল্লাহর জমীনে তাঁর একনিষ্ঠ সৈনিক। যদিও তারা সংখ্যায় কম। আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করেন। ফিক্বহী মাযহাব সৃষ্টি এবং মতভেদের এই আলোচনা উপস্থাপনের পর আমি **কিছু সতর্কবাণী** পাঠক মহলে উপস্থাপন করতে চাই। যাতে আল্লাহর বান্দার মধ্যে তিনি যাকে ইচ্ছা এর দ্বারা উপকার দেন।

প্রথম সতর্কবাণী: কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করা ওয়াজিব[২৪]

জেনে রাখা আবশ্যক যে, কুরআন ও সুন্নায় বহু দলীল রয়েছে। সুতরাং সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির উচিত একতাবদ্ধ হয়ে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) এর উপর আমল করা।
আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾

তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর *(সূরা : আল আ'রাফ-৩)* ।

"আল্লাহ তোমাদের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, 'কুরআন' এবং এর ব্যাখ্যাকারী গ্রন্থ 'হাদীস'। কোন মানুষের মতামত নয়। আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আস যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন মুনাফিকদেরকে দেখবে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে *(সূরা : আন-নিসা-৬১)* ।

এ আয়াত এ কথাই প্রমাণ করছে যে, যখন তাকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার আহ্বান জানানো হয় তখন তা থেকে যে বিমুখ হয় তার চরিত্র সম্পূর্ণ মুনাফিকের মত। কেননা উপদেশ দেয়া হয় আম শব্দের মাধ্যমে, বিশেষ কারণের দ্বারা নয়। আল্লাহ বলেন:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ *(সূরা : আন-নিসা-৫৯)*।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হল, তাঁর কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর রাসূল (ﷺ) এর মৃত্যুর পর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হল তাঁর সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

আর এ বিষয়টিকে ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হচ্ছে যে, إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। তথা দ্বন্দ্ব নিরসনকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন

[২৪] 'আযওয়াউল বায়ান' (৭/৪৭৯-৪৮৫) ।

Contents

করাই হল প্রকৃত ঈমানের পরিচয়। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, যদি কেউ দ্বন্দ্ব নিরসনে কিতাব ও সুন্নাহ ছাড়া অন্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে সে ঈমানদার নয়।

আল্লাহ বলেন:

﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে আযাব আসার পূর্বেই তোমাদের কাছে রবের পক্ষ থেকে যে উত্তম ওহী নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ কর *(সূরা যুমার-৫৫)*।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কুরআন হল সর্বোত্তম কিতাব যা আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর সুন্নাত হল, কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে যে উত্তম কিতাব আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে, যারা তার অনুসরণ করবে না তাদের কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারী দিয়ে আল্লাহ বলেছেন:

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে আযাব আসার পূর্বেই *(সূরা যুমার-৫৫)*।

আল্লাহ বলেন:

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে অতঃপর এর যা উত্তম তা অনুসরণ করে তাদেরকেই আল্লাহ হিদায়াত দান করেন আর তারাই বুদ্ধিমান *(সূরা যুমার-১৮)*।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন ব্যক্তির মতামতের চেয়ে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) অতি উত্তম। আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর *(সূরা হাশর-৭)*।

আল্লাহর বাণী: " إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " এর মাধ্যমে যারা সুন্নাতে রাসূলের প্রতি আমল করবে না তাদের কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে যারা মনে করবে যে, অনুসরণের জন্য কোন ব্যক্তির মতামতই যথেষ্ট।

আল্লাহ বলেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে *(সূরা : আল-আহযাব-২১)*।

www.waytojannah.com

এখানে 'أُسْوَةٌ' অর্থ اقتداء তথা অনুসরণ করা। সুতরাং মুসলমানের উচিত রাসূল (ﷺ) এর আদর্শে জীবন গঠন করা। আর এটাই হবে তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ।

আল্লাহ বলেন:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

তোমার প্রতিপালকের শপথ তারা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ নিরসনে তোমাকে বিচারক মানবে, অতঃপর তোমার মীমাংসায় নিজেদের মনে কোন সংকীর্ণতা অনুভব করবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে মেনে নিবে *(সূরা নিসা-৬৫)*।

আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতে কসম করে বলছেন যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের বিতর্কিত বিষয়ের ফায়সালা রাসূল (ﷺ) এর মাধ্যমে গ্রহণ করবে।

আল্লাহ বলেন:

﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

অতঃপর তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ, তারা তো নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। আর আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত করেন না *(সূরা : কাসাস-৫০)*।

রাসূল (ﷺ) এর মৃত্যুর পর তার অনুসরণ করা বলতে তাঁর সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে বুঝায়। এ সুন্নাতই হল কিতাবুল্লাহর ব্যাখ্যাকারী। মহাগ্রন্থ কুরআনে এসেছে যে, নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) ওহী ছাড়া কোন কিছুর অনুসরণ করতেন না। আর যে রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করল সে যেন স্বয়ং আল্লাহরই আনুগত্য করল।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

বল, আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন পরিবর্তনের অধিকার নেই। আমিতো শুধু আমার প্রতি অবতীর্ণ ওহীর অনুসরণ করি। নিশ্চয় আমি যদি রবের অবাধ্য হই তবে ভয় করি কঠিন দিবসের আযাবের *(ইউনুস-১৫)*।

তিনি আরও বলেন:

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾

বল, 'তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার নিকট আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি এবং তোমাদেরকে বলি না, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়' *(সূরা : আনআম-৫০)*।

তিনি সূরা আহকাফ এর মধ্যে বলেন:

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾

Contents

বল, 'আমি রাসূলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আর আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র *(সূরা আহকাফ-৯)*।

আল্লাহ সূরা আম্বিয়ার মধ্যে বলেন:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ﴾

বল, 'আমি তো কেবল ওহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি'। কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে আহ্বান শুনে না *(সূরা আম্বিয়া-৪৫)*।

সুতরাং ভীতি প্রদর্শন শুধু ওহীর মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ, অন্য কিছুর মাধ্যমে নয়।

আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾

বল, 'যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাই তবে আমার অকল্যাণেই আমি পথভ্রষ্ট হব। আর যদি আমি হিদায়াত প্রাপ্ত হই তবে তা এজন্য যে, আমার রব আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও অতি নিকটবর্তী *(সূরা : সাবা-৫০)*।

সুতরাং বুঝা গেল যে, ওহীর পথই হল হিদায়াতের পথ। এরূপ আরও অনেক আয়াত রয়েছে। যখন উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, রাসূল (ﷺ) এর পথ হল, ওহীর অনুসরণ করা। সুতরাং জানা আবশ্যক যে, কুরআন রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। আর রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করা মানে আল্লাহর আনুগত্য করা।

যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾

যে রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল *(নিসা-৮০)*।

আল্লাহ আরও বলেন:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾

বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন *(সূরা আলে ইমরান-৩১)*।

আল্লাহ কারও যিম্মাদারী নেন নি যে, দুনিয়াতে সে পথ ভ্রষ্ট হবে না এবং আখিরাতে হতভাগা হবে না। বরং যিম্মাদারী নিয়েছেন শুধু ওহীর অনুসারীদের।

আল্লাহ বলেন:

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾

অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না *(সূরা ত্বহা-১২৩)*।

www.waytojannah.com

সূরা ত্বহা এর অত্র আয়াতটি প্রমাণ করে যে, ওহীর অনুসারী কখনও পথভ্রষ্ট হবে না এবং হতভাগা হবে না। সূরা বাক্বারার আয়াত প্রমাণ করছে যে, ওহীর অনুসারীদের কোন ভয় নেই এবং চিন্তাও নেই।

যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না *(সূরা বাক্বারা-৩৮)*।

নিঃসন্দেহে ওহীর অনুসারীগণ পথভ্রষ্ট ও হতভাগা নয় এবং তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই। কুরআনের বাণী দ্বারা এটা স্পষ্ট বুঝা যায়। কোন আলিমের অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে এটা অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ সে আলিম নিষ্পাপ নন। সে জানে না, সে যার তাক্বলীদ করছে সে সঠিক কথা বলছে না ভুল কথা বলছে। এটা ঐ আলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, কুরআন ও সুন্নাহ অনুধাবন করা থেকে বিমুখ থাকে। বিশেষ করে যে কুরআন ও হাদীসকে এড়িয়ে গিয়ে তাক্বলীদকৃত আলিমের মতামতকে যথেষ্ট মনে করবে।

কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াত প্রমাণ করছে যে, ওহীর অনুসরণ ও তার প্রতি আমল করা আবশ্যক। অনুরূপ ভাবে বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারাও কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) এর উপর আমল করা আবশ্যক বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা রাসূলের আনুগত্য করা আল্লাহর আনুগত্যের নামান্তর।

আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর *(সূরা হাশর-৭)* ।

আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয় *(সূরা আল ইমরান-১৩২)*।

আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

বল, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না *(সূরা আল ইমরান-৩২)*।

Contents

আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾

আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন *(সূরা : আন-নিসা-৬৯)*।

আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল *(সূরা : আহযাব-৭১)*।

আল্লাহ বলেন:

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, তবে আমি তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করি নি *(সূরা : আন-নিসা-৮০)*।

আল্লাহ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

হে মু'মিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ *(সূরা : আন-নিসা-৫৯)*।

আল্লাহ বলেন:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা । আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব *(আন-নিসা-১৩,১৪)*।

আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং সাবধান হও। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্ট প্রচার করা *(মায়েদা-৯২)*।

www.waytojannah.com

আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হও *(সূরা : আনফাল-১)*।
আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

বল, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।' তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি শুধু তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর, তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া *(সূরা : নূর-৫৪)*।
আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার *(সূরা : নূর-৫৬)*।
আল্লাহ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না *(সূরা মুহাম্মাদ-৩৩)*।
আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

মু'মিনদের কথা এই যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মাঝে বিচার মীমাংসা করবেন, তখন তারা বলে: 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।' আর তারাই সফলকাম। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তারাই কৃতকার্য *(সূরা : নূর-৫১-৫২)*।
আল্লাহ বলেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

Contents

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে *(সূরা : আল-আহযাব-২১)*।
আল্লাহ বলেন:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾

আর মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন (সূরা : তাওবা-৭১)।

নিঃসন্দেহে বিদ্বানদের মতে, উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা এবং ওহী সংক্রান্ত অনুরূপ আরও আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর প্রতি আনুগত্য করা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) এর প্রতি আমল করার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমূহ প্রমাণ করছে যে, ওহীর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা, তা নিয়ে গবেষণা, সে ব্যাপারে জ্ঞানার্জন ও তার প্রতি আমল করা আবশ্যক।

অতএব এ সমস্ত দলীল দ্বারা ওহীর ব্যাপারে চিন্তা করা, গবেষণা করা ও তার উপর আমল করার দাবীকে খাস করা বিশুদ্ধ হবে না নির্দিষ্ট মুজতাহিদগণ ছাড়া। যারা ইজতিহাদের এমন শর্তসমূহ একত্রিত করেছেন, যা পরবর্তী উসূলবীদগণের নিকট সুপরিচিতি, যেটি এমন দলীলের মুখাপেক্ষী যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। অবশ্য এ নীতিমালাটির ব্যাপারে কোন দলীল নেই।

আর কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, ওহীর ব্যাপারে চিন্তা ও গবেষণা করা আবশ্যক এবং তা থেকে যে শিক্ষা অর্জন করা হবে তার উপর আমল করা ওয়াজিব। যে জ্ঞানটি অর্জন করা হবে, তা যেন বিশুদ্ধ জ্ঞান হয়। চাই তা অল্পই হোক বা বেশি হোক।

অনুরূপভাবে সাহাবাগণ কোন ব্যক্তির কথার কারণে রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাত পরিত্যাগ করেন নি। সে যে মাপেরই লোক হোক না কেন। বরং ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন- "আমি আশঙ্কা করছি যে, তোমাদের উপর আসমান থেকে পাথর পড়তে পারে, আমি বলছি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আর তোমরা বলছ আবূ বকর (رضي الله عنه) ও উমার (رضي الله عنه) বলেছেন?!"

শাইখদ্বয়, তথা আবূ বকর (رضي الله عنه) ও উমার (رضي الله عنه) যখন কোন মাসআলা সম্পর্কে জানতেন না তখন মানুষদেরকে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। একদা আবূ বকর (رضي الله عنه) বলেন: আমি রাসূল (ﷺ) কে দাদীর অংশ সম্পর্কে কিছু বলতে শুনি নি। তাই তিনি যুহরের সালাত শেষ করে জনগণকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি দাদীর অংশ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) কে কিছু বলতে শুনেছ? তখন মুগীরাহ্ বিন শু'বাহ (رضي الله عنه) বললেন যে, আমি শুনেছি। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। অতঃপর আবূ বকর (رضي الله عنه) বললেন, তুমি ব্যতীত আর কেউ কি এ কথা শুনেছে?

www.waytojannah.com

মুহাম্মাদ বিন মুসাল্লিমাহ (رضي الله عنه) বললেন, মুগীরা (رضي الله عنه) সত্য কথাই বলেছেন। অতঃপর আবূ বকর (رضي الله عنه) এক ষষ্ঠাংশ প্রদান করলেন।

নতুন চাঁদ উঠার ব্যাপারে উমার (رضي الله عنه) মানুষকে প্রশ্ন করার ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। অতঃপর তিনি মুগীরাহ (رضي الله عنه) এর খবরের দিকে ফিরে গেছেন। উমার (رضي الله عنه) জনগণকে মহামারী সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (رضي الله عنه) এর খবরের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এছাড়া এ ব্যাপারে আরও বহু প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে, যা হাদীসের গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সতর্কবাণী: অনুসৃত ইমামদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান

জেনে রাখুন! চার ইমাম ও অন্যান্য ইমামের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান হল, সমস্ত ন্যায়নিষ্ঠ মু'মিনের ব্যাপারে আমাদের যে অবস্থান তার মত। আর তা হল, তারা যে জ্ঞান ও তাক্বওয়ার অধিকারী ছিলেন এ জন্য তাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা, তাদেরকে সম্মান করা, তাদের মর্যাদা প্রদান করা ও তাদের প্রশংসা করা। কিতাব ও সুন্নাহ এর প্রতি আমলের ক্ষেত্রে আমরা তাদের আনুগত্য করব। কুরআন ও সুন্নাহ তাদের মতামতের উপর অগ্রাধিকার পাবে। তাদের অভিমত সম্পর্কিত জ্ঞান সঠিক পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করবে এবং তাদের অভিমত থেকে যেগুলো কুরআন সুন্নাহ বিরোধী তা পরিত্যাগ করতে সহায়তা করবে। আর যে সব মাসআলার ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহর কোন দলীল পাওয়া যায় না, সে ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা হল, তাদের ইজতিহাদের দিকে দৃষ্টি দেয়া। এমনটি হতে পারে যে, আমাদের ইজতিহাদের চেয়ে ইমামদের ইজতিহাদ বেশি সঠিক। কেননা তারা আমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞান ও তাক্বওয়ার অধিকারী। তবে আমাদেরও লক্ষ রাখতে হবে ও সতর্ক থাকতে হবে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমরা যেন অধিকতর নিকটবর্তী মতামতগুলো গ্রহণ করি এবং সন্দেহযুক্ত মতামত থেকে দূরে থাকি।[২৫] **এরূপ পদক্ষেপের ক্ষেত্রে আমি কিছু দিক নির্দেশনা দিতে চাই:**

১। জেনে রাখুন! যে, ইমামগণ (রাহি:) নিষ্পাপ নন। প্রত্যেক ইমামের উপর বিভিন্ন মাসআলার ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বিদ্বানগণ বলেছেন- সংশ্লিষ্ট ইমাম এক্ষেত্রে সুন্নাতের বিপরীত করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখযোগ্য। তার ক্ষেত্রে এরূপ বেশি ঘটেছে। কেননা তিনি অধিক মতামত (রায়) গ্রহণ করতেন। তিনি সম্পদের ক্ষেত্রে শপথ ও সাক্ষ্য দ্বারা ফায়সালা করার হাদীসের উপর এবং অবিবাহিত ব্যাভিচারীকে এক বছর দেশান্তর করার হাদীসের উপর আমল করেন না। এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) এর উপর অভিযোগ আনা হয়ে থাকে যে, তিনি শাওয়াল মাসের ৬ টি সিয়াম অস্বীকার করেন এবং জুম'আর দিন সিয়াম পালন করা উত্তম বলে থাকেন। যদিও তিনি একাই এ অভিমত দিয়েছেন। কেননা এ দু'টি ব্যাপারে তার কাছে হাদীস পৌঁছে নি। ইমাম মালিক (রাহি.) খিয়ারে মজলিস এর হাদীসের উপর আমল পরিত্যাগ করেছেন। অথচ এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত আছে! এরূপ আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

---

[২৫] 'আযওয়াউল বায়ান' (৭/৫৫৫)।

Contents

ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) সমালোচিত হয়েছিলেন যে, পর্দা ছাড়া শুধু মহিলাকে স্পর্শ করা হলেই ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। অথচ হাদীসে এর বিপরীত কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এর অনেক উত্তরও রয়েছে।
অনুরূপ ভাবে ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) সমালোচিত হয়েছিলেন- (শাবানের ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না গেলে) সন্দেহের দিন সাবধানতা বশতঃ রমযানের সিয়াম পালন করার কারণে। অথচ দলীল প্রমাণ করছে যে, এ দিন সিয়াম পালন করা নিষেধ। এরূপ আরও দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এখানে ইমামগণ যে সমালোচিত হয়েছেন, এ জন্য তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা এবং তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা তারা আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে যে বিধান এসেছে সে ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। অতঃপর তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইজতিহাদ করেছেন। সুতরাং যার ইজতিহাদ সঠিক হবে তিনি ইজতিহাদ করার জন্য ও ইজতিহাদ সঠিক হওয়ার জন্য নেকী পাবেন। আর ইজতিহাদ ভুল হলে ইজতিহাদের জন্য নেকী পাবেন। আর ভুলের কারণে ওযর রয়েছে। তাদের মহৎ মর্যাদার স্বীকারওক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল এটা বর্ণনা করা যে, আমরা যেন কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) কে তাদের মতামতের উপর প্রাধান্য দেয়াটা আমাদের উপর আবশ্যক মনে না করি। কেননা তারা গুণাহ থেকে নিষ্পাপ নন।[২৬]

২। জেনে রাখা ভাল যে, গ্রহণযোগ্য ইমামদের কেউ উম্মতের কাছে ব্যাপকভাবে গৃহীত হবেন না, যদি তিনি স্বেচ্ছায় রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাত এর মধ্যে হতে সূক্ষ্ম কিংবা বড় বিষয়ে রাসূল (ﷺ) এর বিরোধিতা করেন। কেননা এ ব্যাপারে তারাই দৃঢ়ভাবে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, রাসূল (ﷺ) এর ইত্তেবা (অনুসরণ) করা ওয়াজিব। আর রাসূল (ﷺ) ব্যতীত অন্য মানুষের কথা গৃহীত হতে পারে আবার পরিত্যাজ্যও হতে পারে। কিন্তু যদি কেউ এমন মতামত পেশ করে যা সহীহ হাদীস বিরোধী, তাহলে তা অবশ্যই পরিত্যাগ করার যৌক্তিকতা রয়েছে।[২৭]

৩। হাদীসের বিরোধিতার ক্ষেত্রে ইমামগণ (রাহি:) এর ওযর তিন ভাগে বিভক্ত:[২৮]

১ম প্রকার- মহানাবী (ﷺ) এটা বলেছেন বলে বিশ্বাস না করা: এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

(১) তার নিকট আসলেই হাদীস পৌঁছে নি। আর যার নিকট হাদীস পৌঁছে নি তার উপর সে ব্যাপারে জ্ঞানার্জন আবশ্যক হয়ে পড়ে না। যখন হাদীস না পৌঁছে তখন সে ব্যাপারে প্রকাশ্য আয়াত দ্বারা অথবা অন্য হাদীস দ্বারা কিংবা কিয়াস বা ইস্তিসহাব দ্বারা মতামত পেশ করা তার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ মতামতটি হয়ত কখনও হাদীসের অনুকূলে হয়ে যায়, আবার কখনও প্রতিকূলে চলে যায়। কিছু হাদীসের ক্ষেত্রে সালাফদের যে বিপরীত মতামত পাওয়া যায়, এটা তার অন্যতম কারণ। কেননা রাসূল (ﷺ) এর হাদীস অবগত হওয়াটা প্রত্যেকের জন্য সম্ভব ছিল না।[২৯]

---

[২৬] দেখুন! 'আযওয়াউল বায়ান' (৭/৫৫৬-৫৭৬) ।
[২৭] রফউল মালাম আনিল আয়িম্মাতিল আ'লাম' যা- 'মাজমূউল ফাৎওয়া' গ্রন্থ (২০/২৩২) হতে গৃহীত।
[২৮] দেখুন! 'রফউল মালাম আনিল আয়িম্মাতিল আ'লাম' ও 'মাজমূউল ফাৎওয়া' (২০/২৩১-২৯০) ।
[২৯] সাহাবা এবং অন্যান্যদের মাঝে এটা বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত দেখুন- প্রাগুক্ত (২০/২৩৪-২৩৮)।

www.waytojannah.com

(২) হয়ত হাদীস পৌঁছেছে। কিন্তু তার কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি।

(৩) তার ইজতিহাদে হাদীসটি যঈফ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু অন্য পদ্ধতিতে অকাট্য দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অন্যের কাছে তার বিপরীত মত পাওয়া যাচ্ছে। এটা কারও কাছে সঠিক হতে পারে, আবার কারও কাছে ভুল হতে পারে।

(৪) ন্যায় সঙ্গত মজবুত খবরে ওয়াহেদ এর ব্যাপারে এমন শর্তারোপ করা, যে ব্যাপারে অন্যরা বিরোধিতা করেছে। যেমন, যখন কিয়াসের মূলনীতি হাদীসটির উল্টো হবে তখন বর্ণনাকারীর জন্য ফক্বীহ হওয়ার শর্তারোপ করা ইত্যাদি।

(৫) তার নিকট হাদীস পৌঁছে এবং গৃহীতও হয়েছে। কিন্তু সে তা ভুলে গেছে।

২য় প্রকার - এ উক্তি দ্বারা এ মাসআলাটি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, এমন বিশ্বাস না করা: এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথাঃ

(১) হাদীসটি দ্বারা কি দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে তা বুঝতে না পারা। কেননা কখনও তার কাছে হাদীসের অর্থটি অপরিচিত হয়ে থাকে এবং বিদ্বানগণ এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে মতানৈক্য করে। কখনও রাসূল (ﷺ) এর ভাষায় শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার ভাষায় ও রীতিতে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। অথবা শব্দটি কখনও বহুঅর্থবোধক (মুশতারিক) কিংবা সংক্ষিপ্ত (মুজমাল) হয়ে থাকে। আবার কখনও শব্দটি প্রকৃত অর্থ (হাকীকত) ও রূপক অর্থ (মাযায) এর মাঝে দ্বিধান্বিত হয়ে থাকে। ফলে তার নিকট যে অর্থটি বেশি নিকটবর্তী সে অর্থে তা ব্যবহার করে। যদিও এর অন্য অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন সাহাবাদের একটি দল প্রথমে الخيط الأبياض ও الخيط الأسود এর অর্থ الحبل বা রশি বলে জানতেন। এরূপ আরও উদাহরণ রয়েছে।

কখনও আবার দলীলের অর্থটা গোপন থাকে। কেননা মতামতসমূহের উদ্দেশ্যের মাঝে অনেক প্রশস্ততা রয়েছে এবং বক্তব্যের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা রয়েছে।

(২) তার বিশ্বাস যে- হাদীস দ্বারা মূলতঃ কোন দলীল গ্রহণ করা যাবে না। এ প্রকার ও পূর্বের প্রকারটির মাঝে পার্থক্য এই যে, পূর্বেরটির মাঝে কোন দলীলটি গৃহীত হবে তা বুঝা যাবে না। আর এ প্রকারের মাঝে তা বুঝা যাবে কিন্তু বিশ্বাস করবে না যে, এটা সহীহ দলীল।

(৩) তার বিশ্বাস যে, এ অর্থের বিপরীতে আরেকটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে যা প্রমাণ করছে যে- এখানে এটি উদ্দেশ্য নয়, বরং ঐটিই উদ্দেশ্য। যেমন আম-খাসের পারস্পারিক বিরোধিতা, মুতলাকের সাথে মুকাইয়াদের বিরোধিতা, আমরে মুতলাকের সাথে এমন কিছুর বিরোধিতা যা ওয়াজিব হওয়াকে বাধা দেয়, এরূপ অন্যান্য বিরোধিতা।

৩য় প্রকার: তার বিশ্বাস হলো, হাদীসের শব্দ ও ব্যাখ্যা অন্যের বিশ্বাসের বিরোধী অথবা প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মতের বিরোধী নয়।

এ সকল কারণ ও অন্যান্য কারণের জন্য ইমামগণ হাদীসের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে ওযর পেশ করে থাকেন। মূলতঃ এটাই তাদের (ইমামদের) মতভেদের মূল কারণ।

Contents

৪। যখন এটা নির্ধারিত হলো, অতঃপর যে মতামতের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস দ্বারা দলীল স্পষ্ট হয়েছে এবং যার ব্যাপারে বিদ্বানদের একটি দলের ঐকমত্য রয়েছে, সে মত থেকে অন্য কোন আলিমের মতামতের দিকে ধাবিত হওয়া আমাদের উচিত নয়, যদিও সে আলিমের এ স্পষ্ট মতামতটি খণ্ডন করার যোগ্যতা রয়েছে এবং যদিও তিনি অধিক জ্ঞানী হন না কেন। কেননা শরীয়াতের দলীলের চেয়ে বিদ্বানদের মতামতে ভুলের মাত্রা বেশি। কারণ শরীয়াতের দলীল সমস্ত বান্দার উপর প্রমাণ স্বরূপ। কিন্তু আলিমের মতামত এর বিপরীত। আর শরীয়াতের দলীল যতক্ষণ না অন্য দলীলের বিরোধিতা করে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আলিমের মতামত এরূপ নয়। মূলতঃ একজন আলিম হাদীস পরিত্যাগ করার জন্য স্বয়ং ওযর প্রাপ্ত। আর আমরা এটি (হাদীস বর্জিত মতামত) প্রত্যাখ্যান করার জন্য ওযর প্রাপ্ত।

আল্লাহ বলেন:

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

সেটা এমন এক উম্মত যা বিগত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্যই, আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্যই। আর তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না *(সূরা: বাকারাহ-১৩৪)*।

আল্লাহ বলেন:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ *(সূরা : আন-নিসা-৫৯)*।

উল্লেখিত কারণগুলোর কোন একটির জন্য যদি মতামত ত্যাগ করা হয়, অতঃপর যদি কোন সহীহ হাদীস আসে যেখানে হালাল-হারাম কিংবা কোন বিধানের কথা উল্লেখ থাকে, তাহলে আমরা ইমামের হাদীস বর্জন করার যে কারণগুলো বর্ণনা করলাম, তার কোন একটির কারণে তাদের কেউ যদি এ সহীহ হাদীসটিকে পরিত্যাগ করে, তাহলে হালালকে হারাম করার কারণে অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের উল্টো বিধান দেয়ার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হবে- আমাদের জন্য এ বিশ্বাস রাখা বৈধ হবে না। অনুরূপভাবে হাদীসে যদি একথাও বলা থাকে যে, যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে তার জন্য অভিশাপ, গযব কিংবা শাস্তি অথবা অনুরূপ কিছু রয়েছে। তাহলেও তাকে একথা বলা বৈধ হবে না যে, যে আলিম এটি বৈধ করবে কিংবা এটা সম্পাদন করবে সে এই শাস্তিরই অন্তর্ভুক্ত। একথাটির ব্যাপারে উম্মতের মাঝে কারও মতভেদ রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে বাগদাদের কতিপয় মু'তাযিলা এর বিরোধিতা করেছেন। সুতরাং যার কাছে হারাম হওয়ার কোন হাদীস পৌঁছে নি, এমতাবস্থায় তিনি যদি শারঈ দলীলের দিকে সম্বোধন করে এটাকে বৈধ বলে সমাধান দেন, তাহলে এ ক্ষেত্রে তিনি ওযর প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য। আর এ ক্ষেত্রে তিনি তার ইজতিহাদের কারণে প্রতিদান পাবেন ও প্রশংসিত হবেন।

আল্লাহ বলেন:

﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾

আর স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করছিলেন *(আম্বিয়া-৭৮)*।

www.waytojannah.com

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾

অতঃপর আমি এ বিষয়ের ফয়সালা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আর আমি তাদের প্রত্যেককেই দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান *(সূরা: আম্বিয়া-৭৯)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ সুলাইমান (عليه السلام) এর 'বুঝ' বা অনুধাবনকে বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং উভয়ের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করেছেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আমর বিন আস থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানাবী (ﷺ) বলেন:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

বিচারক যদি কোন ফায়সালা করতে গিয়ে প্রচেষ্টা করে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়, তাহলে তার জন্য দু'টি নেকী রয়েছে। আর প্রচেষ্ট করার পর ভুল হলে একটি নেকী রয়েছে।[৩০]

সুতরাং এ থেকে বুঝা গেল যে, মুজতাহিদ ভুল করলে তার একটি প্রতিদান রয়েছে। আর এটা তার ইজতিহাদের কারণে। আর যে ভুলটা হয়েছে তার জন্য সে ক্ষমা প্রাপ্ত হবে। কেননা শরীয়াতের সমস্ত বিধানের ক্ষেত্রে ওযর প্রাপ্ত হওয়ার কারণে কিংবা কঠিন হওয়ার কারণেও সাওয়াব পাওয়া যায়।

আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নি *(সূরা: হাজ্জ-৭৮)*।

আল্লাহ আরও বলেন:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না *(সূরা: বাকারাহ-১৮৫)*।

৫। ইমামগণ তাদের তাক্বলীদ (দলীলবিহীন অনুসরণ) না করার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। অন্ধ বিশ্বাসী গোঁড়াপন্থিরা নিজেদেরকে তাদের ইমামের অনুসারী বলে দাবি করে, তাদের মাযহাব ও মতামতকেই শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। তারা এটাকে আসমান থেকে অবতীর্ণ ওহীর বিধানের মত বলে মনে করে।[৩১]

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾

তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর *(সূরা আরাফ-৩)*।

---

[৩০] সহীহ: বুখারী ৭৩৫২ ও মুসলিম ১৭১৬।

[৩১] 'রফউল মালাম' যা 'মাজমূউল ফাৎওয়া' (২০/২৫০-২৫২) হতে কিছুটা পরিবর্তনসহ গৃহীত।

Contents

এ ব্যাপারে ইমামগণের (রাহিমাহুল্লাহ) পক্ষ থেকে যে সব মতামত আমরা জানতে পেরেছি, তার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো:[৩২]

(১) আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ)

ইমামগণের মধ্যে প্রথমেই হলেন ইমাম আবূ হানীফা নু'মান বিন সাবিত (রাহিমাহুল্লাহ)। তার সাথীগণ তার অনেক কথা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন, সব কয়টি কথা একটাই বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে, আর তা হচ্ছে: হাদীসকে আঁকড়ে ধরা ও তার বিপক্ষে ইমামগণের কথা পরিহার করা ওয়াজিব।

কথাগুলো হচ্ছে:

(ক) (إذا صح الحديث فهو مذهبي)

অর্থ: হাদীস বিশুদ্ধ হলে ওটাই আমার মাযহাব বলে পরিগণিত হবে।

(খ) (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه)

অর্থ: আমরা কোথা থেকে কথাটি নিলাম এটা না জানা পর্যন্ত কারও জন্য আমাদের কথা গ্রহণ করা বৈধ নয়।

অপর বর্ণনায় রয়েছে:

(حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي)

অর্থ: যে আমার কথার প্রমাণ জানে না তার পক্ষে আমার কথার দ্বারা ফাৎওয়া প্রদান করা হারাম।

অন্য বর্ণনায় আরও বাড়িয়ে বলেছেন:

(فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا)

অর্থ: কেননা আমরা মানুষ, আজ এক কথা বলি, আবার আগামীকাল তা থেকে ফিরে যাই।

অপর বর্ণনায় রয়েছে:

(ويحك يا يعقوب (هو أبو يوسف) لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد)

অর্থ: হে হতভাগা ইয়াকুব! (আবূ ইউসূফ) তুমি আমার থেকে যা শুন তা লেখ না, কেননা আমি আজ এক মত পোষণ করি এবং আগামীকাল তা পরিহার করি, আবার আগামীকাল এক মত পোষণ করি আর পরশুদিন তা পরিত্যাগ করি।

(গ) (إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي)

অর্থ: যখন আমি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসূল (ﷺ) এর হাদীস বিরোধী তা হলে তোমরা আমার কথা পরিত্যাগ করবে।

(২) মালিক বিন আনাস (রাহিমাহুল্লাহ)

ইমাম মালিক বিন আনাস (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

(إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)

[৩২] আল্লামা আলবানী (রাহি.) প্রণীত 'সিফাতু সলাতিন্নাবী' (পৃ: ৪৬-৫৭) হতে গৃহীত।

www.waytojannah.com

(ক) আমি নিছক একজন মানুষ। আমি ভুলও করি শুদ্ধও করি। তাই তোমরা লক্ষ কর, আমার অভিমতের প্রতি। এগুলোর যতটুকু কুরআন ও সুন্নাহর সাথে মিলে তা গ্রহণ কর আর যতটুকু এতদোভয়ের সাথে গরমিল হয় তা পরিত্যাগ কর।

(ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم)

(খ) নাবী (ﷺ) ব্যতীত অন্য যে কোন লোকের কথা গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় কিন্তু নাবী (ﷺ)এর সকল কথা গ্রহণীয়।

(গ) ইবনু অহাব বলেন: আমি মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) কে 'ওযূ' তে পদযুগলের অঙ্গুলিসমূহ খিলাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি: তিনি (উত্তরে) বলেন: লোকদেরকে তা করতে হবে না। (ইবনু অহাব) বলেন: আমি তাকে লোকসংখ্যা কমে আসা পর্যন্ত ছেড়ে রাখলাম। অতঃপর বললাম, আমাদের কাছে এ বিষয়ে হাদীস রয়েছে, তিনি বললেন, সেটা কী? আমি বললাম: আমাদেরকে লাইস ইবনু সা'য়াদ, ইবনু লহী'য়াহ ও আমার ইবনুল হারিস ইয়াযীদ ইবনু আমর আল মু'য়াফিরী থেকে তিনি আবূ আব্দির রহমান আল হুবালী থেকে তিনি আল মুসতাউরিদ বিন শাদ্দাদ আল কুরাশী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه অর্থ: আমি রাসূল (ﷺ) কে দেখেছি তিনি তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা পদযুগলের আঙ্গুলিগুলোর মধ্যভাগ মর্দন করেছেন। এতদশ্রবণে ইমাম মালিক বলেন, এ তো সুন্দর হাদীস। আমি এ যাবৎ এটি শুনি নি। পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি তাতে তিনি আঙ্গুলি মর্দনের আদেশ দিতেন।

(৩) শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ)

ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে এ মর্মে অনেক চমৎকার চমৎকার কথা উদ্ধৃত হয়েছে। তার অনুসারীগণ তার এ সব কথায় অধিক সাড়া দিয়েছেন এবং উপকৃতও হয়েছেন। কথাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ﷺ وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله ﷺ لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي)

(ক) প্রত্যেক ব্যক্তি থেকেই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর কিছু সুন্নাহ গোপন থাকবেই ও ছাড়া পড়বেই। তাই আমি যে কথাই বলেছি অথবা মূলনীতি উদ্ভাবন করেছি, সে ক্ষেত্রে রাসূল (ﷺ) থেকে আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য পাওয়া গেলে আল্লাহর রাসূলের কথাই হচ্ছে চূড়ান্ত আর এটিই হবে আমার কথা।

أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله ﷺ لم يحل له أن يدعها لقول أحد

(খ) মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যার কাছে রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহ্ (হাদীস) পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হয়ে যায় তার পক্ষে বৈধ নয় অন্য কারও কথায় তা বর্জন করা।

(إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ فقولوا بسنة رسول الله ﷺ ودعوا ما قلت)

(গ) তোমরা যখন আমার কিতাবে রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহ বিরোধী কিছু পাবে তখন আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত অনুসারে কথা বলবে, আর আমি যা বলেছি তা ছেড়ে দিবে।

Contents

অপর বর্ণনায় রয়েছে:

"فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد".

তোমরা তারই (সুন্নাতেরই) অনুসরণ কর, আর অন্য কারও কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ কর না।

(ঘ) (إذا صح الحديث فهو مذهبي) অর্থ: হাদীস বিশুদ্ধ হলে এটাই আমার গৃহীত পন্থা (মাযহাব)।

(أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون : كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا)

(ঙ) আপনারাই (এখানে আহমাদ ইবনে হাম্বালকে সম্বোধন করা হয়েছে) হাদীস বিষয়ে ও তার রিজালের (বর্ণনাকারীদের) ব্যাপারে আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত, তাই সহীহ হাদীস পেলেই আমাকে জানাবেন, চাই তা কুফাবাসীদের বর্ণনাকৃত হোক, চাই বাসরাবাসীদের হোক অথবা শাম-বাসীদের (সিরিয়ার) হোক বিশুদ্ধ হলে আমি তাই গ্রহণ করব।

كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ﷺ عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي

(চ) যে বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে আমার কথার বিরুদ্ধে হাদীস বর্ণনাকারীদের নিকট বিশুদ্ধরূপে কোন হাদীস পাওয়া যাবে আমি আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর আমার বক্তব্য পরিহার করে রাসূল (ﷺ) এর হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম।

(إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي ﷺ خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب)

(ছ) যখন তোমরা দেখবে যে, আমি এমন কথা বলছি যার বিরুদ্ধে নাবী (ﷺ) থেকে বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে তবে জেনে রাখ যে, আমার বিবেক হারিয়ে গেছে।

(كل ما قلت فكان عن النبي ﷺ خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني)

(জ) আমি যা কিছুই বলেছি তার বিরুদ্ধে নাবী (ﷺ) থেকে সহীহ সূত্রে হাদীস এসে গেলে নাবী (ﷺ) এর হাদীসই হবে অগ্রাধিকারযোগ্য, অতএব আমার অন্ধ অনুসরণ করো না।

(كل حديث عن النبي ﷺ فهو قولي وإن لم تسمعوه مني)

(ঝ) নাবী (ﷺ)-এর সব হাদীসই আমার বক্তব্য যদিও আমার মুখ থেকে তা না শুনে থাক।

(৪) আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ইমামগণের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস সংগ্রহকারী এবং তা বাস্তবে রূপায়ণকারী ছিলেন। তাই তিনি শাখা প্রশাখামূলক কথা ও মতামত সম্বলিত কিতাব লেখা অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন:

(لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا)

(ক) তুমি আমার অন্ধ অনুসরণ করো না; মালিক, শাফেঈ, আওযায়ী, সাউরী এদেরও কারও অন্ধ অনুসরণ করো না বরং তাঁরা যেখান থেকে (সমাধান) গ্রহণ করেন তুমি সেখান থেকেই তা গ্রহণ কর। অপর বর্ণনায় রয়েছে:

www.waytojannah.com

لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير

তোমরা দীনের ব্যাপারে এদের কারও অন্ধ অনুসরণ করবে না। নাবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবাদের থেকে যা কিছু আসে তা গ্রহণ কর, অতঃপর তাবেঈদের। তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির জন্য যে কারও নিকট থেকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে।

আবার কোন সময় বলেছেন:

(الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ﷺ وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير)

অনুসরণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নাবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবাদের থেকে যা আসে তার অনুসরণ করবে আর তাবেঈদের পর থেকে সে (যে কারও অনুসরণে) স্বাধীন থাকবে।

(رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار)

(খ) আওযায়ী, মালিক ও আবূ হানীফা প্রত্যেকের মতামত হচ্ছে মতামত মাত্র এবং আমার কাছে তা সমান (মূল্য রাখে); তবে প্রমাণ রয়েছে কেবল হাদীসের ভিতর।

(من رد حديث رسول الله ﷺ فهو على شفا هلكة)

(গ) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করলো সে ধ্বংসের তীরে উপনীত হলো।

এ সবই হলো ইমামগণ (রাহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্য যাতে হাদীসের উপর আমল করার ব্যাপারে নির্দেশ রয়েছে এবং অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কথাগুলো এতই স্পষ্ট যে, এগুলো কোন তর্ক বা ব্যাখ্যার অপেক্ষাই রাখে না।

অতএব যে ব্যক্তি ইমামদের কিছু কথার বিরুদ্ধে গেলেন কিন্তু সকল সুস্পষ্ট হাদীস আঁকড়ে ধরলেন তিনি ইমামদের মাযহাব বিরোধী হবেন না এবং তাদের ত্বরীকা থেকে বহিষ্কৃতও হবেন না। বরং তিনি হবেন তাদের প্রত্যেকের অনুসারী। আরও হবেন, শক্ত হাতল মজবুতভাবে ধারণকারী, যে হাতল ছিন্ন হবার নয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শুধু ইমামদের মতভেদের কারণে সুস্পষ্ট হাদীস প্রত্যাখ্যান করে তার অবস্থা এমনটি নয়, বরং সে এর মাধ্যমে তাদের অবাধ্য হলো এবং তাদের পূর্বোক্ত কথাগুলোর বিরোধিতা করলো।

আল্লাহ বলেন:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

তোমার প্রতিপালকের শপথ তারা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ নিরসনে তোমাকে বিচারক মানবে, অতঃপর তোমার মীমাংসায় নিজেদের মনে কোন সংকীর্ণতা অনুভব করবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে মেনে নিবে *(সূরা নিসা-৬৫)*।

তিনি আরও বলেন:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

তাই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা যেন ভীতিগ্রস্ত থাকে (কুফর, শিরক বা বিদ'আত দ্বারা) ফিৎনায় আক্রান্ত হওয়ার অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে *(সূরা নূর-৬৩)*।

Contents

হাফিয ইবনু রাজাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

যার কাছেই নাবী (ﷺ) এর আদেশ পৌঁছে যায় এবং তিনি তা বুঝতে পারেন তাহলে তার উপর এটাকে উম্মাতের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া ও তাদের মঙ্গল কামনা করা এবং তাঁর নির্দেশ পালন করার আদেশ প্রদান করা ওয়াজিব যদিও তা উম্মাতের বিরাট কোন ব্যক্তিত্বের বিরোধী হয়। কেননা রাসূল (ﷺ) এর আদেশ যে কোন বড় ব্যক্তির মতামত অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ও অনুসরণযোগ্য, যিনি (বড় ব্যক্তিত্ব) ভুলবশত কোন কোন ক্ষেত্রে নাবীর আদেশের বিপরীত কাজ করেন। এজন্যেই সাহাবাগণ ও তৎপরবর্তী লোকেরা সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধাচরণকারীর প্রতিবাদ করেছেন।

বরং কখনও প্রতিবাদে কঠোরতাও পোষণ করেছেন। বিদ্বেষ নিয়ে নয় বরং তিনি তাদের অন্তরের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ) হলেন তাঁদের নিকট আরও প্রিয়তম এবং তাঁর আদেশ সব সৃষ্টিকূলের উর্ধ্বে। তাই যখন রাসূল (ﷺ) ও অন্য কারও আদেশের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দিবে তখন রাসূল (ﷺ) এর আদেশ প্রাধান্য পাবে ও অধিকতর অনুসরণযোগ্য হবে। তবে ক্ষমাপ্রাপ্ত বিপরীত মত পোষণকারী মুজতাহিদও সম্মানিত; কেননা তিনি তার নির্দেশের বিরোধিতাকে অপছন্দ করেন না যখন তার বিপরীতে রাসূল (ﷺ) এর আদেশ প্রকাশ পেয়ে যায়।

আমি বলছিঃ কিভাবেইবা তারা এটাকে অপছন্দ করবেন, তারা তো স্বীয় অনুসারীদেরকে এ বিষয়ে আদেশ প্রদান করেন, যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে এবং তারা স্বীয় অনুসারীদের জন্য নিজেদের সুন্নাত বিরোধী সকল কথা পরিহার করা ওয়াজিব করেছেন। বরং ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) তার সাথীদেরকে আদেশ দেন যে, তারা যেন বিশুদ্ধ হাদীসকে তার দিকে সম্বন্ধ করে, যদিওবা তিনি এটি গ্রহণ করেন নি অথবা এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

এ জন্যই তত্ত্ববিদ ইবনু দক্বীক্বিল ঈদ (রাহিমাহুল্লাহ) সে সব বিষয়গুলো একত্রিত করেন যাতে এককভাবে বা যৌথভাবে চার ইমামের মাযহাবই বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধিতা করেছে এবং তিনি তা এক বৃহৎ খণ্ডে লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে শুরুতে তিনি বলেনঃ মুজতাহিদ ইমামগণের দিকে এ সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধ করা হারাম, তাদের অন্ধ অনুসারী ফক্বীহদের কর্তব্য হবে এগুলো জানা, যাতে ইমামগণের দিকে এসবের সম্বন্ধ জড়িয়ে তাদের প্রতি মিথ্যারোপ না করতে হয়।

সুন্নাহ অনুসরণ করতে যেয়ে ইমামগণের অনুসারীগণ কর্তৃক তাদের কিছু কথা পরিহারের নমুনাঃ

পূর্বোল্লেখিত কারণ সাপেক্ষে ইমামগণের অনুসারীবৃন্দ-

﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾

পূর্ববর্তীদের অধিক সংখ্যক এবং পরবর্তীদের অল্প সংখ্যক লোক (*সূরা ওয়াক্বিয়াহ-১৩,১৪*)

স্বীয় ইমামদের সব কথা গ্রহণ করতেন না। বরং তাদের অনেক কথাই তারা বাদ দিয়েছেন যখন সুন্নাহ বিরোধী বলে স্পষ্ট হয়েছে।

www.waytojannah.com

এমনকি ইমামদ্বয় মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) ও আবূ ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ) তাদের শাইখ আবূ হানীফার (রাহিমাহুল্লাহ) প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাযহাব-এর বিরোধিতা করেছেন। ফিক্বহের কিতাবগুলোই একথা বর্ণনার জন্য যথেষ্ট।

এ ধরনের কথা ইমাম মাযিনী ও ইমাম শাফেঈর অন্যান্য অনুসারীদের বেলায়ও প্রযোজ্য। আমরা যদি এর উপর দৃষ্টান্ত পেশ করতে যাই তবে কথা দীর্ঘ হয়ে যাবে এবং এই বইয়ে আমি সংক্ষেপায়নের যে উদ্দেশ্য পোষণ করেছি তা থেকেও বেরিয়ে পড়ব। তাই দু'টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হবো:

ক। ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর "মুওয়াত্ত্বা" গ্রন্থে বলেন (পৃ.১৫৮): আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) ইসতিসকার কোন সালাত আছে বলে মনে করতেন না। তবে আমাদের কথা হচ্ছে যে, ইমাম লোকজনকে নিয়ে দু'রাক'আত সালাত পড়বেন, অতঃপর দু'আ করবেন এবং স্বীয় চাদর পাল্টাবেন ..... (শেষ পর্যন্ত)।

খ। ইসাম বিন ইউসুফ আল বালখী যিনি ইমাম মুহাম্মাদ এর সাথী ছিলেন এবং ইমাম আবূ ইউসুফ এর সংশ্রবে থাকতেন তিনি ইমাম আবূ হানীফার কথার বিপরীত অনেক ফাৎওয়া প্রদান করতেন, কেননা (আবূ হানীফা) যেগুলোর দলীল জানতেন না অথচ তার কাছে অন্যদের দলীল প্রকাশ পেয়ে যেত, তাই সে মতেই ফাৎওয়া দিয়ে দিতেন। তাই তিনি রুকুতে গমনকালে ও রুকু থেকে উঠার সময় হস্তযুগল উত্তোলন (রফউল ইয়াদাইন) করতেন। যেমনটি নাবী (ﷺ) থেকে মুতওয়াতির বর্ণনায় এসেছে।

তার তিন ইমাম কর্তৃক এর বিপরীত বক্তব্য তাকে এ সুন্নাত মানতে বাধা দেয় নি। এ নীতির উপরেই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির অটল থাকা ওয়াজিব, চার ইমাম ও অন্যান্যদের সাক্ষ্য দ্বারা এটাই ইতিপূর্বে প্রতীয়মান হয়েছে।

৬। মুসলিম কি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করতে বাধ্য?

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাসূল (ﷺ) মানুষদেরকে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করতে বাধ্য করেন নি। বরং তিনি তাঁর আনুগত্য করা আবশ্যক করে দিয়েছেন। কেননা রাসূল (ﷺ) যা নিয়ে এসেছেন, হক্ব তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং কোন একনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি একটু ভেবে দেখেন, তাহলে তার কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে যে, দলীল ছাড়া নির্দিষ্ট কোন ইমামের মাযহাবের তাক্বলীদ করা বড় অজ্ঞতা ও ভয়াবহ বিপদের নামান্তর। বরং তা নিছক প্রবৃত্তির অনুসরণ ও স্বজনপ্রীতি বৈ কিছু নয়। মুজতাহিদ ইমামগণও এর বিরোধিতা করেছেন। যেমনটি তাদের উক্তিতে আমরা দেখেছি।

অতএব যে ব্যক্তি দলীলের অনুসরণ করবে সে স্বীয় ইমামসহ সকল ইমামেরই অনুসরণ করবে এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) এর অনুসারী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি দলীল ছাড়া তাক্বলীদকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও মেনে নেয়, তাহলে সে তাদের মাযহাব থেকে বহির্ভূত বলে গণ্য হবে। কেননা তার ইমাম যখন দুর্বল হাদীসের পরিবর্তে সহীহ হাদীস পেয়ে যান, তখন তিনি স্বীয় অভিমত ত্যাগ করে হাদীসের অনুসরণ করেন। সুতরাং এক্ষেত্রে তাক্বলীদের গোঁড়া অনুসারী; আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর অবাধ্যকারী ও প্রবৃত্তির অনুসারী হিসেবে বিবেচিত হবে।[৩৩]

---

[৩৩] আল-মা'সূমী প্রণীত, সুলাইম আল হিলালী কর্তৃক তাহক্বীককৃত 'হাদিইয়্যাতুস সুলতান ইলা মুসলিমী বিলাদিল ইয়াবান (জাপান)' (পৃ:৭৬)।

Contents

আল্লাহ বলেন:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾

তবে তুমি কি তাকে লক্ষ করেছ যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন *(সূরা জাসিয়া-২৩)*।

আল্লাহ আরও বলেন:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ *(সূরা : আন-নিসা-৫৯)*।

ইবনে হাযাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:[৩৪] "তাক্বলীদ করা হারাম। দলীল ব্যতীত রাসূল (ﷺ) ছাড়া অন্যের কথাকে গ্রহণ করা কারও জন্য বৈধ নয়"।

কেননা আল্লাহ বলেন:

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾

তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না *(সূরা : আল আ'রাফ-৩)*।

আল্লাহ আরও বলেন:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা অনুসরণ কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তার অনুসরণ করব *(সূরা বাকারা-১৭০)*।

যারা তাক্বলীদ করেন না, আল্লাহ তাদের প্রশংসা করে বলেন:

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ۞ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও। যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে অতঃপর এর যা উত্তম তা অনুসরণ করে তাদেরকেই আল্লাহ হিদায়াত দান করেন আর তারাই বুদ্ধিমান *(যুমার-১৭,১৮)*।

আল্লাহ বলেন:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

[৩৪] এটাকে তার (ইবনে হাযম) থেকে দেহলভী 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (পৃ:১/১৫৪-১৫৫) তে নকল করেছেন। মুহাল্লা অথবা আল-ইহকাম এর সম্ভাব্য স্থানে আমি এটা পাই নি।

www.waytojannah.com

অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ *(সূরা : আন-নিসা-৫৯)*।

সুতরাং দ্বন্দ্ব নিরসনকে কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য কারও দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে আল্লাহ বৈধ করেন নি। এ ব্যাপারে প্রথম ও শেষ যুগের সাহাবাদের, প্রথম ও শেষ যুগের তাবেঈদের এবং প্রথম ও শেষ যুগের তাবে-তাবেঈনদের ইজমা রয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন মানুষের দিকে কিংবা তাদের পূর্ববর্তীদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ।

ঐ ব্যক্তির জেনে রাখা উচিত, যে ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফার (রাহিমাহুল্লাহ) সমস্ত মতামত গ্রহণ করে অথবা মালিকের (রাহিমাহুল্লাহ) সমস্ত মতামত গ্রহণ করে, কিংবা শাফেঈর (রাহিমাহুল্লাহ) সমস্ত কথা গ্রহণ করে অথবা আহমাদের (রাহিমাহুল্লাহ) সমস্ত কথা গ্রহণ করে ও স্বীয় অনুসৃত মাযহাবের ইমামের কোন কথাকে বাদ দেয় না অথবা এক জনের মতামতের কারণে অন্য জনের মতামতকে পরিত্যাগ করে না এবং হুবহু মানুষের কথার উপর ভরসা করে; কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর উপর নির্ভর করে না, সে নিশ্চিতভাবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উম্মতের ইজমার বিরোধিতা করল। আর এতে কোন সন্দেহ নেই। এর সমর্থনে সে তিন প্রশংসিত যুগের কোন সালফে সালেহীন ও কোন মানুষকে পাবে না। এ ক্ষেত্রে সে মু'মিনদের বিরোধী পন্থা অবলম্বন করল। তাছাড়া এ সমস্ত ফক্বীহদের প্রত্যেকেই অন্য মানুষের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন ইমামের তাক্বলীদ করবে সে যেন তার ইমামেরই বিরোধিতা করল।

মাসূমী বলেন:[৩৫] আশ্চর্য লাগে যে, এ সমস্ত বিস্তৃত বিদ'আতপন্থি মাযহাবের গোঁড়া অনুসারীদের জন্য যারা স্বীয় মাযহাবের দিকে সম্পৃক্ত ইমামের মতামতেরই অনুসরণ করে, অথচ তা দলীল থেকে অনেক দূরে। তাকে এমনভাবে বিশ্বাস করে যে, তিনি যেন একজন প্রেরিত নাবী! অথচ এটা সত্য ও বিশুদ্ধতার মাপকাঠি থেকে অনেক দূরে। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি যে, এ সমস্ত অন্ধ অনুসারীগণ তাদের ইমামদের এমনভাবে বিশ্বাস করে যে, তারা এ সব ভুলের ঊর্ধ্বে এবং তারা যা বলে তা অবশ্যই সঠিক। আর মনের মধ্যে এ বিষয়টি ভাবে যে, প্রকাশ্য দলীলের বিরোধী হলেও সে তাক্বলীদ (দলীল বিহীন অনুসরণ) পরিহার করবে না।

এরা এমন শ্রেণীর লোক যাদের ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী ও অন্যরা আদী বিন হাতেম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (হাতেম) বলেন, আমি নাবী (ﷺ) কে পাঠ করতে শুনেছি:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে *(তাওবা-৩১)*। ফলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তারা তো তাদের ইবাদাত করে না। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন:

إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

[৩৫] 'হাদিইয়্যাতুস সুলতান' (পৃ:৫২-৫৩)

www.waytojannah.com

Contents

তারা যখন তাদের জন্য কোন কিছু হালাল করে তখন তারা সেটাকে বৈধ মনে করে। আর তারা যখন তাদের জন্য কোন কিছু হারাম করে তখন তারা সেটাকে হারাম মনে করে। সুতরাং এটাই তাদের ইবাদাত করা হলো।[৩৬]

ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত আছে যে,[৩৭] "হাদীস বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কোন হালাল কিংবা হারামের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ করবে এবং তাক্বলীদ তাকে সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে বাধা দিবে সে যেন আল্লাহ তা'আলা ছাড়া তাক্বলীদকৃত ব্যক্তিকে প্রভু হিসেবে মেনে নিল। আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা সে তার জন্য হালাল করে নিল। আর আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করে নিল"।

মারদাবী শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করে বলেন[৩৮] "যে স্বীয় ইমামের প্রতি তাক্বলীদ করাকে আবশ্যক করে নিল, সে যেন এ থেকে তাওবা করে। নইলে তাকে হত্যা করা হবে। কেননা সে তাক্বলীদকে আবশ্যক করে নেয়ার মাধ্যমে শরীয়াতের একনিষ্ঠ রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার করলো।"

কামাল বিন হুমাম হানাফী বর্ণনা করেন যে, বিশুদ্ধ অভিমত হলো, নির্দিষ্ট কোন মাযহাবকে আবশ্যক করে নেয়া অপরিহার্য নয়। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যা ওয়াজিব করেছেন তা ছাড়া আর কিছু ওয়াজিব নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কারও প্রতি এটা ওয়াজিব করেন নি যে, ইমামদের মধ্যে কোন ব্যক্তির মাযহাবের অনুসরণ করতে হবে এবং দীনের ব্যাপারে তার তাক্বলীদ করতে হবে ও অন্য কিছু বর্জন করতে হবে। অতীতের গৌরবময় শতাব্দীগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সে সময় নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করার আবশ্যকতা ছিল না।[৩৯]

করাফী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "সাহাবাগণ এ কথার উপর ঐকমত্য হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি শুধু আবূ বকর (رضي الله عنه) ও উমার (رضي الله عنه) এর কাছে ফাৎওয়া চায় এবং শুধু তাদের দুজনের তাক্বলীদ করে তার উচিত, আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه), মুয়ায বিন জাবালসহ অন্যান্যদের থেকেও ফাৎওয়া গ্রহণ করা এবং তাদের সকলের কথাকে কোন দ্বিধা ছাড়াই মেনে নেয়া"।[৪০]

"সাহাবাদের যুগে একজন ব্যক্তিও পাওয়া যাবে না, যে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির সকল কথার উপর তাক্বলীদ করেছেন এবং তার একটি কথাকেও বাদ দেন নি। আবার এমন ব্যক্তিও পাওয়া যাবে না, যিনি কোন ব্যক্তির সকল কথাকে বাদ দিয়েছেন এবং তার কোন কিছুই গ্রহণ করেন নি"।

জানা আবশ্যক যে, এরূপ গোঁড়ামী তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের যুগেও ছিল না।

---

[৩৬] আলবানী হাসান বলেছেন: তিরমিযী ৩০৯৫, বায়হাক্বী (১০/১১৬) যঈফ সনদে, এর শাহিদ রয়েছে। তবে তা সাহাবী হুযাইফা পর্যন্ত মাওক্বূফ সূত্রে বর্ণিত। অপর একটি হাদীস রয়েছে সে টি মুরসাল, আলবানী তার 'আল-মুসতালাহাতুল আরবাআহ' গ্রন্থে (পৃ:১৮-২০) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৩৭] 'হাদিইয়্যাতুস সুলতান' (পৃ:৬৯)

[৩৮] মারদাবী প্রণীত 'আল-ইনসাফ' (১১/১৭০)

[৩৯] হাদিইয়্যাতুস সুলতান' (পৃ:৫৬)

[৪০] 'আযওয়াউল বায়ান' (৭/৪৮৮)।

www.waytojannah.com

Contents

সুতরাং রাসূল (ﷺ) যে শতাব্দীকে মর্যাদাবান শতাব্দী হিসেবে গণ্য করেছেন সেই শতাব্দীতে তাদের এই অশুভ (তাক্বলীদী) পদ্ধতি চালু ছিল বলে মুক্বাল্লিদদের কেউ কোন একজন ব্যক্তির বরাত দিয়ে হলেও আমাদের এ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক। মূলতঃ রাসূল (ﷺ) যে শতাব্দীকে নিন্দনীয় শতাব্দী হিসেবে অবহিত করেছেন, সেই ৪র্থ শতাব্দীতে এ বিদ'আতের প্রচলন ঘটে।[৪১]

দারুল হিজরের ইমাম মালিকের উপর আল্লাহ রহম করুন! যার মহৎ জ্ঞান, মহিমা ও অনুগ্রহে "মুওয়াত্ত্বা" সংকলিত হয়েছে। খলীফা মানসূর যখন সকল মানুষকে শুধু "মুওয়াত্ত্বায় সংকলিত সমস্ত হাদীসের উপর আমল করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) তা গ্রহণ করেন নি। বরং তা প্রত্যাখ্যান করেছেন!!

৭। মুক্বাল্লিদরা (দলীলবিহীন অনুসরণকারী) দু'টি বিষয়ে প্রতারিত হয়:[৪২]

জেনে রাখা ভাল যে, মুক্বাল্লিদরা দু'টি ক্ষেত্রে প্রতারিত হয়ে থাকেন। তারা মনে করে যে, তাদের এ ধারণা সত্য। অথচ তা সত্য থেকে অনেক দূরে। এ ধারণা দু'টি আল্লাহর নিম্নোক্ত সাধারণ বাণীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

নিশ্চয় সত্যের বিপরীতে ধারণা কোন কার্যকারিতা রাখে না *(ইউনূস-৩৬)*।

রাসূল (ﷺ) বলেন:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা অধিকাংশ ধারণা মিথ্যা হয় *(বুখারী -৫১৪৩, আবূ দাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি)*।

প্রথম বিষয়টি হলো: তারা ধারণা করে যে, তারা যে ইমামের তাক্বলীদ করে সে ইমাম আবশ্যই কিতাবুল্লাহর সকল অর্থ সম্পর্কে অবগত। সুতরাং তিনি এটা ছাড়া অন্য কিছু ফাৎওয়া দিতে পারেন না। তারা এটাও ধারণা করে যে, তাদের ইমাম রাসূল (ﷺ) এর সকল হাদীস সম্পর্কে অবগত। সুতরাং তিনি এছাড়া অন্য কিছু ফাৎওয়া দিবেন না। এজন্য যে সমস্ত আয়াত ও হাদীস ইমামের মতামতের বিরোধী হয়, নিঃসন্দেহে তারা ধারণা করে যে, তাদের ইমাম এ আয়াত সম্পর্কে ও তার অর্থ সম্পর্কে অবগত এবং এ হাদীস ও তার অর্থ সম্পর্কে অবগত। তাদের ইমাম এ আয়াত ও হাদীসের চেয়ে আরও শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত দলীল অবগত, তাই তিনি এ আয়াত ও হাদীস পরিত্যাগ করেছেন। তাদের ইমামের কাছে কিছু ওহী মওজুদ আছে ভেবে ইমামের প্রাধান্য প্রাপ্ত অভিমতকেই তারা অগ্রগণ্য মনে করে। এ ধারণাটি মিথ্যা ও বাতিল। এতে কোন সন্দেহ নেই।

সকল ইমাম একথা স্বীকার করেছেন যে, তারা ওহীর সমস্ত প্রমাণাদী আয়ত্ত করতে পারেন নি। (ইনশা আল্লাহ এর বিবরণ সামনে আলোচনা করা হবে)।

---

[৪১] 'আযওয়াউল বায়ান' (৭/৫০৯)।

[৪২] শানক্বীতী প্রণীত 'আযওয়াউল বায়ান' (৭/৫৩৩-৫৩৯)।

www.waytojannah.com

এ বিষয়টি ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। যিনি ছিলেন দারুল হিজরের ইমাম। যার মহৎ জ্ঞান, মহিমা ও অনুগ্রহে "মুওয়াত্ত্বা" সংকলিত হয়েছে। খলীফা আবূ জাফর আল-মানসূর যখন সকল মানুষকে শুধু মুওয়াত্ত্বায় সংকলিত সমস্ত হাদীসের উপর আমল করানোর জন্য ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) খলীফা আবূ জাফরের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। বরং তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তিনি তাকে জানিয়ে দেন যে, রাসূল (ﷺ) এর সাহাবাগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে গেছেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে এমন জ্ঞান ছিল যা অন্যের কাছে ছিল না।

সে সময় হাদীসগুলো পরিপূর্ণভাবে একত্রিত করা সম্ভব হয় নি। এমনকি চার ইমামের আবির্ভাবের পরে সমস্ত হাদীস একত্রিত করা সম্ভব হয়েছে।

কেননা রাসূল (ﷺ) এর সাহাবাগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে তারা এমন সব হাদীস বর্ণনা করেছেন। যা অন্য প্রান্তের লোকেরা সেখানে না থাকায়, সে হাদীসগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন নি। কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা এসব হাদীস সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।

আলিমের অধিক জ্ঞান থাকাটা শরীয়াতের সকল দলীল সম্পর্কে জানাকে আবশ্যক করে না।

যেমন উমার বিন খাত্তাব (رضي الله عنه) 'কালালা'[৪৩] এর অর্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে অপারগ ছিলেন। এমন কি রাসূল (ﷺ) এর ইন্তেকাল অবধি এর অর্থ বুঝতে তিনি সক্ষম হন নি। রাসূল (ﷺ) এর জীবদ্দশায় তিনি অনেক বার তাকে এর অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং রাসূল (ﷺ) তাকে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা বুঝতে পারেন নি।

উমার ইবনে খাত্তাব (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি কালালার অর্থ জানার জন্য রাসূল (ﷺ) কে যতবার প্রশ্ন করেছি অন্য ক্ষেত্রে তা করি নি। এমনকি আমার বুকে আঙ্গুল দিয়ে তিনি আঘাতও করেছেন এবং বলেছেন, এর অর্থ বুঝার জন্য "সূরা নিসার শেষের আয়াত আয়াতুস সইফ তোমার জন্য যথেষ্ট"।

এটি স্পষ্ট বর্ণনা। কেননা মহানাবী (ﷺ) আয়াতে সইফ দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন নিম্নের আয়াতটি-

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾

তারা তোমার কাছে সমাধান চায়। বল, "আল্লাহ তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন 'কালালা' সম্পর্কে *(সূরা : নিসা-১৭৬)*।

অত্র আয়াতটি সুস্পষ্ট ভাবেই কালালার অর্থ বর্ণনা করছে। কেননা তা বর্ণনা করছে যে, কালালা অর্থ যার সন্তান ও পিতা-মাতা নেই।

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ অংশ দ্বারা (দালালাতে মুতাবেকীর মাধ্যমে) কালালার অর্থ নিঃসন্তান বলে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আবার وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ অংশ দ্বারা (দালালাতে ইলতিযামীর মাধ্যমে) পিতা-মাতা না থাকার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কেননা বোন সম্পদ পাওয়ার জন্য আবশ্যক হলো ভাই নিঃসন্তান হওয়া।

---

[৪৩] 'পিতা-মাতাহীন ও নিঃসন্তানকে 'কালালা' বলা হয়।

www.waytojannah.com

মহানাবী (ﷺ) অত্র আয়াতের স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া সত্ত্বেও উমার (رضي الله عنه) তা বুঝতে পারেন নি। উমার (رضي الله عنه) এর পক্ষ থেকে বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, কালালার অর্থ বুঝা তার কাছে সর্বদা কঠিন ছিল।

আবূ বকর (رضي الله عنه) এর কাছেও কালালা এর অর্থ অস্পষ্ট ছিল। তিনি কালালার ব্যাপারে বলেন, কালালার অর্থ আমি নিজের রায় থেকে বলছি। যদি তা সঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি ভুল হল তাহলে তা হবে আমার পক্ষ থেকে ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আর তা হলো, যার সন্তান ও পিতা-মাতা নেই। ফলে তার রায় আয়াতের সঙ্গে মিলে যায়।

এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, যদি তিনি আয়াতের অর্থ বুঝতেন তাহলে, রায় থেকে বিরত থাকতেন। যেমনটি রাসূল (ﷺ) উমার (رضي الله عنه) কে বলেছিলেন- "সূরা নিসার শেষের আয়াত আয়াতুস সইফ তোমার জন্য যথেষ্ট"।

এটা হলো মহানাবী (ﷺ) এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট বর্ণনা যে, আয়াতে জিজ্ঞাসিত বিষয় ছাড়াও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, উমার (رضي الله عنه) মহানাবী (ﷺ) এর কাছ থেকে আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলেন। আর প্রয়োজনের সময় ছাড়া পরে বর্ণনা দেয়াটা মহানাবী (ﷺ) এর ক্ষেত্রে বৈধ নয়। সুতরাং যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ দলীল আছে বলেই উমার (رضي الله عنه) আয়াতের উপর নির্ভর করাকে উপযুক্ত মনে করেছেন।

দাদী কতটুকু সম্পত্তি পাবে এ ব্যাপারটি আবূ বকর (رضي الله عنه) এর কাছে অস্পষ্ট ছিল। আর মহানাবী (ﷺ) দাদীকে এক ষষ্টাংশ দিয়েছেন। ফলে মুগীরাহ বিন শু'বা ও মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা আবূ বকর (رضي الله عنه) কে সংবাদ দিলেন যে, রাসূল (ﷺ) দাদীকে এক ষষ্টাংশ দিয়েছেন। তখন তিনি তাদের কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

উমার (رضي الله عنه) জানতেন না যে, নাবী (ﷺ) গর্ভস্থ ভ্রূণের রক্তপণ দাস বা দাসী আযাদ করার বিনিময়ে ফায়সালা দিয়েছিলেন। এ সংবাদ যখন তারা উভয়ে (মুগীরাহ বিন শু'বা ও মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা) উমার (رضي الله عنه) কে দিলেন তখন তিনি তাদের কথা গ্রহণ করলেন।

উমার (رضي الله عنه) এটাও জানতেন না যে, স্বামীর দিয়াত বা রক্তপণের অংশে স্ত্রী ওয়ারেস হবে। যখন তাকে যাহহাক ইবনে সুফইয়ান সংবাদ দিলেন, নাবী (ﷺ) তার নিকটে পত্র লিখেছিলেন যে, উশাইম আয-যাবাবী এর স্ত্রী তার স্বামীর দিয়াত বা রক্তপণের অর্থের মীরাস পাবে।

অগ্নিপূজকের নিকট হতে জিযিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারেও তিনি জানতেন না। তখন তাকে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ সংবাদ দিলেন যে, নাবী (ﷺ) বসবাসকারী অগ্নিপূজকদের নিকট হতে জিযিয়া নিতেন।

তিনবার অনুমতি নেয়ার বিধান সম্পর্কেও তিনি জানতেন না। তখন তাকে আবূ মুসা আশআরী (رضي الله عنه) ও আবূ সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) সংবাদ দিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীর জন্য স্বীয় বাসস্থানে অবস্থান করা ওয়াজিব হওয়া সম্বন্ধে উসমান (رضي الله عنه) জানতেন না। তখন তাকে কুরাইয়া বিনতে মালিক সংবাদ দিলেন যে, নাবী (ﷺ) কোন স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে ইদ্দত পালন করা পর্যন্ত স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করা আবশ্যক করেছেন। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এ সমস্ত খোলাফায়ে রাশেদাগণ সর্বদা রাসূল (ﷺ) এর সাথে থাকার পরও এবং তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা থাকার পরও তাদের কাছে রাসূল (ﷺ) এর অনেক ঘটনা ও হাদীস অজানা থেকে গেছে। ফলে তারা তাদের চেয়ে কম জ্ঞানবান ও মর্যাদাবানদের কাছ থেকেও তা জানার চেষ্টা করেছেন।

সুতরাং, সাহাবাগণ ব্যতীত ইমামগণের ব্যাপারে আপনার ধারণা কি? যারা সাহাবাদের দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে যাওয়ার পর জন্মগ্রহণ করেছেন ও জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং পরবর্তীতে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ ঐ অঞ্চলের সাহাবাদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যারা সেখানে গিয়েছেন।

মোট কথা ইমামগণ শরীয়াতের সকল দলীল ও তার অর্থ জানেন এমনটি ধারণা করা হক্ব থেকে অনেক দূরে এবং নিঃসন্দেহে এটা সঠিক নয়।

এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, ইমামের নিকট কিছু হাদীস অজানা থেকে গেছে। ফলে তিনি এ ব্যাপারে জানতে পারেন নি। যা কতিপয় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ সাহাবাদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন ফলে অন্যের কাছে তা সাব্যস্ত হয়েছে।

এক্ষেত্রে তিনি আমল ত্যাগ করার জন্য ওযর প্রাপ্ত। কেননা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কঠোর প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়ে অবগত হতে পারেন নি। এজন্য তিনি ইজতিহাদের নেকী পাবেন। আর ভুলটা ওযর হিসেবে গণ্য হবে।

কখনও আবার ইমাম হাদীস সম্পর্কে অবগত থাকলেও তার নিকটে যে সনদে হাদীসটি পৌঁছেছে তার সনদ দুর্বল। ফলে সনদ দুর্বল হওয়ার কারণে তিনি হাদীসটি পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু অন্যজন একই হাদীসটি অপর এক সহীহ বর্ণনার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। ফলে তার কাছে হাদীস গ্রহণযোগ্য হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রথম জনের হাদীস পরিত্যাগ করার জন্য ওযর রয়েছে। কেননা তিনি দুর্বল সনদটির কথাই জানতে পেরেছেন। আর সহীহ বর্ণনাটি তার কাছে পৌঁছে নি।

কখনও এমন ধারণার ভিত্তিতে হাদীস পরিত্যাগ করেছেন যে, তিনি যে ধারণাটি পোষণ করেন তা হাদীসের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। কিন্তু ঘটনা এমন দাঁড়ায় যে, তার ধারণার চেয়ে হাদীসটিই বেশি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। মূলতঃ তিনি না জানার কারণে এটা করেন, যাতে এর উপর অন্য দলীল প্রতিষ্ঠা করা যায়। এরূপ অনেক কারণে ইমামগণ কিছু শারঈ দলীলকে পরিত্যাগ করেন।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, শরীয়াতের সকল বিধান ও তার সঠিক অর্থ সম্পূর্ণভাবে ইমাম অবগত, এমন ধারণা ভ্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যেক ইমামই এ ধারণাকে বাতিল বলে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ইনশা আল্লাহ এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে।

সুতরাং প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হলো, ইমামদের সেই কথার অনুসরণ করা, যা তারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, তারাও ভুল করেন এবং কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী হলে সে সব ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে তাদের (ইমামদের) অনুসারী তারাই যারা কোন কিছুকে

কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) এর উপর প্রাধান্য দেন না। আর যারা কোন ব্যক্তির অভিমতকে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেয়, বরং তারাই তাদের (ইমামদের) বিরোধিতাকারী, তাদের অনুসারী নয়। ইমামগণকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তার দাবীটি নিছক মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: মুক্বাল্লিদগণ ধারণা করে যে, ভুলের জন্য ইমামগণ যেমন ওযর প্রাপ্ত, তারাও তেমন ওযর প্রাপ্ত। এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মুকাল্লিদগণ মনে করে যে, যদি কিছু বিধানের ক্ষেত্রে ইমাম ভুল করেন এবং এ ভুলের যদি তাক্বলীদ করা হয়, তাহলে ভুলের কারণে তারাও ওযরপ্রাপ্ত হবেন এবং যে ইমামের তাক্বলীদ করা হয়েছে তার সমপরিমাণ নেকীও পাওয়া যাবে। কেননা তারা তার (ইমামের) অনুসারী। তাদের প্রতি তাই প্রযোজ্য হবে যা তাদের ইমামের উপর প্রযোজ্য হয়।

নিঃসন্দেহে এ ধারণা মিথ্যা ও বাতিল। কেননা যে ইমামের তাক্বলীদ করা হয়, তিনি কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল (ﷺ), সাহাবাদের মতামত ও তাদের ফাৎওয়া এর ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। নাযিলকৃত ওহীর আলোকে আল্লাহর আনুগত্য ও ওহীর জ্ঞান অর্জন করে তার প্রতি আমল করা যে আবশ্যক, এ ক্ষেত্রে তিনি কার্পণ্য না করে নিষ্ঠার সাথে ইজতিহাদ করেছেন।

অবস্থা এরূপ হলে, তার (ইমামের) ভুলের জন্য তিনি ওযরের উপযুক্ত। আর ইজতিহাদের কারণে নেকী পাওয়ার যোগ্য। আর যারা মুক্বাল্লিদ তারা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) এর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে নি এবং সহজসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা (কুরআন ও সুন্নাহর) জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকার চেষ্টা করেছে। আর যে সমস্ত মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহীর সমাধানে ভুলও করে এবং ঠিকও করে এ সমস্ত ব্যক্তির মতামতকে তারা (মুক্বাল্লিদগণ) গ্রহণ করেছে। সুতরাং তারা যে সমস্ত ইমামের তাক্বলীদ করছে, তাদের অবস্থান কোথায়?

ইমামগণ ও মুক্বাল্লিদের মাঝে এটাই বড় পার্থক্য। এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, অন্ধ বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে ভুলের কারণে তারা প্রতিদান পাবে না। কেননা হক্ব বিরোধী বিষয়ে কোন অনুসরণ করা যাবে না এবং এটা কোন অনুসরণযোগ্য আদর্শও নয়। আর তারা ওযর প্রাপ্তও হবে না। কেননা নাযিলকৃত ওহীর আলোকে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পালন করা যে তাদের প্রতি আবশ্যক, তারা তা পরিত্যাগ করেছে।

এ জ্ঞান অর্জন করা তাদের উপর ওয়াজিব। প্রয়োজনের দাবী এটাই যে, এ জ্ঞানের উপর আমল করতে হবে। যেমনভাবে শারঈ ইবাদাত বন্দেগী ও পারস্পারিক লেন-দেন (মুয়ামালাত) এর ক্ষেত্রে আমল করা হয়ে থাকে। আর শারঈ দলীল একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, কিতাব ও সুন্নাহর সরল জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

মোট কথা, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) থেকে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে রাখে, আল্লাহর নাযিলকৃত দীন ও রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাতের জ্ঞান অর্জনে যে অবহেলা করে এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) এর উপর যে মানুষের কথাকে প্রাধান্য দেয়, তিনি অবশ্যই সেই ইমামের মত নন যিনি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন না, কুরআন-সুন্নাহ'র উপর কোন কিছুকে প্রাধান্য দেন না এবং কিতাব ও সুন্নাহর আদেশ নিষেধের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অবহেলা করেন না। সুতরাং ইমামগণের অবস্থান কোথায় আর তাদের অবস্থান কোথায়?

www.waytojannah.com

কবির ভাষায়:

سارت مشرقة وسرت مغربًا * شتان بين مشرق ومغرب

"আমার প্রেয়সী চলে গেছে পূর্ব দিগন্তে আর আমি তার সন্ধানে চলে গেছি পশ্চিম দিগন্তে।
পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মাঝে তো রয়েছে বিস্তর ব্যবধান।"

৮। সংশয়: মুজতাহিদ ছাড়া সাধারণ ভাবে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি আমল করা নিষিদ্ধ:[৪৪]

জেনে রাখুন যে, পরবর্তী উসূলবিদগণের মতে, মুজতাহিদ ছাড়া সাধারণভাবে কুরআন ও সুন্নাহ'র প্রতি আমল করা নিষিদ্ধ। তারা বলেন ইজতিহাদের শর্ত হলো:

(১) মুজতাহিদকে বালেগ হতে হবে।
(২) জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে।
(৩) সৃষ্টিগতভাবে তীক্ষ্ম বুঝের অধিকারী হতে হবে।
(৪) আক্বলী দলীল (প্রমাণ বিহীন বুদ্ধিজাত মতামত) সম্বন্ধে জানতে হবে। মূলতঃ এ আক্বলী দলীলটা অস্তিত্বহীনতারই নামান্তর। আর আক্বলী দলীল এ জন্যই জানতে হবে যে, যাতে এর মাধ্যমে তিনি বিপরীত মত পোষণকারী মুজতাহিদের নকলী (বর্ণনা ভিত্তিক) দলীলের জবাব দিতে পারেন।
(৫) আরবী ভাষায় দক্ষ হতে হবে এবং সাথে সাথে শারঈ ও উরফী হাক্বীকত (গভীর তত্ত্বজ্ঞান) সহ নাহুসরফ ও বালাগাত (অলঙ্কার শাস্ত্র) সম্বন্ধে জানতে হবে।
(৬) কেউ কেউ আবার এর সাথে অতিরিক্ত করেছেন যে, যুক্তি বিদ্যার বিষয় জানতে হবে। যেমন হুদুদের (দণ্ডবিধি) শর্তসমূহ, প্রচলনগত বিষয় এবং দলীলের শর্তসমূহ জানা।
(৭) উসূল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। কিতাব ও সুন্নাহ'র বিধান সমূহের বিভিন্ন দলীল সম্বন্ধে জানতে হবে। দলীলসমূহ মুখস্থ রাখা তাদের কাছে শর্ত নয়। বরং কুরআন ও হাদীসে প্রাপ্ত জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট।
(৮) ঐকমত্য (ইজমা) ও মতভেদের (খিলাফ) অবস্থা সম্বন্ধে জানতে হবে।
(৯) হাদীসে মুতওয়াতির, আহাদ, সহীহ ও যঈফের শর্তাবলী সম্বন্ধে জানতে হবে।
(১০) নাসেখ ও মানসূখ সম্বন্ধে জানতে হবে। বিভিন্ন শানে নযূল সম্বন্ধে জানতে হবে।
(১১) সাহাবাদের অবস্থা ও হাদীস বর্ণনার অবস্থা সম্বন্ধে জানতে হবে। তবে তারা ক্বিয়াস গ্রহণের শর্তের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, তাদের এ শর্তগুলোর উপর নির্ভর করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ'র এমন কোন দলীল নেই, যা স্পষ্ট করবে যে, এ শর্তগুলো ছাড়া কুরআন ও সুন্নাহ'র প্রতি আমল করা বৈধ নয়। আবার এর প্রমাণে কোন ইজমাও সাব্যস্ত নেই। তবে তাদের মতে, এ শর্তগুলো আরোপ করার কারণ হলো দায়িত্ব বাস্তবায়ন করা।

[৪৪] 'আযওয়াউল বায়ান' (৭/৪৭৭-৪৭৯)।

এর স্পষ্ট বর্ণনা এই যে, কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) ও মুসলমানদের ইজমা প্রমাণ করছে, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) এর উপর আমল করার জন্য শর্ত একটিই । আর তা হলো, হুকুমগত জ্ঞানার্জন করা। যার মাধ্যমে এতদোভয়ের উপর আমল করা যায়। অবশ্যই ওহীর প্রতি আমল করার জন্য হুকুমগত জ্ঞান ছাড়া আর অতিরিক্ত কোন শর্ত নেই। এ ব্যাপারে কারও মতানৈক্য নেই। আর পরবর্তী উসূলবিদগণ যে সমস্ত শর্তারোপ করেছেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল দায়িত্ব-কর্তব্য বাস্তবায়ন করা।

কেননা (তাদের উদ্দেশ্য হলো,) ওহীর যে জ্ঞান দ্বারা আমল করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তারা তা বাস্তবায়ন করতে চান। অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য হলো, জ্ঞানার্জনের পর আমল করার যে দায়িত্ব রয়েছে, তা নিশ্চিত করার পদ্ধতি বর্ণনা করা। সুতরাং তারা উল্লেখিত শর্তগুলো আরোপ করেছেন এ মনে করে যে, এগুলো ছাড়া ওহীর জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়। তবে এই ধারণার মাঝে কথা থেকে যায়। কেননা প্রত্যেক মানুষের বুঝ শক্তি রয়েছে, যদি সে কুরআন ও সুন্নাহ'র দলীল দ্বারা আমল করে তাহলে তাকে বাধা দেয়া যায় না। আর এর অর্থ বুঝাও তার পক্ষে অসম্ভব নয় এবং এ ব্যাপারে তার সে পর্যন্ত অনুসন্ধান করাও অসম্ভব নয় যে, এটা কি মানসূখ (রহিত), না খাস (নির্দিষ্ট), না মুকাইয়্যাদ (শর্তযুক্ত)? যখন সে তা জানতে পারে, তখন আমল করতে পারে।

আর বিদ্বানদেরকে এ প্রশ্ন করা যে, এ দলীলের কোন নাসেখ (রহিত কারী), খাস ও মুকাইয়্যাদ আছে কি না? এ ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ কর্তৃক এর উত্তর দেয়াটা তাক্বলীদের মধ্যে পড়ে না। বরং এটা ইত্তেবারই (দলীলের অনুসরণ) অংশ। ইন্‌শা আল্লাহ এ ব্যাপারে আমরা সামনে তাক্বলীদ এর মাসআলায় তাক্বলীদ ও ইত্তেবা এর মধ্যে পার্থক্য অধ্যায়ে আলোচনা করব।

মোট কথা কুরআন ও সুন্নাহর বহু বর্ণনা প্রমাণ করছে যে, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) এর উপর আমল করা আবশ্যক। উপরে উল্লেখিত মুজতাহিতদের শর্তসমূহকে নির্দিষ্ট করা যাবে না।

৯। সংশয়: আল্লাহর বাণী ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ "সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জেনে থাক" *(সূরা নাহল-৪৩)* এর বাস্তবায়ন:

জেনে রাখুন! মুক্বাল্লিদগণ আল্লাহর বাণী বাস্তবায়নের দাবীতে- ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ "সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জেনে থাক" *(সূরা নাহল-৪৩)*- দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। তারা বলে, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি জানেন না তিনি যেন তার চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেন। আর তারা বলেন যে, আমাদের এ কথার পেছনে অত্র আয়াতটি দলীল।

মহানাবী (ﷺ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জানেন না, তিনি যেন জানা ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে তা জেনে নেন। জনৈক ব্যক্তির মাথায় আঘাত লাগা মর্মে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন:

أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ

তারা যেহেতু জানে না, সেহেতু তারা কেন জিজ্ঞেস করল না? কেননা অজ্ঞতার ঔষধ হচ্ছে প্রশ্ন করা।[৪৫]

---

[৪৫] এই কিতাবের 'পট্টির উপর মাসাহ' অধ্যায়ে হাদীসটি আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ।

www.waytojannah.com

শানকীত্বী (রাহ.) বলেন:[৪৬]

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

আয়াত দ্বারা তাদের এ দলীল পেশ করা অনর্থক। কেননা অত্র আয়াতটি দ্বারা তাক্বলীদ করা প্রমাণিত হয় না। যেমনটি তারা ভেবে নিয়েছেন যে, শুধু একজন ব্যক্তির সমস্ত মতামতকেই গ্রহণ করা আবশ্যক এবং অন্যের সব কথা বর্জনীয়।

আর নিঃসন্দেহে أَهْلَ الذِّكْرِ দ্বারা أَهْلُ الوحى বা ওহীর অনুসারী উদ্দেশ্য। যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিধান সম্বন্ধে জানেন। যেমন কুরআন ও হাদীসের পণ্ডিতগণ।

সুতরাং তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আহলে যিকরকে প্রশ্ন করার জন্য, যাতে তারা সেই যিকরের মাধ্যমে তাদেরকে ফাৎওয়া দিতে পারেন যা ওহীর অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি ওহীর জ্ঞান অর্জন করার জন্য কাউকে প্রশ্ন করে এবং তার কাছে যদি তা বর্ণনা করা হয়, তাহলে তার এ জ্ঞানার্জনটা ওহীর অনুসরণ মাত্র। এটা তাক্বলীদ নয়। আর বিশুদ্ধ অভিমতে ওহীর অনুসরণ করার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।

যদিও আয়াতটি বাহ্যত তাক্বলীদের এক প্রকারের উপর প্রমাণ বহন করছে। তবে এটা এমন ধরনের তাক্বলীদ যার ব্যাপারে আমরা পূর্বে আলোচনা করলাম। এ তাক্বলীদের ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই । একে তাক্বলীদে আম বা সাধারণ তাক্বলীদ বলা হয়। এমন তাক্বলীদকারীর জন্য ওহী অবতীর্ণকারী (আল্লাহ) আলিমদের মধ্য হতে একজন আলিমও অবতীর্ণ করেছেন, যার কাছ থেকে এই মুক্বাল্লিদ ফাৎওয়া গ্রহণ করে আমল করে। সেই আলিমের সমস্ত মতামত গ্রহণ করাকে সে আবশ্যক মনে করে না এবং তিনি ব্যতীত অন্যরা যা বলেছেন তাও পরিত্যাগ করে না।

আর জনৈক ব্যক্তির মাথা যখম হওয়ার ব্যাপারে দলীল দিতে চাওয়া সে হাদীসটির পূর্ণ রূপ হল-

ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ

অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হলে তার সঙ্গীদের তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমার জন্য কি তায়াম্মুম করার কোন ছাড় রয়েছে? উত্তরে তারা বললেন, তুমি যেহেতু পানি ব্যবহার করতে সক্ষম তাই তোমার তায়াম্মুম করার ছাড় আমরা দেখছি না। ফলে তিনি গোসল করার কারণে মারা গেলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি বলেন:

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ

তারা তাকে হত্যা করেছে। সুতরাং আল্লাহ তাদের হত্যা করুন। যেহেতু তারা জানে না, সেহেতু কেন জিজ্ঞেস করল না? কেননা অজ্ঞতার ঔষধ হচ্ছে প্রশ্ন করা।

এটি দ্বারা দলীল প্রদান করাটাও অনর্থক। বরং এ হাদীসটিও মুক্বাল্লিদদের বিরুদ্ধেই দলীল, এটি মুক্বাল্লিদদের স্বপক্ষের দলীল নয়।

এর কারণ বর্ণনায় ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন গ্রন্থকার বলেন: মহানাবী (ﷺ) ফাৎওয়া প্রদান কারীকে উপদেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি পূর্বোল্লেখিত সাহেবে শুজ্জা (আহত ব্যক্তি) এর হুকুম ও পদ্ধতি সম্বন্ধে

[৪৬] 'আযওয়াউল বায়ান' (৭/৫১০-৫১১)।

www.waytojannah.com

প্রশ্ন করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তিনি তাদের বলেছিলেন- «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ» তারা তাকে হত্যা করেছে। সুতরাং আল্লাহ তাদের হত্যা করুন। তিনি তাদের প্রতি বদ-দু'আ করেছেন, কেননা তারা ইলম (জ্ঞান) ছাড়া ফাৎওয়া দিয়েছে।

সকল বিদ্বানের ঐকমত্যে এর দ্বারা তাক্বলীদের মাধ্যমে ফাৎওয়া দেয়া হারাম বুঝানো হয়েছে। কেননা তাক্বলীদ ইলম নয়। রাসূল (ﷺ) কর্তার প্রতি বদ-দু'আ করেছেন। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে তা হারাম এবং এটা হারাম হওয়ার একটি দলীল। সুতরাং মুক্বাল্লিদগণ যা দিয়ে দলীল দিতে চান, সেটাই তাদের বিরুদ্ধে বড় দলীল হিসেবে দাঁড়িয়েছে। (আল-আযওয়াউল বায়ান)

১০। মুক্বাল্লিদদের তর্ক-বিতর্ক:

ইমাম ইবনে আব্দিল বার আসারের মাধ্যমে দলীল উল্লেখ করার পর তাক্বলীদকে নিন্দনীয় ও নিষেধ উল্লেখ করে বলেন, ফক্বীহ ও আহলে নাযরদের একটি দল নাযরিয়া (চিন্তাগত) ও আকলিয়া (বুদ্ধিজাত) দলীল দ্বারা তাক্বলীদকে বৈধ মনে করেন। অতঃপর তিনি বলেন:[৪৭]

"এ ব্যাপারে আমি মাযিনী (রাহ.) এর চেয়ে উত্তম কথা আর কাউকে বলতে দেখি নি। আর তা হলো, যে তাক্বলীদ দিয়ে বিধান বাস্তবায়ন করতে চায়, তাকে যদি বলা হয়, তুমি যে বিধানটি বাস্তবায়ন করলে এ ব্যাপারে কি কোন দলীল রয়েছে? যদি সে উত্তরে বলে যে হাঁ, তাহলে তাক্বলীদ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এ ক্ষেত্রে দলীলটাই তার জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে, তাক্বলীদ নয়।

আর যদি বলে দলীল ছাড়াই এর বিধান দিয়েছি। তাহলে তাকে বলা হবে, তুমি মানুষ খুন কর না কেন? গুপ্তাঙ্গ বৈধ মনে কর না কেন ও সম্পদ বিনষ্ট কর না কেন? অথচ আল্লাহ কি এগুলোকে দলীল ছাড়াই হারাম করেছেন? আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا﴾

তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই? *(সূরা ইউনূস-৬৮)* অর্থাৎ: এ ব্যাপারে কি কোন প্রমাণ রয়েছে?

যদি সে বলে, দলীল না জানলেও আমি জানি যে এ ব্যাপারে আমি ঠিকই করছি। কেননা আমি এ ব্যাপারে একজন বড় বিদ্বানের তাক্বলীদ করেছি। আর আমার বিশ্বাস যে, তিনি কখনও দলীল ছাড়া কথা বলতে পারেন না। যা হয়তো আমার কাছে অস্পষ্ট রয়েছে।

তাহলে তাকে বলা হবে, যখন তুমি তোমার শিক্ষকের তাক্বলীদকে বৈধ মনে করছ। কেননা তোমার বিশ্বাস যে, তিনি দলীল ছাড়া কথা বলেন না, যা হয়তো তোমার কাছে গোপন রয়েছে। তাহলে তো তোমার শিক্ষকের যিনি শিক্ষক তার তাক্বলীদ করা বেশি উত্তম। কেননা তিনিও দলীল ছাড়া কথা বলেন না, যা হয়তো তোমার শিক্ষকের কাছে গোপন রয়েছে। যেমনটি তোমার শিক্ষক দলীল ছাড়া কথা বলেন না যা হয়তো তোমার কাছে গোপন রয়েছে। যদি সে বলে যে, আসলে কথাটি ঠিকই বলেছেন। তাহলে

[৪৭] 'জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী।

www.waytojannah.com

এমন কথা মেনে নিলে সে তার শিক্ষকের তাক্বলীদসহ উর্ধ্বতন যত শিক্ষক রয়েছে সকলেরই তাক্বলীদ বাতিল করল। এভাবে বিষয়টি রাসূল (ﷺ) এর সাহাবাগণ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

আর যদি সে এটাকে অস্বীকার করে, তাহলে তার কথা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাকে বলা হবে যে, কিভাবে তুমি একজন ছোট ব্যক্তির তাক্বলীদ করছ যিনি স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী? আর এর চেয়ে বড় ব্যক্তির তাক্বলীদ করা বৈধ মনে করছ না যিনি তার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। এটাতো বৈষম্যপূর্ণ?

যদি সে বলে যে, আমার শিক্ষক ছোট হলেও তার উর্ধ্বতন ব্যক্তির কাছ থেকেই জ্ঞানার্জন করেছেন। সুতরাং তিনি যা গ্রহণ করেছেন তা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আর তিনি যা পরিত্যাগ করেছেন তাও তিনি জানেন।

এক্ষেত্রে তাকে বলা হবে, এটা পূর্বের মতোই হলো, তুমি তোমার শিক্ষকের কাছ থেকে জেনেছ। আর তোমার শিক্ষক তার উর্ধ্বতন শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে তার তাক্বলীদ করাই আবশ্যক, তোমার শিক্ষকের তাক্বলীদ ছেড়ে দেয়া উচিত। এরূপভাবে তুমি যদি ভেবে দেখ, তাহলে দেখবে তোমার শিক্ষকের চেয়ে তোমার নাফসের তাক্বলীদ করাই বেশি উত্তম। কেননা তুমি তোমার শিক্ষকের ও তার উর্ধ্বতন শিক্ষকের জ্ঞান একত্রিত করেছ।

তাক্বলীদ পন্থিদের এ কথার মর্মার্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, সাহাবাদের তাক্বলীদ করার চেয়ে একজন কম বিজ্ঞ আলিমের তাক্বলিদ করা শ্রেয়, যিনি অভিজ্ঞতায় কম এমন আলিমের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাদের কথা অনুযায়ী এটাও বুঝা যায় যে, শীর্ষ মুক্বাল্লিদের জন্য তাক্বলীদুত তাবেঈ (অনুসারীর অনুসরণ) হওয়া আবশ্যক। আর অনুসারী সেই, যে নিম্নের স্তরের হয়ে থাকে। কেননা একটি নিয়ম আছে যে, উচ্চমানের ব্যক্তি নিম্নমানের ব্যক্তির উর্ধ্বে থাকে। এ কথাটিই তাদের যুক্তি বাতিল ও পরিত্যাজ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর আবূ উমার (রাহ.) বলেন, যে তাক্বলীদের কথা বলে, তাকে যদি বলা হয় তুমি কেন তাক্বলীদের কথা বলছ ? সালাফগণ (পূর্বসূরী) তো তাক্বলীদ করেন নি, অতএব তুমি কেন তাদের বিরোধিতা করছ? উত্তরে সে যদি বলে, আমি তাক্বলীদ করি এ জন্যই যে, আল্লাহর কিতাব ব্যাখ্যা করার জ্ঞান আমার নেই এবং রাসূল (ﷺ) এর হাদীস আয়ত্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর আমি যার তাক্বলীদ করি তিনি এ বিষয়গুলো জানেন। সুতরাং তিনি আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী এ দেখেই আমি তার তাক্বলীদ করি। তাহলে তাকে এর জবাবে বলা হবে, বিদ্বানগণ যখন কুরআন হাদীস বা কোন ঘটনার ব্যাখ্যার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং তাদের মতামতের উপর ইজমা সাব্যস্ত হয়; তখন সেই মতটা সঠিক বলে বিবেচিত হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু যখন তারা এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে ইজমা না করে মতভেদ করেন, তখন তুমি এক্ষেত্রে কতিপয়ের তাক্বলীদ কর ও কতিপয়কে বাদ দিয়ে রাখ। কতিপয়ের তাক্বলীদ করা ও কতিপয়কে বাদ দেয়ার ব্যাপারে তোমার দলীল কোথায়? অথচ প্রত্যেকেই তো আলিম। এমনও তো হতে পারে, তুমি যে আলিমের মতামত বাদ দিচ্ছ তিনি তোমার মাযহাবের আলিমের চেয়ে বেশি জ্ঞানী। সে যদি আবার বলে, আমি তার তাক্বলীদ করছি এই জেনে যে, এটাই ঠিক।

তাহলে তাকে বলা হবে, তুমি কি এটা কুরআন, হাদীস ও ইজমার দলীলের মাধ্যমে জেনেছ? যদি সে উত্তরে বলে যে, হাঁ! তাহলে তার তাক্বলীদ বাতিল হবে এবং তার দাবির পেছনে দলীল চাওয়া হবে।

Contents

আর যদি সে বলে, তিনি আমার চেয়ে বেশি জানেন তাই আমি তার তাক্বলীদ করি। তখন তাকে বলা হবে, তাহলে তোমার চেয়ে যে সব আলিম বেশি জানেন, তাদের প্রত্যেকেরই তাক্বলীদ কর। এতে তুমি তোমার চেয়ে জ্ঞানী অনেককেই পাবে, তাই তুমি যার তাক্বলীদ কর শুধু তাকেই নির্দিষ্ট করবে না। কেননা তুমি একটি মাত্র কারণ দেখিয়েছ যে, "তিনি আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী"।

যদি সে বলে যে, তিনি সকল মানুষের চেয়ে জ্ঞানী তাই আমি তার তাক্বলীদ করি। এর জবাবে তাকে বলা হবে, তাহলে তো তিনি সাহাবাদের চেয়েও জ্ঞানী। আর মন্দ কথা হিসেবে এটিই তার জন্য যথেষ্ট।
যদি সে আবারও বলে, আমি কতিপয় সাহাবার তাক্বলীদ করব। তাহলে তাকে বলা হবে, তাদের মধ্যে কতিপয়ের তাক্বলীদ বর্জন করার কারণ কি? এমনও তো হতে পারে যে, তাদের মধ্যে যার কথাকে বর্জন করছ তার কথাটিই উত্তম তুমি যার কথা গ্রহণ করছ তার চেয়ে। **এমনি ভাবে কোন ব্যক্তির মর্যাদার কারণেই তার কথা বিশুদ্ধ হবে এমনটি নয়। বরং সে কথাই বিশুদ্ধ যার পেছনে দলীল রয়েছে।**

ইবনে মাযীন ঈসা বিন দিনার হতে, তিনি ইবনে কাইয়ুম হতে, তিনি মালিক হতে বর্ণনা করে বলেন "মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি হলেই যে তার প্রত্যেকটি কথার অনুসরণ করতে হবে এমনটি আবশ্যক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾

যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে অতঃপর এর যা উত্তম তা অনুসরণ করে *(সূরা যুমার-১৮)*।

যদি কেউ বলে যে, আমার অবহেলা ও স্বল্প জ্ঞান আমাকে তাক্বলীদ করতে উদ্বুদ্ধ করছে।

তাহলে তাকে বলা হবে: যে ব্যক্তি শরীয়াতের কোন বিধানের ব্যাপারে সমস্যাগ্রস্ত হয়ে এমন আলিমের তাক্বলীদ করে যার জ্ঞানের ব্যাপারে সবার ঐকমত্য রয়েছে। ফলে যদি কোন ব্যক্তি সেই আলিমকে জিজ্ঞেস করে, আর আলিম তার উত্তর দেন, তাহলে এ ব্যক্তিটি ওযর প্রাপ্ত। কেননা তার যতটুকু দায়িত্ব ছিল তা সে আদায় করেছে এবং তার অজ্ঞতার কারণে সে যে সমস্যাগ্রস্ত হয়েছিল তাও সে পূরণ করেছে। বিদ্বানদের ঐকমত্যে অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য কোন আলিমের তাক্বলীদ করা আবশ্যক। যেমন কোন অন্ধ ব্যক্তি এমন নির্ভরশীল ব্যক্তির তাক্বলীদ করতে পারে যে তাকে ক্বিবলার ব্যাপারে খবর দেয়। কেননা সে এর চেয়ে আর বেশি কিছু করতে সক্ষম নয়।

কিন্তু যার অবস্থা এরূপ, অর্থাৎ যে নিজেই অজ্ঞ সে কি আল্লাহর দীনের বিধানের ব্যাপারে ফাৎওয়া দিতে পারে? ফলে যে কথার বিশুদ্ধতা জানা নেই এবং যে ব্যাপারে তার কোন দলীল নেই, এমন কথার মাধ্যমে সে লজ্জাস্থান, রক্ত প্রবাহিত করা ও দাস বানানোকে বৈধ মনে করতে পারে এবং যার হাতে মালিকানা ছিল, তার হাত থেকে তা কেড়ে নিয়ে অন্যের কাছে হস্তান্তর করতে পারে। এমন করা কি তার জন্য বৈধ হবে?

এ কথা স্বীকৃত যে, এভাবে মতামত দিলে সে ভুলও করতে পারে আবার সঠিকও করতে পারে। আর যে এর বিরোধিতা করছে সেও কোন ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে। যে ব্যক্তি মৌলিকতা সম্পর্কে, অর্থ সম্পর্কে ও শাখা-প্রশাখা আয়ত্ত করার ব্যাপারে অজ্ঞ, তার পক্ষ থেকে যদি ফাৎওয়া প্রদান করা বৈধ মনে করা হয়, তাহলে তো সবার জন্য ফাৎওয়া দেয়া জায়েয হয়ে যাবে। আর এটাই মূর্খ হওয়ার জন্য এবং কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

www.waytojannah.com

আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾

আর যে বিষয় তোমার জানা নেই তার অনুসরণ করো না। (সূরা ইসরা:৩৬)

আল্লাহ আরও বলেন:

﴿أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

নাকি আল্লাহর উপর এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না? (সূরা বাক্বারাহ:৮০)

বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত , যে বিষয়টি স্পষ্ট নয় এবং যে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেটা জ্ঞান নয়। বরং এটা ধারণা মাত্র। আর ধারণা সত্যের কোনো উপকার করে না। *এ কথাগুলো ইবনু আব্দিল বার (রাহি.) এর সংকলন থেকে নেয়া হয়েছে।*

১১। তাক্বলীদ (দলীলবিহীন অনুসরণ) ও ইত্তেবার (দলীলভিত্তিক অনুসরণ) মধ্যে পার্থক্য:

শানকীত্বী (রাহি.) বলেন,[৪৮] জেনে রাখুন যে, তাক্বলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য জানা জরুরী। ইত্তেবার স্থলে কোন অবস্থাতেই তাক্বলীদ করা বৈধ নয়। এর বিস্তারিত আলোচনা এই যে, যে সব বিধানের ব্যাপারে কুরআন, হাদীস অথবা মুসলমানদের প্রকাশ্য ইজমার দলীল পাওয়া যায় সে সব ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই তাক্বলীদ বৈধ নয়। কেননা যে ইজতিহাদ দলীল বিরোধী তা বাতিল হিসেবে গণ্য। আর ইজতিহাদের ক্ষেত্র ছাড়া তাক্বলীদ করা যাবে না। কেননা কুরআন ও হাদীসের দলীলসমূহ প্রত্যেক মুজতাহিদের উপর কর্তৃত্ব দান করে । সুতরাং কোন মুজতাহিদদের উচিত নয় এ বিধানের বিরোধিতা করা।

আর কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা বিরোধী কোন তাক্বলীদ বৈধ নয়। কেন না তা হক্ব বিরোধী আদর্শ। সুতরাং যে ক্ষেত্রে দলীল প্রতিষ্ঠিত, সেখানে শুধু ইত্তেবাই যথেষ্ট। যে ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ'র দলীল পাওয়া যায় এবং তা পরস্পর বিরোধী হয় না, সে ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ করা যাবে না। বিদ্বানদের নিকট তাক্বলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য একটি সুপরিচিত বিষয়। এর সঠিক অর্থের ব্যাপারে বিদ্বানদের নিকট কোন মতভেদ নেই।

ইতিপূর্বে আমরা যে খুয়াইয মিনদাদ এর উক্তি তুলে ধরেছি, যা ইবনে আব্দিল বার তার থেকে তার জা'মিতে সংকলন করে বলেন:

শারঈ পরিভাষায় তাক্বলীদ হলো এমন মতামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, যার পেছনে মতামতদাতার কোন দলীল নেই । শরীয়াতে এরূপ বিষয় একেবারেই নিষিদ্ধ। আর যার পেছনে দলীল আছে তাকে ইত্তেবা বলা হয়।

তিনি তার কিতাবের অন্য জায়গায় বলেন, তুমি যদি কারও মতামতকে দলীল ছাড়াই অনুসরণ করাকে আবশ্যক মনে কর তাহলে তুমি মুক্বাল্লিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে। আর আল্লাহর দীনের ক্ষেত্রে তাক্বলীদ করা বৈধ নয়। আর যদি দলীলের মাধ্যমে কারও কথার অনুসরণ করা তোমার জন্য আবশ্যক হয়, তাহলে তুমি তার ইত্তেবা করলে। দীনের ক্ষেত্রে ইত্তেবা বৈধ। কিন্তু তাক্বলীদ বৈধ নয়।

---

[৪৮] 'আযওয়াউল বায়ান' (৭/৫৪৭-৫৫০)।

"ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন" গ্রন্থে ইবনুল কাইয়্যিম (রাহি.) বলেন: ইমাম আহমাদ (রাহি.) তাক্বলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

অতঃপর আবূ দাউদ বলেন, আমি ইমাম আহমাদ (রাহি.) কে বলতে শুনেছি যে, ইত্তেবা হলো, কোন ব্যক্তি মহানাবী (ﷺ) ও তার সাহাবাগণের পক্ষ থেকে যা এসেছে তার অনুসরণ করবে। এরপর তাবেঈদের অনুসরণ করা তার জন্য ইচ্ছাধীন। আর এখান থেকেই এ উদ্দেশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

তিনি (আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন) এর কায়দা উল্লেখ করে বলেন, ওহী ভিত্তিক আমল ইত্তেবারই অন্তর্ভুক্ত। এটা তাক্বলীদ নয়। এটি একটি অকাট্য বিষয়।

অনেক আয়াতে ওহীর প্রতি আমল করাকে ইত্তেবা নামে অবহিত করা হয়েছে। এর প্রমাণে নিম্নের আয়াতগুলো পেশ করা হলো- আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

বল, আমিতো তারই অনুসরণ করি, যা আমার নিকট আমার রবের পক্ষ থেকে ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ। আর তা হিদায়াত ও রহমত সে কওমের জন্য যারা ঈমান আনে *(সূরা : আ'রাফ-২০৩)*।

আল্লাহ বলেন:

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾

তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর *(আ'রাফ-৩)*।

আল্লাহ বলেন:

﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾

আর অনুসরণ কর উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে *(যুমার-৫৫)*।

আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

বল, আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন পরিবর্তনের অধিকার নেই। আমিতো শুধু আমার প্রতি অবতীর্ণ ওহীর অনুসরণ করি। নিশ্চয় আমি যদি রবের অবাধ্য হই তবে ভয় করি কঠিন দিবসের আযাবের *(সূরা : ইউনূস-১৫)*। আল্লাহ বলেন:

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

আর এটি কিতাব– যা আমি নাযিল করেছি– বরকতময়। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাক্বওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও *(সূরা : আনআম-১৫৫)*।

আল্লাহ বলেন:

﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾

তুমি অনুসরণ কর তার, তোমার প্রতি যা ওহী প্রেরণ করা হয়েছে তোমার রবের পক্ষ থেকে। তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই । আর মুশরিকদের থেকে বিমুখ থাক *(সূরা : আনআম-১০৬)*।

www.waytojannah.com

আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾

বল, 'আমি রাসূলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে? আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আর আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। *(সূরা : আহকাফ-৯)*। এরূপ আরও অনেক সুপরিচিত আয়াত রয়েছে।

সুতরাং ওহী ভিত্তিক আমল করাকেই ইত্তেবা বলা হয়। যা উল্লেখিত আয়াতগুলি দ্বারাই প্রমাণিত।

উল্লেখ্য যে, নিঃসন্দেহে ওহীর অনুসরণের জন্য বহু আয়াতে নির্দেশ রয়েছে। ওহী বিরোধী কোন ইজতিহাদ কোন ভাবেই বিশুদ্ধ নয় এবং ওহী বিরোধী কোন তাক্বলীদও কোন ক্ষেত্রে বৈধ নয়।

সুতরাং এ থেকে ইত্তেবা ও তাক্বলীদের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল। আরও স্পষ্ট হলো যে, ইত্তেবার ক্ষেত্র সমূহে তাক্বলীদের কোন সুযোগ নেই।

অতএব পরস্পর বিরোধমুক্ত সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ ওহীর দলীল পাওয়া গেলে অবশ্যই ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ করা যাবে না। কেননা একথা স্পষ্ট যে, ওহীর অনুসরণ করা ও তার প্রতি আত্মসমর্পণ করা প্রত্যেকের উপর ফরয। সে যে কেউ হোক না কেন।

এ থেকে বুঝা যায় যে, উসূলবীদগণ ইজতিহাদের যে শর্তগুলো আরোপ করেছেন তা কেবল মাত্র ইজতিহাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর ইত্তেবার স্থানে ইজতিহাদের কোন সুযোগ নেই ।

সুতরাং ইত্তেবা ও ইজতিহাদের মাঝে শাব্দিক ও প্রায়োগিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইজতিহাদের শর্তসমূহকে ইত্তেবার শর্তের মধ্যে প্রয়োগ করা বিভ্রান্তির নামান্তর। যা পূর্বের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট।

মোট কথা ওহীর ইত্তেবার জন্য কেবল মাত্র জ্ঞান অর্জন করাই শর্ত। যে জ্ঞান অনুসারে ওহীর ইত্তেবাকারী আমল করবে। এক্ষেত্রে তাকে হাদীস ও কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ও তদনুযায়ী আমল করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কুরআন ও হাদীসে জ্ঞানার্জনের পর ইজতিহাদের সকল শর্ত অর্জনের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই।

সুতরাং প্রত্যেক শারঈ দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অবশ্যক হলো, কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জ্ঞানার্জন করা। সম্পূর্ণভাবে অর্জিত জ্ঞানের উপর আমল করা। যে ধারাবাহিকতার উপর অটল ছিলেন এ উম্মাতের কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত প্রথম শতাব্দীর অনুসারীগণ।

১২। ইমামদের তাক্বলীদকারীদের ব্যাপারে সতর্কতা:

জেনে রাখুন! যে ব্যক্তি মনে করে প্রত্যেক বিষয়ে ইমামের তাক্বলীদ করা ছাড়া তার কোন উপায় নেই। কেননা সে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবা ও তাবেঈদের মতামত এবং এ ইমাম ছাড়া অন্য কারও মতামত দ্বারা দলীল দিতে সক্ষম নয়।

তার জন্য পরিপূর্ণভাবে সতর্ক থাকা ওয়াজিব হবে, যেন সে সত্য থেকে দূরে অবস্থিত ইমামের বক্তব্য থেকে এবং সে ইমামের পরবর্তীতে তার মাযহাবের নীতি-মালার ভিতর যা সংযোজিত হয়েছে সে ক্ষেত্রেও যেন সে পার্থক্য করতে পারে এবং পরবর্তীগণ কালের পরিক্রমায় যে সকল ভাল বিষয় অতিরিক্ত (বিদ'আত) সংযোজন করেছেন, কুরআন ও সুন্নাহতে যার কোন ভিত্তি নেই, সেটাও পার্থক্য করা তার জন্য আবশ্যক হবে।

Contents

মূলতঃ যদি কোন ইমাম তার মাযহাবে পরবর্তীদের দ্বারা সংযোজিত কোন বিষয়ের **কথা জানতে** পারতেন তাহলে তা থেকে ইমাম বিরত থাকতেন এবং এ সংযোজনকে অস্বীকার করতেন। **সুতরাং** এ সকল অতিরিক্ত বিষয়ের সবগুলোকে শুধু ইমামের দিকেই সম্বোধন করা সুস্পষ্ট বাতিল ধারণা **মাত্র**। তদুপরি "এগুলো শরীয়াতের বিধান যা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর মাধ্যমে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে"-এ বলে তা আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ) এর দিকে সম্বোধন করা তো আরও ভ্রান্ত বিষয়। এরূপ আরও অনেক ছোট ছোট বিষয় মাযহাবের ভিতরে এবং পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলোতে স্থান পেয়েছে।[৪৯]

১৩। দলীলের অনুসরণ করার মানে এ নয় যে, এর দ্বারা ইমামের মতামতের বিরোধিতা করা হলোঃ

মাযহাবপন্থি কতিপয় মুক্বাল্লিদ ধারণা করে যে, কুরআন-সুন্নাহ'র দলীলের ইত্তেবার দিকে দাওয়াত দেয়া এবং ইমামদের কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী মতামতগুলোকে বর্জন করা হলে সাধারণভাবে ইমামদের সকল কথাকে পরিত্যাগ করা হলো ও তাদের ইজতিহাদের উপকারিতাকে বর্জন করা হলো।

আল্লামা আলবানী (রাহি.) বলেনঃ[৫০]

এ ধারণাটি সত্য থেকে অনেক দূরে, বরং তা প্রকাশ্যভাবে বাত্বিল (মিথ্যা)। যেমনটি পূর্বোক্ত কথাগুলো থেকে প্রতিভাত হয়, কেননা সব কয়টি কথাই উক্ত ধারণার বিপরীত অর্থ বহন করছে। আমরা যে বিষয়টির দিকে দাওয়াত দান করি তার সবই হচ্ছে এই যে, মাযহাবকে দীনরূপে গণ্য করা যাবে না এবং তাকে কুরআন ও হাদীসের স্থলে এমনভাবে আসন দেয়া চলবে না যে, বিবাদ মিটানোর ক্ষেত্রে অথবা নবোদ্ভাবিত সমস্যার নতুন বিধান বের করার উদ্দেশ্যে তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যেমন করে থাকেন বর্তমান যুগের ফক্বীহরা। তারা শুদ্ধ-অশুদ্ধ হক-বাত্বিল জানার জন্যে কুরআন হাদীসের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়াই বিবাহ, তালাক ইত্যাদির নতুন বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন। আর এক্ষেত্রে তাদের তরীকাহ (নীতি বা পথ) হচ্ছে (اختلافهم رحمة) অর্থঃ তাদের মতভেদ হচ্ছে রহমাত এবং অনুমোদন, সহজ করণ বা সংশোধনের অনুসরণ। এ বিষয়ে সুলাইমান তামীমী (রাহিমাহুল্লাহ) কতইনা সুন্দর বলেছেনঃ (إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله) অর্থঃ "তুমি যদি প্রত্যেক আলিমের প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ কর তবে সব অনিষ্ট তোমার মধ্যে একত্রিত হবে"।

ইবনু আব্দিল বার এর বিপরীত মত দিয়েছেন, তিনি (২/৯১-৯২) বলেন, এটি সর্বসম্মত কথা। এ বিষয়ে কোন মতানৈক্য আছে বলে আমার জানা নেই। উপরোক্ত নীতি যা আপনি ইজমা বলে মনে করেন,আমরা তার প্রতিবাদ করি।

আর তাদের কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তা থেকে উপকৃত হওয়া, বিতর্কিত যে সব বিষয়ে কুরআন হাদীসের স্পষ্ট প্রমাণ নেই সেগুলোর সঠিক অবস্থা বুঝতে সহযোগিতা নেয়া অথবা যে সব বিষয় ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে তা বুঝতে যাওয়া এটাতো আমরা অস্বীকার করি না বরং এ ব্যাপারে নির্দেশ দান করি এবং উৎসাহ যোগাই, কারণ এ থেকে ঐ ব্যক্তির উপকৃত হওয়ার আশা করা যায় যে কুরআন হাদীসের হিদায়াত গ্রহণের পথ অবলম্বন করে।

---

[৪৯] শানক্বীতী প্রণীত 'আযওয়াউল বায়ান' (৭/৫৭৬) এবং তার পরবর্তী অংশ, এখানে এর উপর অনেক উদাহরণ দেয়া হয়েছে। আপনি ইচ্ছা করলে সেখানে দেখতে পারেন।

[৫০] 'সিফাতু সালাতিন্নাবী' এর ভূমিকা (পৃঃ৬৯-৭০)।

www.waytojannah.com

আল্লামা ইবনু আব্দিল বার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন (২/১৭২):

হে ভাই! তোমার উপর মৌলনীতি মুখস্থ করা এবং তা সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। আর জেনে রাখুন, যে ব্যক্তি সুন্নাহ এবং কুরআনের স্পষ্ট বিধানগুলো সংরক্ষণ করেছে এবং ফক্বীহদের কথার ভিতর দৃষ্টি দিয়েছে এবং এটাকে তার গবেষণা কার্যের সহযোগী বিবেচনা করেছে এবং তাকে চিন্তা গবেষণার চাবি-কাঠিরূপে গণ্য করেছে ও একাধিক অর্থ সম্ভাবনাময় হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছে আর তাদের কোন একজনের এমনভাবে অন্ধ অনুসরণ করে নি যেরূপ করতে হয় হাদীসের ক্ষেত্রে, যার আনুগত্য সর্বাবস্থায় ও কোনরূপ চিন্তাভাবনা ছাড়াই ওয়াজিব, আর সে নিজেকে মুক্ত রাখে নি ঐ কাজ থেকে যে কাজে উলামাগণ নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতেন তথা হাদীস মুখস্থ করা ও তাতে চিন্তা নিবদ্ধ রাখা। বরং গবেষণা, বুঝা এবং চিন্তাভাবনায় তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে এবং সর্বোপরি সে তাদের উপকার দান ও অবহিত করানোর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যয়িত শ্রমের শুকরিয়া করেছে। তাদের প্রদত্ত সঠিক সিদ্ধান্ত যার পরিমাণই বেশি রয়েছে এর উপর তাদের প্রশংসা করেছে, তিনি তাদেরকে ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় পান নি, যেমন তারা নিজেদেরকেও ত্রুটিমুক্ত করতে পারেন নি, তবে সেই হবে ঐ বিদ্যান্বেষী যে পূর্বসূরী সৎ ব্যক্তিগণের আদর্শে অটল, তার অধিকার আদায়ে সার্থক, সঠিক পথ প্রদর্শক, নাবী (ﷺ) এর সুন্নাতের এবং তাঁর সাহাবা (রাযিয়াল্লাহ আনহুম) দের আদর্শের অনুসারী।

পক্ষান্তরে, যে নিজেকে চিন্তা গবেষণা থেকে দূরে রেখেছে এবং আমরা যা উল্লেখ করেছি তা থেকে বিমুখ রয়েছে এবং স্বীয় মতামত দ্বারা হাদীসের বিরোধিতা করেছে এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে অন্যকে ঠেলে দিতে চায় সে নিজে পথভ্রষ্ট এবং অপরকে ভ্রষ্টকারী, আর যে ব্যক্তি এসবের কিছুই না জেনে বিদ্যাহীনভাবে ফাৎওয়াদানে প্রবৃত্ত হয় সে আরও কঠিন অন্ধ এবং আরও অধিক পথভ্রষ্ট।

কবি বলেন:

فهذا هو الحق ما به خفاء فدعني عن بنيات الطريق

অর্থ: এটাই চির সত্য যাতে কোন অস্পষ্টতা নেই,

অতএব তুমি আমাকে নানারূপ পথ থেকে বাঁচতে দাও, স্পষ্ট পথসমূহ অবলম্বন করতে ছেড়ে দাও।

এ সব সতর্কবাণীর ক্ষেত্রে আমি বলব, একজন একনিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য কুরআন হাদীসের বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, কুরআন হাদীসের বিরোধী সব কিছু বর্জন করা এবং হক্ব বিরোধী তাক্বলীদ প্রত্যাখ্যান করাই যথেষ্ট। কেউ যদি এটা অস্বীকার করে তাক্বলীদ করতে চায়, তাহলে আমরা বলব ইবনু আব্দিল বার ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেছেন: "এ ব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত যে, মুক্বাল্লিদগণ বিদ্বানদের কাছে গণনাযোগ্য নয়"।

আর একজন মুক্বাল্লিদ কোন মুজতাহিদের উপর অভিযোগ আরোপ করতে পারে না। যদি সে বলে যে, আপনি মুজতাহিদ নন, তাহলে আমরা বলব যে, বিদ্বানদের মতে ইজতিহাদ অনেকভাবে বিভক্ত। সুতরাং একজন মুজতাহিদের জন্য আবশ্যক নয় যে, তাকে প্রত্যেক মাসআলার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করতে হবে। তাই তোমার অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। "একজন অন্ধ ব্যক্তির কি দিরহাম যাচাই-বাছাই করার যোগ্যতা আছে?"!!

Contents

১৪। সর্বশেষ হলো: মতানৈক্যের মধ্যে কি কোন প্রশস্ততা ও রহমত রয়েছে? এবং হক্ব কি বিভিন্ন প্রকার হয়?

অনেক মানুষ এমন রয়েছে যারা নিজেদেরকে ফিক্বহী মাযহাবের দলভুক্ত বলে সম্বোধন করে। বিশেষ করে বর্তমান যুগে এটা বেশি পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ এরা এমন অস্বীকারকারী যারা স্ব-স্ব মাযহাবকে ধরে রাখতে চায় এবং তা থেকে সরে যেতে চায় না। তারা মনে করে যে, এ সব মাযহাবের যে কোন একটি গ্রহণ করা দরকার। ফলে তারা ঐ সব পছন্দনীয় বিষয়কে বৈধ করে যা তাদের মুগ্ধ করে এবং যা তাদের প্রবৃত্তির অনুযায়ী হয়। আর তারা এ সব মাযহাবের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চায়, যদিও এ দাবীগুলো দলীলের বিপক্ষে যায়। তারা তাদের দাবীর পক্ষে এ দলীল উপস্থাপন করে যে, "এ ব্যাপারে কোন একজন বিদ্বান বলেছেন। আর (اختلاف أمتي رحمة) "আমার উম্মতের মতভেদ রহমত স্বরূপ"-এ হাদীস দ্বারা যুক্তি পেশ করে বলে যে, উম্মতের মধ্যে প্রশস্ততা রয়েছে।

এ সংশয়টির জবাব দিয়ে আল্লামা আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:[৫১] এর উত্তর, দু'ভাবে হবে:

প্রথম উত্তর:

হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়, বরং তা বাত্বিল, তার কোন ভিত্তি নেই। আল্লামা সুবকী বলেন: আমিও এ হাদীসের সূত্র পাই নি । না সহীহ, না যঈফ, না জাল হাদীস।

আমার মতে: বরং এ শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে: (اختلاف أصحابي لكم رحمة . . .) অর্থ: ..... আমার সাহাবাদের মতভেদ তোমাদের জন্যে রহমত। (أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم) অর্থ: "আমার সাহাবাগণ তারকারাজির ন্যায়, তাদের যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে হিদায়াত পেয়ে যাবে।"

এ উভয় বাক্যই বিশুদ্ধ নয়, প্রথমটি মারাত্মক দুর্বল, আর দ্বিতীয়টি জাল। আমি সবক'টিকে (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) গ্রন্থের ৫৮-৫৯, ৬১ নম্বরে যাচাই করে দেখেছি।

দ্বিতীয় উত্তর: হাদীসটি যঈফ হওয়ার সাথে সাথে তা কুরআন বিরোধীও বটে। কেননা মতবিরোধ থেকে বিরত ও ঐকমত্য থাকার ব্যাপারে আদেশ সংক্রান্ত আয়াত এত বেশি প্রসিদ্ধ যে, তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু উল্লেখ করা যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾

আর তোমরা পরস্পরে বিবাদ কর না, তাহলে অকর্মণ্য হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি হারিয়ে যাবে *(সূরা: আনফাল-৪৬)*। তিনি আরও বলেন:

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾

আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা তাদের দীনে বিভেদ সৃষ্টি করেছে আর নিজেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত *(সূরা: রূম-৩১,৩২)*।

---

[৫১] 'সিফাতু সালাতিন্নাবী' (পৃ:৫৯-৬৬)

www.waytojannah.com

তিনি আরও বলেন:

﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ﴾

তোমার পালনকর্তা যাদেরকে অনুগ্রহ করেন তারা ব্যতীত অন্যান্যরা সর্বদা মতভেদ করতেই থাকবে *(সূরা: হুদ-১১৮,১১৯)*।

তোমার প্রতিপালক তাদেরকে অনুগ্রহ করেন যারা মতভেদ করে না, সুতরাং বুঝা গেল যারা বাতিলপন্থি তারাই মতভেদ করে। তবে কোন বিবেক বলবে যে, মতভেদ করা রহমত?

অতএব, সাব্যস্ত হলো যে, এ হাদীস বিশুদ্ধ নয়, না সনদের (সূত্রের) দিক দিয়ে আর না মতনের (শব্দের) দিক দিয়ে। এখনি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কুরআন হাদীসের উপর আমল বন্ধ রাখার জন্য এ হাদীসকে সংশয়ের উৎস বানানো বৈধ নয়, যে ব্যাপারে ইমামগণও আদেশ দিয়েছেন।

যখন দীনের ব্যাপারে মতভেদ নিষিদ্ধ হলো তবে সাহাবা ও তাদের পরবর্তী ইমামগণের মতভেদ সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কী? আর তাদের মতবিরোধ ও পরবর্তীদের মতপার্থক্যের মধ্যে কি কোন তফাৎ রয়েছে?

উত্তর: হ্যাঁ, উভয় মতানৈক্যের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে যা দু'টি বিষয়ের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়।

এক- মত পার্থক্যের কারণ।

দুই- তার প্রতিক্রিয়া।

সাহাবাদের মধ্যকার মতভেদ ছিল অনিবার্য কারণ সাপেক্ষে, যা তাদের বুঝের বেলায় স্বভাবগতভাবেই সংঘটিত হয়েছিল, ইচ্ছাকৃতভাবে মতপার্থক্য তৈরির জন্য নয়। এর সাথে আরও কিছু বিষয় যোগ হবে যা তাদের যুগে মতবিরোধকে অপরিহার্য করেছে যা তৎপরর্তীকালে দূর হয়ে যায়। আর এটি এমন মতানৈক্য যা থেকে সম্পূর্ণ উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। উপরোক্ত আয়াত বা তার সমার্থবোধক আয়াতসমূহের নিন্দাও তাদেরকে স্পর্শ করবে না। কেননা এক্ষেত্রে জবাবদিহিতার শর্ত বিদ্যমান নেই। আর তা হচ্ছে ইচ্ছা বা পীড়াপীড়ি করে অটল থাকা।

কিন্তু বর্তমান যুগের অন্ধ অনুসরণকারীদের (মুক্বাল্লিদদের) মধ্যকার মতভেদ এমন পর্যায়ের যাতে সাধারণত কোন ওযর নেই। কেননা তাদের কারও নিকট কখনও কুরআন হাদীসের এমন দলীল প্রকাশিত হয় যা সাধারণত তিনি যে মাযহাবের অনুসরণ করেন না তার সমর্থন করে, তখন তিনি শুধু এজন্যই তা পরিত্যাগ করেন যে এটি তার মাযহাবের বিপরীত, আর অন্য কোন কারণে নয়। যার পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, মাযহাবটাই তার কাছে যেন আসল অথবা এটাই সেই দীন যা নিয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ) আগমন করেছেন, আর অন্য মাযহাব হচ্ছে ভিন্ন আরেক দীন যা রহিত হয়ে গেছে।

অপর আরেক দল এদের বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। তারা এই বিস্তর মতানৈক্যপূর্ণ মাযহাবগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন শরীয়াত মনে করেন। যেমন স্পষ্ট ভাষায় তাদের পরবর্তীদের কেউ কেউ এ কথা বলেছেন:

لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء ويدع ما شاء إذ الكل شرع

অর্থ: মুসলিম ব্যক্তির বেলায় এ সব মাযহাব থেকে ইচ্ছা মাফিক গ্রহণ ও বর্জনে কোন আপত্তি নেই যেহেতু এগুলো প্রত্যেকটি (স্বতন্ত্র) শরীয়ত।

আর উভয় প্রকারের লোকজনই কখনও কখনও সেই বাতিল হাদীস (اختلاف أمتي رحمة) "আমার উম্মতের মতভেদ রহমত স্বরূপ" দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকে। তাদেরকেও উক্ত হাদীস দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে দলীল গ্রহণ করতে শুনেছি। তাদের কেউ কেউ আবার এ হাদীসের কারণও দর্শায় এ বলে যে, মতভেদটা এজন্যই রহমত যে, এতে জাতির উপর উদারতা প্রদর্শন করা হয়। এ ব্যাখ্যাটি পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের স্পষ্ট বিরোধী ও ইমামগণের পূর্বোল্লেখিত বক্তব্যসমূহের মর্মবিরোধী হওয়া ছাড়াও তাদের কারও কারও স্পষ্ট প্রতিবাদও এর বিরুদ্ধে এসেছে।

ইবনু কাসিম বলেন: আমি মালিক এবং লাইসকে বলতে শুনেছি রাসূল (ﷺ) এর সাহাবাদের মতবিরোধ সম্পর্কে লোকজন যে রকম বলে যে, এতে উদারতা রয়েছে তা সঠিক নয় বরং তা হচ্ছে ভুল অথবা শুদ্ধের ব্যাপার মাত্র।

আশহাব বলেন: ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করা হলো ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে রাসূল (ﷺ) এর বিশ্বস্ত কোন সাহাবীর বর্ণনাকৃত হাদীসের কোন একটি হাদীস অবলম্বন করল আপনি কি তাকে এ ব্যাপারে স্বাধীন মনে করেন? তিনি বললেন: "আল্লাহর শপথ, না, যতক্ষণ হক্ব পর্যন্ত না পৌঁছে, হক্বতো একটাই, বিপরীতমুখী দু'টি কথাকি একই সাথে সঠিক হয়? সত্য ও সঠিক একটাই হয়"।

ইমাম শাফেঈর সাথী মাযিনী বলেন: রাসূল (ﷺ) এর সাহাবাগণ মতবিরোধ করেছেন, তাদের একজন অপরজনের ভুল ধরেছেন এবং তাদের একজন অপরজনের মতামত বিবেচনা করে দেখেছেন এবং তার উপর মন্তব্য করেছেন। যদি তাদের সব কয়টি কথা সঠিকই হত, তবে তারা এমনটি করতেন না।

আর উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) একদা উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه) এবং ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) কে একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে সালাত (বিশুদ্ধ হওয়া না হওয়া) এর ব্যাপারে মতানৈক্য করতে দেখে তাদের উপর রাগান্বিত হন। যখন উবাই বললেন: একটি কাপড়ে সালাত আদায় করা সুন্দর ও চমৎকার কাজ। আর ইবনু মাসউদ বললেন, এটা তো কেবল ঐ সময়কার কথা যখন কাপড় কম ছিল। তখন উমার (رضي الله عنه) রাগান্বিত হয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন রাসূল (ﷺ) এর এমন দু'জন সাহাবী মতভেদ করছেন যাদের অনুকরণ করা হয় এবং যাদের কথা গ্রহণীয়। তবে উবাই সঠিক বলেছেন আর ইবনু মাসউদ চেষ্টায় ত্রুটি করেন নি। কিন্তু আমার আজকের এই বক্তব্য শুনার পর যে কাউকে এ বিষয়ে মতভেদ করতে শুনব তাকেই এ এ (শাস্তি) প্রদান করব।

ইমাম মাযানি আরও বলেন: যে ব্যক্তি মতভেদকে জায়েয রাখে এবং এ ধারণা পোষণ করে যে, কোন একটি বিষয়ে যদি দু'জন আলিম মতবিরোধ করেন এবং একজন বলেন: এটা হালাল আর অপরজন বলেন: এটা হারাম? তবে তাদের উভয়জনই তাদের গবেষণায় হক্বের উপর আছেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হবে- তুমি এ কথা দলীল ভিত্তিক বলেছ, নাকি ক্বিয়াস (অনুমান) ভিত্তিক? যদি বলে: দলীল ভিত্তিক, তবে তাকে বলা হবে কিভাবে দলীল ভিত্তিক হয় অথচ কুরআন (এর বিপক্ষে) মতানৈক্যকে নিষেধ করছে? যদি সে বলে যে, আমি কিয়াস দ্বারা করেছি। তাহলে বলা হবে কিভাবে করতে পার? যেখানে আসল (কুরআন ও সুন্নাহ) বলছে মতভেদ করা যাবে না। আর তুমি কিভাবে মতভেদকে বৈধ করার জন্য এর উপর কিয়াস করছ? এটা কোন আলিমতো দূরের কথা কোন বিবেকবান ব্যক্তি বৈধ বলতে পারে না।

www.waytojannah.com

যদি কেউ বলেন: আপনি ইমাম মালিক থেকে যা উল্লেখ করলেন যে হক্ব একটাই হয় একাধিক হয় না, তাতো অধ্যাপক যুরক্বা তার আলমাদখালুল ফিক্বহী (المدخل الفقهي) গ্রন্থে (১/৮৯) যা লিখেছেন তার বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন: খলীফা আবূ জা'ফর আল মানসূর এবং তার পরে খলীফা হারুনুর রশীদ স্থির করেন যে, ইমাম মালিক এর মাযহাব ও তার কিতাব (الموطأ) কে আব্বাসীয় রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের সংবিধান হিসেবে পরিগণিত করবেন তাতে মালিক উভয়কে বাধা দেন এবং বলেন: "রাসূল (ﷺ) এর সাহাবাগণ (ফিক্বহের) শাখা-প্রশাখার মাসআলায় মতভেদ করেছেন এবং দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছেন আর তাদের প্রত্যেকেই সঠিক"।

আমি বলছি: এ ঘটনাটি ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, কিন্তু শেষের কথাটি "প্রত্যেকেই সঠিক" তার কোন ভিত্তি আমি জানতে পারি নি- ঐ সকল বর্ণনা ও গ্রন্থাদির মাধ্যমে আমি যেগুলো অবগত হয়েছি। তবে আবূ নুআইম তার 'আল হিলইয়াহ্' (الحلية) গ্রন্থে (৬/৩৩২) একটি মাত্র বর্ণনা নিয়ে এসেছেন যাতে মিক্বদাম ইবনু দাউদ রয়েছেন, একে যাহাবী দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাছাড়া এর শব্দ হচ্ছে: (وكل عند نفسه مصيب) অর্থ: প্রত্যেকেই নিজের বিচারে সঠিক।

তার কথা عند نفسه প্রমাণ বহন করে যে, (المدخل) গ্রন্থে আংশিক বর্ণনা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনটি কেনই বা হবে না যেখানে এটা ইমাম মালিক থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার বিরোধিতা করছে যা হচ্ছে এই যে, হক্ব এক, তা একাধিক হয় না, যেমন এর আলোচনা অতিবাহিত হয়ে গেল। এর উপরে সাহাবা, তাবিঈন এবং মুজতাহিদ ইমাম চতুষ্টয় ও অন্যান্য ইমামগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইমাম ইবনু আব্দিল বার বলেন: (২/৮৮) সংঘাতপূর্ণ দুই পক্ষের উভয় বক্তব্যই যদি সঠিক হত তবে সালাফদের একজন অপরজনের গবেষণা, বিচার এবং ফাৎওয়াতে ভুল ধরতেন না। বিবেকও একথা অস্বীকার করে যে, কোন বস্তু আর তার বিপরীতমুখী বস্তু উভয়টাই সঠিক হবে। কি সুন্দরইনা বলেছেন যিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেছেন:

إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال

অর্থ: দু'টি বিপরীত বস্তুকে একই অবস্থায় এক সাথে সাব্যস্ত করা অশোভনীয় এবং অসম্ভবও বটে।

যদি বলা হয়: এই বর্ণনা যদি ইমাম থেকে ভুল সাব্যস্তই হয়, তবে মানসূর যখন মানুষকে তাঁর কিতাব **(الموطأ) এর উপর** ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি কেন তা গ্রহণ না করে অস্বীকৃতি জানান।

আমি বলছি: সর্বাধিক সুন্দরতম যে বর্ণনা সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি তা হচ্ছে ঐটি যেটি হাফিয ইবনু কাসীর তার **শারহ ইখতিসারি** উলূমিল হাদীস গ্রন্থে (পৃ.৩১) উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মালিক বলেন: "লোকজন এমন সব বিষয় একত্রিত করেছে ও জেনেছে যা আমি (হয়ত) জানতে পারি নি"। একথা তার (ইমাম মালিকের) জ্ঞান ও ইনসাফের পূর্ণতার প্রমাণ। যেমন ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন।

সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, সব মতভেদই মন্দ এবং তা রহমত নয়। তবে কোন কোন মতভেদ এমন রয়েছে যার উপর মানুষকে পাকড়াও করা হবে যেমন গোঁড়া মাযহাবপন্থিদের মতভেদ। আর কোনটি এমন যে, তার উপর পাকড়াও করা হবে না। যেমন সাহাবা ও তাদের অনুসারী ইমামগণের মতভেদ। আল্লাহ তাদের দলে আমাদের একত্রিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করার তাওফীক্ব দান করুন। এখন প্রকাশ পেল যে, সাহাবাগণের মতভেদ ছিল মুক্বাল্লিদদের মতভেদ থেকে আলাদা।

Contents

সারকথা: সাহাবাগণ নিরুপায় অবস্থায় মতভেদ করেছেন। কিন্তু তারা মতভেদের **বিরুদ্ধাচরণ করেছেন** এবং যতদূর সম্ভব এ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। **পক্ষান্তরে, মুক্বাল্লিদগণ মতভেদপূর্ণ বিষয়ের** বিরাট এক অংশে এ মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও তারা একমত হয় **না এবং** এর জন্য চেষ্টাও করে না, বরং তারা একে সাব্যস্ত করে। তাই উভয় মতবিরোধের মধ্যে বিরাট দূরত্ব রয়েছে। এ পার্থক্য ছিল কারণের দিক থেকে।

আর প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে উভয় মতভেদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আরও স্পষ্ট, আর তা এই যে, সাহাবাগণ অমৌলিক বা খুঁটিনাটি বিষয়ে মতবিরোধ করা সত্ত্বেও- তারা ঐক্যের ভাবমূর্তিকে কঠিনভাবে সংরক্ষণ করতেন। যে সব বিষয় ঐক্যবাক্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি করে তা থেকে তারা সম্পূর্ণ বিরত থাকতেন। যেমন তাদের মধ্যে কেউ সশব্দে বিসমিল্লাহ বলার পক্ষে মত ব্যক্ত করতেন আবার কেউ এটি ঠিক মনে করতেন না। তাদের কেউ রাফউল ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব মনে করতেন আবার কেউ তা মনে করতেন না। এমনিভাবে কেউবা মহিলা স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার পক্ষে ছিলেন আবার অন্যরা ছিলেন এর বিপক্ষে। তা সত্ত্বেও তারা সবাই এক ইমামের পিছনে সালাত পড়তেন এবং মাযহাবী মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে তাদের কেউ ইমামের সাথে সালাত পড়া থেকে বিরত থাকেন নি।

পক্ষান্তরে, মুক্বাল্লিদগণের (অন্ধ অনুসারীদের) মতবিরোধ হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যার পরিণতি এই দাঁড়িয়েছে যে, মুসলিমগণ দুই সাক্ষ্যবাণী তথা আল্লাহ ও রাসূলের সাক্ষ্য প্রদানের পর পরই সর্বপ্রধান ভিত্তি সালাতের ব্যাপারে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তারা সবাই একত্রে এক ইমামের পিছনে সালাত পড়তে অস্বীকৃতি জানায় এই বলে যে, ভিন্ন মাযহাবের ইমামের সালাত বাত্বিল, আর না হয় অন্ততপক্ষে মাকরূহ। আমরা একথা শুনেছি এবং দেখেছি যেমন অন্যরাও দেখেছে। কেনইবা তা হবে না যেখানে আজকের দিনে প্রসিদ্ধ কিছু মাযহাবের কিতাবে স্পষ্টাক্ষরে সালাত মাকরূহ বা বাত্বিল হওয়ার কথা বিদ্যমান রয়েছে? যার পরিণতি হিসেবে আপনি কোন কোন দেশে একই জামে মাসজিদে চারটা মেহরাব দেখতে পাবেন যাতে পর পর চারজন ইমাম সালাত পড়ান। লোকজনকে দেখতে পাবেন তাদের ইমামের জন্য অপেক্ষা করছে অথচ অপর আরেকজন ইমাম দাঁড়িয়ে সালাত পড়ছেন।

বরং মুকাল্লিদদের কারও কারও নিকট মতানৈক্য এ পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, তারা হানাফী বর এবং শাফেঈ কন্যার মধ্যে বিয়ে নিষেধ করেছে। পরবর্তীতে হানাফীদের নিকট প্রসিদ্ধ এক লোক যাকে (مفتي الثقلين) জ্বিন ইনসান উভয় জাতির মুফতী উপাধিতে ভূষিত করা হয় তিনি হানাফী পুরুষের সাথে শাফেঈ কন্যার বিবাহ বৈধ বলে ঘোষণা দেন এ কারণ দর্শিয়ে যে, সেই মহিলাকে আহলুল কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টানদের) পর্যায়ভুক্ত ধরে নেয়া হবে। যার অর্থ এই যে, এর বিপরীত বৈধ নয় অর্থাৎ শাফেঈ বরের সাথে হানাফী কন্যার বিয়ে বৈধ নয়। যেমন কিতাবী (ইহুদী-খৃষ্টান) বরের সাথে মুসলিম কন্যার বিবাহ বৈধ নয়।

অনেক দৃষ্টান্ত থেকে এ দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো যা জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ঐ অশুভ পরিণতির কথা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরছে যা পরবর্তীদের মতবিরোধ এবং এর উপর জড়বদ্ধ থাকার ফলশ্রুতিতে ঘটেছে। এটা পূর্বসূরীদের মতভেদের চেয়ে ভিন্ন। কেননা তাদের মতপার্থক্যের কোন অশুভ পরিণতি জাতির উপর পতিত হয় নি। এজন্যই তারা দীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা বহনকারী আয়াতগুলোর আওতার বাইরে। কিন্তু পরবর্তীদের কথা এর চেয়ে ভিন্ন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর সঠিক পথের সন্ধান দিন।

www.waytojannah.com

١

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

কিতাবুত ত্বহারাত

(পবিত্রতা অধ্যায়)

تَعْرِيْفُ الطَّهَارَةِ وَأَهَمِيَتِهَا

ত্বহারাতের পরিচয় ও গুরুত্ব

طهارة এর আভিধানিক অর্থ:

পবিত্রতা বা পরিচ্ছন্নতা, বাহ্যিক তথা অনুভূতিসূচক নাপাকী বা ময়লা আবর্জনা থেকে মুক্তি লাভ করা। যেমন- পেশাব ইত্যাদির নাপাকী এবং অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা। যেমন- দোষ ত্রুটি ও পাপ পঙ্কিলতা থেকে পবিত্রতা অর্জন।

এর আরেকটি অর্থ হলো পরিচ্ছন্ন করণ। আর এটা স্থান পরিচ্ছন্ন করাকে বলা হয়।[৫২]

ত্বহারাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা:

যে অপবিত্রতা বা নাপাকী সালাত আদায় করতে বাধা প্রদান করে তা পানি বা অন্য কিছু দ্বারা দূর করা বা হুকুমগতভাবে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে ত্বহারাত বলে।[৫৩]

ত্বহারাতের হুকুম:

স্মরণ থাকলে ও ক্ষমতা থাকলে নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করা এবং নাপাকী দূর করা ওয়াজিব।

আল্লাহ বলেন: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾আপনার পোশাক পবিত্র করুন! (*সূরা মুদ্দাসসির-৪*)

আল্লাহ অপর আয়াতে বলেন:

﴿ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾

তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর। (*সূরা বাক্বারাহ- ১২৫*)

আর সালাত বৈধ হওয়ার জন্য অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যক।

রাসূল (ﷺ) বলেন: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»: -পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল হয় না।[৫৪]

পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব

১। বান্দার সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো পবিত্রতা অর্জন করা।

মহানাবী (ﷺ) বলেন:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তির বায়ু নির্গত হয় তার সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে ওযূ করে।[৫৫]

---

[৫২] আল-লুবাব শারহুল কিতাব (১/১০) দুররুল মুখতার (১/৭৯)

[৫৩] ইবনে কুদামাহ প্রণীত মুগনী (১/১২)

[৫৪] সহীহ; মুসলিম (২২৪)

[৫৫] বুখারী (১৩৫), মুসলিম (২২৫)

Contents

ত্বহারাতের মাধ্যমে সালাত আদায় করলে আল্লাহকে সম্মান করা হয়। হাদাস (বায়ু ত্যাগ) এবং জানাবাত (যে সব কারণে গোসল ফরয) এ দু'টি যদিও দৃশ্যমান নাপাকী নয় বরং অভ্যন্তরীণ নাপাকী তবুও এগুলো নাপাক মুক্ত করা ওয়াজিব। এর উপস্থিতিতেও আল্লাহর মর্যাদা হানি হয় এবং পরিচ্ছন্নতার মূলনীতি বিরোধী হয়।

২। মহান আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের প্রশংসা করেন। যেমন- তিনি বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে। (*সূরা বাক্বারাহ*- ২২২)

মহান আল্লাহ তা'আলা মাসজিদে কুবার অধিবাসীদের পবিত্রতা অর্জনের প্রশংসা করে বলেন:

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾

সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন (*তাওবা*- ১০৮)।

৩। নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে অবহেলা করা কবরে শাস্তি হওয়ার অন্যতম কারণ।

«عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: " إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ»

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) একদা দু'টি কবরের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, অতঃপর বললেন, এ দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে এদেরকে বড় কোন গুনাহের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। বরং এদের একজন পেশাবের নাপাকী থেকে বেঁচে থাকত না।[৫৬]

ত্বহারাতের প্রকারভেদ

আলিমগণ শারঈ ত্বহারাতকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

১। طهارة حقيقية বা প্রকৃত পবিত্রতা:

এ প্রকার ত্বহারাত হলো: ময়লা বা নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জন করা। আর এ ত্বহারাত শরীর, কাপড় ও স্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২। طهارة حكمية বিধানগত পবিত্রতা:

এ প্রকার ত্বহারাত হলো: অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন। আর এটা শরীরের সাথে নির্দিষ্ট। এ প্রকার ত্বহারাত তিন ধরণের হয়ে থাকে। যথা:

(ক) বড় ধরণের পবিত্রতা। তা হলো, গোসল করা।

(খ) ছোট ধরণের পবিত্রতা অর্জন। তা হলো, ওযূ করা।

(গ) অপারগতা বশতঃ গোসল ও ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা।

---

[৫৬] আবূ দাউদ (২০), নাসাঈ (৩১-২০৬৯), ইবনে মাজাহ (৩৪৭) সনদ সহীহ।

www.waytojannah.com

طهارة حقيقية বা প্রকৃত পবিত্রতার বিবরণ

নাজাসাত দ্বারা উদ্দেশ্য:

নাজাসাত হলো ত্বহারাত এর বিপরীত শব্দ। পরিভাষায়, শরীয়াত নির্ধারিত নাপাকীর নাম নাজাসাত। মুসলমানদের জন্য এরূপ নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জন করা এবং তা শরীর বা কাপড়ে লেগে গেলে ধৌত করা ওয়াজিব।

নাপাকীর (নাজাসাত) প্রকারভেদ

শরীয়াত যে সব বস্তুকে নাপাক বলে প্রমাণ করেছে তা হলো :

(১) মানুষের পায়খানা ও (২) মানুষের পেশাব :

আলিমদের ঐকমত্যে, এ দু'টি নাজাসাত বা নাপাকীর অন্তর্ভুক্ত। পায়খানা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে মহানাবীর উক্তি হলো: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ » যদি তোমাদের কারও জুতার তলায় নাপাক বস্তু (মল-মূত্র) লাগে, তাহলে মাটি তা পবিত্র করার জন্য যথেষ্ট হবে।[৫৭] এ হাদীস পায়খানা অপবিত্র হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এরূপ অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলো দ্বারা পায়খানা থেকে ইসতিনজা করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ হাদীসগুলো সামনে আলোচনা করা হবে। আর পেশাব অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে :

أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُوهُ» قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّهُ عَلَيْهِ

একজন বেদুঈন এসে মাসজিদের মধ্যে পেশাব করতে শুরু করল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে বাধা দিতে দাঁড়ালে, রাসূল (ﷺ) বললেন, থাম তাকে পেশাব করতে বাধা দিওনা! আনাস (رضي الله عنه) বলেন সে কটির পেশাব করা শেষ হলে, রাসূল (ﷺ) এক বালতি পানি আনিয়ে তার পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।[৫৮]

(৩) মযি:

মযি হলো সাদা আঠালো পানি যা আদর, সোহাগ বা সহবাসের চিন্তা ও ইচ্ছা করার সময় নির্গত হয়। এটা সজোরে প্রবাহিত হয় না। এর ফলে দুর্বলতা অনুভব হয় না। তা নির্গত হওয়ার কথা মানুষ খুব কমই টের পায়। নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌনাঙ্গ থেকে এটা নির্গত হয়ে থাকে। তবে নারীর যৌনাঙ্গ থেকেই এটা অধিকতর নির্গত হয়।[৫৯] এটা সর্বসম্মতভাবে নাপাক।[৬০] এজন্যই মহানাবী (ﷺ) এটা নির্গত হওয়ার কারণে লজ্জাস্থান ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনঃ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে,

---

[৫৭] আবূ দাউদ (৩৮৫) সনদ সহীহ।

[৫৮] বুখারী (৬০২৫), মুসলিম (২৮৪)

[৫৯] ফাতহুল বারী (১/৩৭৯), ইমাম নাববী প্রণীত শারহে মুসলিম (১/৫৯৯)

[৬০] ইমাম নাববী প্রণীত মাজমূ (২/৬), ইবনে কুদামাহ প্রণীত মুগনী (১/১৬৮)

একদা এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) কে মযি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» তথা, সে তার লজ্জা স্থান ধৌত করবে এবং ওযূ করবে।[৬১]

(৪) ওদি:

ওদি এক ধরণের সাদা ঘন পানি, যা পেশাবের পর নির্গত হয়। এটি সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক।

عن بن عباس قال : المني والودي والمذي أما المني فهو الذي منه الغسل وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মনি, ওদি ও মযির হুকুম হলো, মনি (বীর্য) নির্গত হলে গোসল করতে হবে। আর ওদি ও মযির ব্যাপারে তিনি বলেন, তা নির্গত হলে তোমার লজ্জাস্থান ধৌত কর এবং সালাতের জন্য ওযূ কর।[৬২]

(৫) হায়যের রক্ত:

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ[63] بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

আসমা বিনতে আবূ বকর বলেন, একদিন একজন স্ত্রী লোক নাবী (ﷺ) এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমাদের কারও কাপড়ে যদি হায়যের রক্ত লেগে যায় তখন সে কি করবে? তিনি বললেন: রক্তের জায়গাটি ভালোভাবে রগড়াবে, তারপর পানি দিয়ে কচলিয়ে উত্তমরূপে ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর ঐ কাপড় পরে সালাত পড়তে পারবে।[৬৪]

(৬) যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া না জায়েয সেগুলোর গোবর:

عن عبد الله بن مسعود قال : أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتبرز فقال : إئتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال : هي رجس

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মহানাবী (ﷺ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার ইচ্ছা করলেন, অতঃপর বললেন: আমাকে তিনটি পাথর এনে দাও। আমি দু'টি পাথর ও একখণ্ড গাধার শুকনো গোবর পেলাম। তিনি পাথর দু'টি নিলেন এবং গোবর খণ্ড ফেলে দিয়ে বললেন, এটা অপবিত্র।[৬৫]

হাদীসে বর্ণিত رجس শব্দের অর্থ নাপাক। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া না জায়েয সেগুলোর গোবর নাপাক।

---

[৬১] বুখারী (২৬৯), মুসলিম (৩০৩)

[৬২] সুনানে বাইহাক্বী ১/১১৫, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ সুনানে আবূ দাউদ হা/ ১৯০।

[৬৩] হাদীসে বর্ণিত تقرصه শব্দের অর্থ আঙ্গুলের কিনারা দ্বারা ঘর্ষণ করা, যাতে নাপাকী দূর হয়ে যায়।

[৬৪] বুখারী হা/২২৭ মুসলিম হা/২৯১

[৬৫] বুখারী হা/১৫৬; তিরমিযী হা/১৭; নাসাঈ হা/৪২, ইবনে খুযায়মা।

www.waytojannah.com

(৭) কুকুরের লালা বা উচ্ছিষ্ট:

মহানাবী (ﷺ) বলেন: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ »- কুকুর যদি তোমাদের পাত্রে লেহন করে (খায় বা পান করে) তবে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তা সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে, প্রথম বার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করতে হবে।[৬৬] এ হাদীস কুকুরের লালা বা উচ্ছিষ্ট নাপাক হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

(৮) শুকুরের গোশত:

এটি আলিমগণের ঐকমত্যে নাপাক। কেননা এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ কুরআনে প্রকাশ্য নির্দেশ দিয়েছেন:

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾

বল, 'আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর উপর কোন হারাম পাই না, যা সে আহার করে। তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের গোশত হয়– কারণ, নিশ্চয় তা অপবিত্র। (*সূরা আল আনআম-১৪৫*)

(৯) মৃত প্রাণী:

মৃত প্রাণী হলো: স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে এমন প্রাণী। অর্থাৎ শরীয়াত সম্মতভাবে যা যবেহকৃত নয়। এটি সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। কেননা মহানাবী (ﷺ) বলেন: إذا دبغ الإهاب فقد طهر তথা, কাঁচা চামড়াকে পাকা করা হলে তা পবিত্র হয়ে যায়।[৬৭] হাদীসে বর্ণিত الإهاب। অর্থ : মৃত প্রাণীর চামড়া।

নিম্নোক্ত প্রাণীগুলো মৃত হওয়া সত্ত্বেও নাপাক নয়

(ক) মাছ ও পঙ্গপালের মৃত দেহ:

এগুলো পাক। কেননা মহানাবী (ﷺ) বলেন:

«أحلت لنا ميتتان ودمان : الميتتان : الحوت والجراد والدمان : الكبد والطحال »

"দুই প্রকারের মৃত ও দুই প্রকারের রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। সেই মৃত দু'টি হলো- মাছ ও পঙ্গপাল বা টিড্ডি। আর দু'প্রকারের রক্ত হলো, যকৃত ও প্লীহা"।[৬৮]

(খ) এমন প্রাণীর মৃত দেহ যে সব প্রাণীর রক্ত প্রবহমান নয় । যেমন: মাছি, মৌমাছি, পিঁপড়ে ও ছারপোকা ইত্যাদি।

---

[৬৬] মুসলিম হা/ ২৭৯

[৬৭] মুসলিম হা/৩৬৬

[৬৮] ইবনে মাজাহ হা/৩২১৮,৩৩১৪; আহমাদ ১/৪৬ পৃঃ সনদ সহীহ।

www.waytojannah.com

Contents

মহানাবী (ﷺ) বলেন:

«إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآخَرِ دَاءً»

যখন তোমাদের কারও কোন খাবার পাত্রে মাছি পড়ে, তখন তাকে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিবে, **তারপর** ফেলে দিবে । কারণ,তার এক ডানায় থাকে রোগ মুক্তি , আর অন্য ডানায় থাকে রোগ জীবানু ।[৬৯]

(গ) মৃত প্রাণীর হাড়, শিং, নখ, চুল, পালক এই জাতীয় সব কিছুই মূলতঃ পাক। ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তার সহীহ গ্রন্থে (১/৩৪২) মু'আল্লাক সূত্রে বর্ণনা করেন, যুহরী হাতী বা এরূপ প্রাণীর হাড্ডির ব্যাপারে বলেছেন: প্রাচীন আলিমদের অনেককে দেখেছি এর চিরুনী দ্বারা তারা চুল আঁচড়াতেন ও এর তেল ব্যবহার করতেন। তারা এতে কোন আপত্তিকর কিছু দেখেন নি। হাম্মাদ বলেন: মৃত প্রাণীর পালক নাপাক নয়।

(১০) জীবিত প্রাণীর দেহ থেকে কর্তিত অংশ নাপাক:

জীবিত প্রাণীর দেহ থেকে কর্তিত অংশের বিধান মৃত প্রাণীর ন্যায়। কেননা রাসূল (ﷺ) বলেন:

«مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ»

জীবিত পশুর দেহ থেকে যে গোশত কেটে নেয়া হয় , তা মৃত পশুর ন্যায় ।[৭০]

(১১) এমন হিংস্র প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুর উচ্ছিষ্ট যাদের গোশত খাওয়া জায়েয নয়:

سؤر এর পরিচয়:

পান করার পর পাত্রে যে অবশিষ্ট অংশ থাকে তাকে سؤر (উচ্ছিষ্ট) বলে। মহানাবী (ﷺ) এর বাণীর মাধ্যমে এটি নাপাক হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এমন পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যা বিরান ভূমিতে থাকে এবং যেখানে চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণী তা পান করার জন্য পুনঃপুন আগমন করে এবং তা যথেচ্ছা ব্যবহার করে। সে পানির হুকুম কি? তিনি বলেন:

« إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»

যখন উক্ত পানি দুই কুল্লা (মট্কা) পরিমাণ হবে, তখন তা অপবিত্র হবে না ।[৭১]

আর বিড়াল বা তদনিম্ন প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পবিত্র। রাসূল (ﷺ) বলেন: বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়। কেননা এগুলো তোমাদের আশে-পাশেই ঘোরা-ফিরা করে।[৭২]

---

[৬৯] বুখারী (৫৭৮২),

[৭০] তিরমিযী (১৪৮০), আবূ দাউদ (২৮৫৮), ইবনে মাজাহ (৩২১৬)।

[৭১] সহীহ; আবুদাউদ (৬৩), নাসাঈ (১/৪৬), তিরমিযী (৬৭); এটা সহীহ, যেমনটি সহীহুল জামেতে বর্ণিত (৭৫৮)।

[৭২] সহীহ; আহমাদ (৫/৩০৩) এবং আসহাবে সুনান, ইরওয়া (১৭৩)।

www.waytojannah.com

(১২) যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম তার গোশতঃ

এ ব্যাপারে আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

«عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ، فَطَبَخْنَا مِنْهَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ»

আনাস (رضي الله عنه) বলেন, খায়বার যুদ্ধে আমরা (গনীমত হিসেবে) গাধার গোশত লাভ করেছিলাম (আর তা পাকানো হচ্ছিল)। এমন সময়ে নাবী (ﷺ) এর পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) তোমাদিগকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা তা নাপাক।[৭৩]

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ، أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا هَذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟» قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ، قَالَ: «عَلَى أَيِّ لَحْمٍ؟» قَالُوا: عَلَى لَحْمِ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا» ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: «أَوْ ذَاكَ»

সালামাহ ইবনুল আকওয়া (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, একবার আমরা রাসূল (ﷺ) এর সাথে খায়বার অভিমুখে রওনা হলাম। আল্লাহ তা'আলা খায়বার বাসীদের উপর মুসলমানদের বিজয় দান করলেন। যে দিন মুসলমানরা জয় করলেন সে দিন তারা অনেকগুলো চুলায় আগুন ধরালেন। এত চুলায় আগুন জ্বলতে দেখে রাসূল (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কিসের আগুন এবং তা কেন জ্বালানো হয়েছে? লোকেরা বলল, গোস্ত রাঁধা হচ্ছে। তিনি জানতে চাইলেন, কিসের গোস্ত? তারা বললেন গৃহ পালিত গাধার গোস্ত। তাদের কথা শুনে রাসূল (ﷺ) বললেন, সম্পূর্ণ ফেলে দাও এবং হাঁড়ি-পাতিলগুলো ভেঙ্গে ফেল। এ সময় এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! গোস্ত ঢেলে ফেলে হাঁড়িগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে আমরা কি তা ব্যবহার করতে পারব না? তিনি বললেন, হাঁ! অবশ্য তা করতে পার।[৭৪]

সুতরাং, উল্লেখিত হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, গৃহ পালিত গাধার গোস্ত নাপাক। কেননা ১ম হাদীসে বলা হয়েছে, 'فَإِنَّهَا رِجْسٌ' অর্থাৎ, তা নাপাক। আর ২য় হাদীসে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) প্রথমে পাতিল ভেঙ্গে ফেলার কথা বলেছেন। অতঃপর ২য় বারে তা ধুয়ে পবিত্র করার বৈধতা দিয়েছেন।

---

[৭৩] মুসলিম হা/১৯৪০, আহমাদ ৩/১২১, হাদীসটি বুখারীতে 'فَإِنَّهَا رِجْسٌ' শব্দ ছাড়া বর্ণিত হয়েছে।

[৭৪] মুসলিম হা/১৮০২

Contents

মনি পবিত্র, না অপবিত্র?

মনি পবিত্র, না অপবিত্র এ নিয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১ম অভিমত:

মনি নাপাক। এটা ইমাম আবূ হানীফা, মালিক এবং আহমাদ (রাহিমাহুমুল্লাহ) এর দুইটি অভিমতের একটি অভিমত। এ ব্যাপারে তাদের দলীল হলো, আয়িশা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস। তাঁকে কাপড়ে মনি লাগা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন:

كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ، وَأَثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ المَاءِ

আমি এটা রাসূল (ﷺ) এর কাপড় থেকে ধৌত করতাম। অতঃপর তিনি সালাতে বের হতেন, এমতাবস্থায় তার কাপড়ে ধৌত করার চিহ্ন লেগে থাকত।[৭৫] আর কাপড় নাপাক না হলে তো ধৌত করার প্রশ্নই আসে না।

২য় অভিমত:

২য় অভিমত হলো মনি পবিত্র। এটা ইমাম শাফেঈ, দাউদ ও আহমাদ এর ২টি অভিমতের মধ্যে একটি সহীহ অভিমত। এ ব্যাপারে তারা আয়িশা (রা.) এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ "

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মনির ব্যাপারে বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাপড় থেকে বীর্য রগ্‌ড়িয়ে ফেলতাম।[৭৬]

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীস থেকেও তারা দলীল পেশ করে থাকেন:

أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِى أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ – فَرْكًا فَيُصَلِّى فِيهِ.

একদিন জনৈক ব্যক্তি আয়িশা (রা.) এর গৃহে মেহমান হলো। আয়িশা দেখলেন, ভোরে সে তার কাপড় ধুচ্ছে। (অর্থাৎ রাতে তার স্বপ্নদোষ হয়েছিল)। তা দেখে আয়িশা বললেন: মূলতঃ তোমার পক্ষে এতটুকুই যথেষ্ট হতো যে, তুমি নাপাক বস্তুটি দেখে থাকলে কেবলমাত্র সে স্থানটি ধুয়ে নিতে। আর যদি তা দেখে না থাক, তাহলে (সন্দেহ দূর করার নিমিত্তে) স্থানটিতে পানি ছিটিয়ে হালকাভাবে ধুয়ে নিতে পারতে। কেননা এমনও হয়েছে আমি নিজে রাসূল (ﷺ) এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য রগ্‌ড়িয়ে ফেলেছি, আর তিনি সে কাপড় পরে সালাত আদায় করেছেন।[৭৭] ঘর্ষণ বা রগ্‌ড়ানোর মাধ্যমে যথেষ্ট মনে করাটাই পবিত্রতা প্রমাণ করে।

যারা এটাকে নাপাক বলেন, এ ব্যাপারে তাদের জবাব হলো: ঘর্ষণ করাটা পবিত্রতা প্রমাণ করে না, বরং তা পবিত্র করার একটি মাধ্যম মাত্র। যেমনটি জুতা পবিত্র করার মাধ্যম হলো তা মাটিতে ঘর্ষণ করা।

---

[৭৫] বুখারী হা/ ২৩০; মুসলিম হা/ ২৮৯
[৭৬] মুসলিম হা/ ২৮৮
[৭৭] মুসলিম হা/ ২৮৮

www.waytojannah.com

এর প্রতিউত্তরে বলা যায়[৭৮] যে, আয়িশা (রা.) কখনও মনিকে ঘর্ষণ করেছেন আবার কখনও তা ধৌত করেছেন। সুতরাং তা (মনি) নাপাক হওয়ার দাবী রাখে না। যেমন কাপড়ে নাকের ময়লা, থুথু কিংবা আবজর্না লাগলে তা ধুয়ে ফেলা হয়। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (ﷺ), ইবনে আব্বাস (ﷺ) ও আরও অনেকেই এরূপ কথাই বলেছেন যে, "এটা (মনি) নাকের ময়লা এবং থুথুর সমতুল্য। ঘাস দিয়ে হলেও তা মুছে ফেল"।

সুতরাং, একথা স্পষ্ট হলো যে, আয়িশা (রা.) এর কাজটি পরিচ্ছন্নতার এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৭৯] মনি পবিত্র হওয়ার সমর্থনে আরও একটি দৃষ্টান্ত হলো, মহানাবী (ﷺ) এর যুগে অনেক সাহাবার স্বপ্নদোষ হতো। ফলে তাদের কারও শরীরে বা কাপড়ে মনি (বীর্য) লেগে যেত। এটা কারও অসুস্থতার কারণে ব্যাপকভাবে নির্গত হতো। যদি তা নাপাক হতো, তাহলে রাসুল (ﷺ) এর উপর সাহাবাদের জন্য তা দূর করার আদেশ দেয়া ওয়াজিব হতো, যেমনটি তিনি ইসতিনজার ক্ষেত্রে আদেশ দিয়েছেন। অথচ কেউ এটা বর্ণনা করেন নি। সুতরাং নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, তা দূর করা ওয়াজিব ছিল না। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।[৮০]

মদ কি নাপাক?

আলিমগণ এ ব্যাপারে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন।

১ম অভিমত:

মদ নাপাক। এটা জমহুর ওলামার অভিমত। চার ইমামও এমতামত ব্যক্ত করেছেন। শাইখুল ইসলাম এ মতটিকে পছন্দ করেছেন। তাদের দলীল হলো আল্লাহর বাণী-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে মু'মিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (*সূরা আল-মায়েদা-৯০*)

তারা বলেন: এখানে رِجْسٌ শব্দের অর্থ نجس বা নাপাকী। তারা স্বয়ং মদকেই অনুভূতি সূচক নাপাক বলে আখ্যা দিয়েছেন।

২য় অভিমত:

২য় অভিমতে মদ পবিত্র। এটা বলেছেন রাবিয়াহ লাইস, মাযানি এবং অন্যান্য সালাফগণ। ইমাম শাওকানী, সনআনী, আহমাদ শাকির ও আলবানী (রাহিমাহুমুল্লাহ) এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এটাই বিশুদ্ধ মতামত।

---

[৭৮] মাজমুউল ফাৎওয়া (২১/৬০৫)

[৭৯] শারহে মুসলিম

[৮০] মাজমুউল ফাৎওয়া (২১/৬০৪)

Contents

এর কারণ নিম্নরূপ:

(১) আলোচ্য আয়াতে মদ নাপাক হওয়ার কোন দলীল নেই। কারণ-

(ক) এখানে رِجْسٌ শব্দটি مشترك (বহুঅর্থবোধক) শব্দ। তা অনেক অর্থের সম্ভাবনা রাখে।[৮১] যেমন: القذر (পংকিলতা) المحرم (হারামকৃত) القبيح (মন্দ) العذاب (শাস্তি) اللعنة (অভিশাপ) الكفر (কুকুরী) الشر (ক্ষতি) الإثم (পাপ) এবং النجس (নাপাক) ইত্যাদি।

(খ) আমরা সালাফদের কাউকেও দেখি নি যে, তারা অত্র আয়াতে رجس এর ব্যাখ্যা نجس (নাপাকী) দ্বারা করেছেন। বরং ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) বলেন رجس অর্থ سخط বা অসন্তোষ। ইবনে যায়েদ বলেন رجس অর্থ شر ক্ষতি।

(গ) رجس শব্দটি আল্লাহর কিতাবে অত্র আয়াত ব্যতীত আরও তিন জায়গায় উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু সেগুলোর কোথাও رجس অর্থ نجس (নাপাকী) করা হয় নি। যেমনঃ (১) رجس শব্দটি আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতে উল্লেখ হয়েছে: ﴿ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ এমনিভাবে আল্লাহ অকল্যাণ বা শাস্তি দেন তাদের উপর, যারা ঈমান আনে না (*সূরা আল-আনআম-১২৫*)। এখানে رجس অর্থ العذاب (শাস্তি)। (২) অন্যত্র মহান আল্লাহ মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেন:﴿ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ নিশ্চয়ই তাদের আমল মন্দ এবং জাহান্নাম হলো তাদের আশ্রয়স্থল (*সূরা তাওবা ৯৫*)। এখানে উদ্দেশ্য হলো: তাদের আমল নিকৃষ্ট বা মন্দ। অত্র আয়াতে رجس অর্থ قبيح (মন্দ)। (৩) আল্লাহর বাণী: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ﴾ সুতরাং মূর্তিপূজার শাস্তি হতে বিরত থাক (*সূরা হাজ্জ-৩০*), অত্র আয়াতে أوثَانِ (মূর্তীসমূহ) কে رجس নামে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা তা শাস্তির কারণ। এর দ্বারা نجاسة حسية বা অনুভূতি সূচক নাপাক উদ্দেশ্য নয়। কেননা স্বয়ং পাথর ও মূর্তীসমূহ নাপাক নয়।

আল্লাহর বাণী:

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾

আপনি বলে দিন: যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে; কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের গোশত ব্যতীত, নিশ্চয় তা অপবিত্র । *(সূরা আল-আনআম :১৪৫)* অত্র আয়াতে رجس অর্থ নাপাক হওয়াটা সম্ভাবনাময়।

(ঘ) আয়াতে خمر (মদ) শব্দটি أزلام ও أنصاب এর সাথে উল্লেখ হওয়ায় رجس এর অর্থ শারঈ নাপাক না হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে। এরূপভাবে আল্লাহর বাণী-﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ মুশরিকগণ নাপাক

[৮১] ইবনে আসীর প্রণীত নিহায়্যাহ, লিসানুল আরাব, মুখতারুস সিহাহ ও তাফসীর সমূহ।

www.waytojannah.com

(*সূরা তাওবা-২৮*)। অত্র আয়াতে মুশকিদের نجس বা নাপাক বলা হলেও এমন সহীহ দলীল রয়েছে যা মুশরিকদের সত্ত্বাকে নাপাক না হওয়া প্রমাণ করে।

(ঙ) মদ হারাম হওয়ার কারণে তা নিজে নাপাক হওয়াকে আবশ্যক করে না। তবে নাপাক জিনিস মাত্রই অনিবার্যভাবে হারাম। পুরুষের জন্য রেশম ও স্বর্ণ হারাম। অথচ এদুটোই শারঈভাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র।

(চ) অত্র আয়াতে الرجس শব্দটি শয়তানের আমলের সাথে নির্দিষ্ট। অতএব তা আমল গত ভাবে رجس । সুতরাং এর অর্থ হতে পারে- قبيح (মন্দ), محرم (নিষিদ্ধ) অথবা إثم (পাপ)। এর দ্বারা প্রকৃত رجس বা নাপাক উদ্দেশ্য নয়, যার ফলে এর কারণে এই বস্তুগুলো নাপাক হবে।

(২) মদ পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে দলীলঃ

মদ হারাম হওয়ার ঘটনায় আনাস (رضي الله عنه) এর হাদীসে বলা হয়েছে-

فأمر رسول الله ﷺ مُنَادِيا يُنَادِي : أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، ... قَالَ: فخرجت فأهرقتها فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ

অতঃপর রাসূল (ﷺ) একজন ঘোষণাকারীকে ঘোষণা দিতে বললেন, "শুনে নাও! এখন থেকে মদ হারাম করা হয়েছে।"আনাস বলেন, অতএব আমি গিয়ে সমস্ত মদ ফেলে দিলাম। সে দিন মদিনার অলিতে-গলিতে মদের স্রোত বয়ে গেছিল।[৮২]

(৩) ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস, যার কাছে দু'মশক মদ ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন:

«إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، فَفَتَحَ الرجل الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا»

যিনি এটা পান করা হারাম করেছেন তিনিই এটা বিক্রি করাও হারাম করেছেন। অতঃপর ব্যক্তিটি মশক দু'টি খুলে সম্পূর্ণ মদ ঢেলে ফেললেন।[৮৩]

যদি মদ নাপাক হতো তাহলে অবশ্যই মহানাবী (ﷺ) জমিনে পানি ঢেলে তা পবিত্র করার আদেশ দিতেন, যেমনটি তিনি জনৈক বেদুঈন লোকের পেশাব করার কারণে তাতে পানি ঢেলে দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন এবং তা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন । আর যদি তা নাপাক হতো তাহলে মশক ওয়ালা ব্যক্তিকে তার মদ ঢেলে ফেলার পর মশক দু'টি ধুয়ে ফেলতে বলতেন।

(৪) মূলতঃ মদ পবিত্র। পবিত্র ছাড়া ভিন্ন কিছু গ্রহণ করা যাবে না, যতক্ষণ না সহীহ দলীল পাওয়া যাবে। যেহেতু এটা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে দলীল পাওয়া যায় না, সুতরাং মদ মূলতঃ পবিত্র হওয়ার উপর বহাল থাকবে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

---

[৮২] বুখারী হা/ ২৩৩২; মুসলিম হা/ ১৯৮০

[৮৩] মুসলিম হা/ ১২০৬; মুওয়াত্ত্বা মালিক হা/ ১৫৪৩

রক্ত কি নাপাকীর অন্তর্ভুক্ত?

রক্ত কয়েক প্রকার যথা:

১। **হায়যের রক্ত:** এটা সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। এটা নাপাক হওয়ার দলীল পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

২। **মানুষের রক্ত:**[৮৪] এটা পাক বা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ফিক্বহী মাযহাবের অনুসারীদের নিকট একথাই প্রসিদ্ধ যে, রক্ত অপবিত্র। এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন দলীল নেই। তবে কুরআনের আয়াত দ্বারা এটা (রক্ত) হারাম করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী:

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾

আপনি বলে দিন: যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে; কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের গোশত ব্যতীত, নিশ্চয় তা অপবিত্র । *(সূরা আল-আনআম :১৪৫)*

রক্ত হারাম হওয়ার কারণে তা নাপাক হওয়াকেও আবশ্যক করে বলে তারা মনে করেন, যেমনটি তারা মদের ব্যাপারে মনে করে থাকেন। এর প্রকৃত ব্যাপারটি গোপন নয়। কিন্তু একাধিক বিদ্বানের বর্ণনা মতে, এটা (রক্ত) নাপাক হওয়ার উপর ইজমা হয়েছে। এ ব্যাপারে সামনে আলোচনা হবে।

অপরদিকে পরবর্তী মুজতাহিদগণ, তথা ইমাম শাওকানী, সিদ্দীক খান, আলবানী ও ইবনে উসাইমীন বলেন: (মানুষের) রক্ত পবিত্র। কেননা এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন ইজমা সাব্যস্ত হয় নি। তারা নিম্নোক্তভাবে দলীল দিয়ে থাকেন।

(১) প্রত্যেক বস্তুই মূলতঃ পবিত্র; যতক্ষণ না তা নাপাক হওয়ার দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানাবী (ﷺ) হায়যের রক্ত ব্যতীত মানুষের শরীরের বিভিন্ন ক্ষত-বিক্ষত স্থান থেকে অধিক রক্ত ঝরার পরও তা ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। যদি রক্ত নাপাক হতো, তাহলে মহানাবী (ﷺ) তার প্রয়োজনীয় বিধানের কথা অবশ্যই বর্ণনা করতেন।

(২) মুসলমানেরা তাদের ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় সালাত আদায় করতেন। অথচ তাদের শরীর থেকে এত রক্ত ঝরত যে তা সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আর তা ধৌত করার নির্দেশ মহানাবী (ﷺ) এর পক্ষ থেকে কেউ বর্ণনা করেন নি এবং এটাও বর্ণিত হয় নি যে, তারা এ থেকে ব্যাপকভাবে সতর্ক থাকতেন। হাসান বলেন: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ অর্থাৎ:"মুসলমানেরা সর্বদাই তাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত বা যখম থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করতেন"।[৮৫]

---

[৮৪] তাফসীরে কুরতুবী (২/২২১), মাজমূ (২/৫১১), মুহাল্লা (১/১০২), কাফী (১/১১০), বিদায়াতুল মুজতাহীদ, সায়লুল জার্‌রার (১/৩১), শারহুল মুমতি (১/৩৭৬), সিলসিলাতুস সহীহাহ ও তামামুল মিন্নাহ পৃ: ৫০।

[৮৫] সনদ সহীহ, ইমাম বুখারী মুয়াল্লাক্ব সূত্রে বর্ণনা করেছেন ১/৩৩৬, ইবনে আবি শাইবা সহীহ সনদে মাওসূল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি ফাতহুল বারীতে বর্ণিত হয়েছে (১/৩৩৭)।

www.waytojannah.com

আনসার সাহাবীর ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস। যিনি রাতে সালাত আদায় করেছিলেন। এমতাবস্থায় এক মুশরিক তাকে একটি তীর নিক্ষেপ করল। ফলে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হলেন, অতঃপর তিনি তা খুলে ফেললেন। এমনকি মুশরিক ব্যক্তি তাকে তিনটি তীর নিক্ষেপ করল। তারপর এ ভাবেই তিনি রুকু সাজদা করে, সমস্ত সালাত শেষ করলেন। আর তার শরীর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।[৮৬]

আলবানী (রাহি.) বলেন,[৮৭] এ হাদীসটি মারফূ হাদীসের হুকুমে। কেননা রাসূল (ﷺ) এ ব্যাপারে জানতেন না এমন ধারণা করা অনেক দূরের ব্যাপার। যদি অধিক রক্ত নাপাক হতো তাহলে মহানাবী (ﷺ) তা বর্ণনা করতেন। কেননা উসূল শাস্ত্রের নিয়ম হলো, কোন বিষয় প্রয়োজনের সময় ছাড়া পরে বর্ণনা করা বৈধ নয়। যদি ধরে নেয়া হয় যে, মহানাবী (ﷺ) এর কাছে এটা গোপন ছিল, তাহলে বলা হবে যে, আল্লাহর কাছে কিভাবে তা গোপন থাকতে পারে, যার কাছে আসমান জমিনের কোন কিছুই গোপন থাকে না। যদি রক্ত ওযূ ভঙ্গের কারণ হতো বা নাপাক হতো, তাহলে অবশ্যই মহানাবী (ﷺ) এর উপর তা ওহী করা হতো। এটা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে। বিষয়টি অস্পষ্ট নয়।
উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) এর শাহাদাতের ঘটনায় বর্ণিত হাদীস- صَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا অর্থাৎ: অতঃপর উমার (رضي الله عنه) সালাত আদায় করলেন অথচ তাঁর যখম হতে তখন রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।[৮৮]

(৩) সা'দ ইবনে মু'আয (رضي الله عنه) এর মৃত্যুর ঘটনায় বর্ণিত আয়িশা (রা.) এর হাদীস। তিনি বলেন:

لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ (سنن أبي داود)..... فبينما هو ذات ليلة إذ تفجر كلمه فسال الدم من جرحه حتى دخل خباء إلى جنبه فقال الله أهل الخباء يا أهل الخباء ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فنظروا فإذا سعد قد انفجر كلمه والدم له هدير فمات [المعجم الكبير – الطبراني]

অর্থাৎ: যখন সা'দ ইব্ন মু'আয (رضي الله عنه) খন্দকের যুদ্ধে জনৈক ব্যক্তির তীরের আঘাতে আহত হয়েছিলেন, যা তার হাতের শিরায় বিদ্ধ হয়েছিল, তখন রাসুলুলাহ (ﷺ) তার জন্য মাসজিদে (নাববীতে) একটা তাবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি নিকট থেকে বার বার তার দেখাশুনা করতে পারেন।
অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে, হঠাৎ এক রাতে তার যখমটি ফেটে গিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলো, এমনকি তার পার্শ্ববর্তী তাবুতে রক্ত প্রবাহিত হলো, ফলে তাবুর মধ্যে যারা অবস্থান করছিলেন, তারা বললেন, হে তাবুবাসী তোমাদের তাবুতে এগুলো কি আসছে! এরপর তারা দেখল যে, সা'দ (رضي الله عنه) এর যখম ফেটে তিনি রক্তশূন্য হয়ে পড়েছেন। ফলে তিনি মারা যান।[৮৯]

---

[৮৬] সহীহ; ইমাম বুখারী মুয়াল্লাক্ব সূত্রে বর্ণনা করেছেন ১/৩৩৬, অহমাদ মাওসূল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি সহীহ।
[87] তামামুল মিন্নাহ (৫১,৫২)
[৮৮] সহীহ; মালিক (৮২), মালিক থেকে বাইহাকী বর্ণনা করেছেন (১/৩৫৭) ও অন্যান্যরা, এর সনদ সহীহ।
[৮৯] সহীহ; আবুদাউদ মুখতাসারভাবে বর্ণনা করেছেন (৩১০০), তবারানী ফিল কাবীর (৬/৭)।

Contents

আমার বক্তব্য: মহানাবী (ﷺ) তার উপর পানি ঢেলে দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন এমনটি বর্ণিত হয় নি। অথচ তিনি মাসজিদে ছিলেন। যেমনটি তিনি জনৈক বেদুঈন লোকের পেশাব করার বেলায় তার উপর পানি ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(৪) ইবনে রুশদ মাছের রক্তের ব্যাপারে আলিমদের মতভেদের কথা উল্লেখ করে বলেন: তাদের মতভেদের কারণ হল, মৃত মাছের ব্যাপারে। যারা মৃত মাছকে 'মৃত প্রাণী বিশেষ হারাম' এর আওতায় মনে করেন, তারা তার রক্তকেও অনুরূপ হারাম মনে করেন।
আর যারা মৃত মাছকে সার্বজনীন হারামের বহির্ভূত মনে করেন, তারা তার রক্তকেও মাছের উপর অনুমান বা কিয়াস করে হালাল মনে করেন।
উত্তরে আমরা বলব যে, তারা মৃত মানুষকে পবিত্র বলে থাকেন। তাহলে তাদের কায়দা অনুযায়ী মৃত মানুষের রক্তও পবিত্র!

এজন্য শেষভাগে ইবনে রুশদ বলেছেন, নাস বা দলীল শুধু হায়যের রক্তকেই নাপাক বলে প্রমাণ করে। এটা ব্যতীত অন্য রক্ত তার মৌলিকতার উপর বহাল থাকবে। তথা তা পবিত্র। আর এ ব্যাপারটিতে সকল বিতর্ককারী ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং দলীলের উপযোগী নস বা প্রমাণাদী ছাড়া তা পবিত্রতার হুকুম থেকে বহির্ভূত করা যাবে না।

যদি বলা হয় মানুষের রক্তকে হায়যের রক্তের সাথে কিয়াস বা অনুমান করা যায় কি না? আর হায়যের রক্ততো নাপাক।
তাহলে উত্তরে আমরা বলব, এটা قياس مع الفارق (বিচ্ছিন্ন জিনিসের সঙ্গে কিয়াস) হয়ে গেল। হায়যের রক্ত হলো, নারীদের প্রকৃতি বা জন্মগত স্বভাব। মহানাবী (ﷺ) বলেন: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ অর্থাৎ: এটা এমন একটা ব্যাপার যা আল্লাহ তা'আলা সকল আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[৯০]
মহানাবী (ﷺ) ইস্তিহাযার ব্যাপারে বলেন: إنه دم عِرْق অর্থাৎ: এটা শিরা নির্গত রক্ত।[৯১] তদুপরি, হায়যের রক্ত হয় গাঢ়, দুর্গন্ধময় এবং তা বিশ্রী গন্ধ করে। তা পেশাব পায়খানার মতই। এটা দুই রাস্তা ব্যতীত অন্য কোথাও থেকে নির্গত রক্ত নয়।

৩। যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় তার রক্ত:

এ বিষয়ের আলোচনা মানুষের রক্তের ব্যাপারে পূর্বে যে আলোচনা করা হয়েছে তদ্রূপ। কেননা এটা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল নেই। সুতরাং তা মৌলিক দিক থেকে নাপাকী মুক্ত হওয়ার দাবীদার। নিম্নোক্ত বাণী দ্বারাও তা পবিত্র হওয়ার দলীলকে শক্তিশালী করে। যেমন ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি বলেন:

---

[৯০] বুখারী হা/ ২৯৪; মুসলিম হা/ ১২১১
[৯১] বুখারী হা/ ৩২৭; মুসলিম হা/ ৩৩৩

www.waytojannah.com

كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وضعه بين كتفيه وثبت النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا فضحكوا

একবার রাসূলুল্লাহ কা'বা ঘরের নিকট দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় আবূ জাহল তার সাথীদের নিয়ে সেখানে বসে ছিল। অতঃপর তারা একে অপরে বলতে লাগল, তোমাদের এমন কে আছে যে অমুক গোত্রের উট যবেহ করার স্থান পর্যন্ত যেতে রাযী? সেখান থেকে গোবর, রক্ত ও গর্ভাশয় নিয়ে এসে অপেক্ষায় থাকবে। যখন এ ব্যক্তি সাজদায় যাবে, তখন এগুলো তার দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দেবে। এ কাজের জন্য তাদের চরম হতভাগা ব্যক্তি ('উকবা) উঠে দাঁড়াল (এবং তা নিয়ে আসলো)। যখন রাসূলুল্লাহ সাজদায় গেলেন তখন সে তার দু'কাঁধের মাঝখানে সেগুলো রেখে দিল। নাবী সাজদায় স্থির হয়ে গেলেন। এতে তারা হাসাহাসি করতে লাগল.....।[৯২]

যদি উটের রক্ত নাপাক হতো, তাহলে মহানাবী (ﷺ) অবশ্য তার কাপড় খুলে ফেলতেন অথবা সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকতেন।

ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে:

« أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأ»

একদা ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) সালাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় তার পেটের উপর উট যবেহ করা রক্ত ও গোবর বা অনুরূপ কিছু ছিল। অথচ তিনি এ জন্য ওযূ করেন নি।[৯৩]

যদিও অত্র আসারটি প্রাণীর রক্ত পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে দলীল হওয়ার ক্ষেত্রে বিতর্কিত। কেননা ইবনে মাসউদ সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শরীর ও কাপড় পাক হওয়াকে শর্ত মনে করেন না। তিনি এটাকে মুস্তাহাব মনে করেন।

আমার বক্তব্য: যদি রক্ত নাপাক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা সাব্যস্ত হয়, তাহলে পরবর্তীদের দলীলের দিকে আমরা ভ্রুক্ষেপ করব না। আর যদি ইজমা সাব্যস্ত না হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে রক্ত পবিত্র। এ সমস্ত দলীলাদীর প্রয়োজন নেই। যদিও আমার নিকট দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ রক্ত পবিত্র হওয়ার অভিমতটিই পছন্দনীয় ছিল। কিন্তু এখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, এ মাসআলার ব্যাপারে ইজমা সাব্যস্ত আছে। অনেক বিদ্বানই এর ইজমা হওয়ার কথাটি বর্ণনা করেছেন। এর বিপরীত প্রমাণিত হয় নি। এ ইজমার বর্ণনাগুলোর মধ্যে উচ্চমানের বর্ণনা হলো, ইমাম আহমাদ (রাহি.) এর বর্ণনা, অতঃপর ইবনে হাযম (রাহি.) এর বর্ণনা। (তবে যারা ধারণা করেন যে, আহমাদের মাযহাব হলো 'রক্ত পবিত্র' তাদের এ কথা সম্পূর্ণ বিপরীত।) এ ব্যাপারে আমি যতটুক জেনেছি তা হলো,

ইবনুল কাইয়্যিম ইগাসাতুল লুহফান গ্রন্থে (১/৪২০) বলেন: ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার দৃষ্টিতে কি রক্ত ও বমি সমান? উত্তরে তিনি বলেন: না, রক্তের ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেন নি। তিনি পুনরায় বলেন: বমি, নাকের ময়লা ও পুঁজ আমার কাছে রক্তের চেয়ে শিথিল।

---

[৯২] বুখারী হা/ ২৪০; মুসলিম হা/ ১৭৯৪

[৯৩] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ১/২৫; ইবনে আবী শাইবা ১/৩৯২

ইবনে হাযম মারাতিবুল ইজমা গ্রন্থে বলেন: আলিমগণ রক্ত নাজাসাত বা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

অনুরূপভাবে হাফেজ ফাতাহ গ্রন্থে (১/৪২০) এ ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনু আব্দুল বার তামহীদ গ্রন্থে (২২/২৩০) বলেন: সব রক্তের হুকুম হায়েযের রক্তের হুকুমের মত। তবে অল্প রক্ত হলে তা উক্ত হুকুমের বহির্ভূত হবে তথা তা পবিত্র হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা রক্ত নাপাক হওয়ার জন্য প্রবহমান হওয়াকে শর্ত করেছেন। আর যখন রক্ত প্রবহমান হবে তখন তা رجس তথা নাপাক হবে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা রয়েছে যে, প্রবহমান রক্ত رجس বা নাপাক। ইবনুল আরাবী আহকামুল কুরআনে (১/৭৯) বলেন: আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, রক্ত হারাম এবং নাপাক। তা খাওয়া যায় না এবং এর মাধ্যমে উপকার গ্রহণও করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা এখানে রক্তকে মুত্বলাক বা সাধারণ ভাবে উল্লেখ করেছেন। আর সূরা আন'আম এর মধ্যে তা مسفوح (প্রবহমান) শব্দের সাথে مقيد (নির্দিষ্ট) করেছেন। আলিমগণ এখানে সর্বসম্মতভাবে مطلق (সাধারণ) কে مقيد (নির্দিষ্ট) এর উপর ব্যবহার করেছেন।

ইমাম নাববী (রাহি:) মাজমূ গ্রন্থে (২/৫৭৬) বলেন: দলীলসমূহ প্রকাশ্যভাবে রক্ত নাপাক হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। মুসলমানদের মধ্যে কেউ এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে হাবী গ্রন্থকার কতিপয় উক্তিকারী থেকে বর্ণনা করে বলেন: রক্ত পবিত্র। কিন্তু এ সমস্ত উক্তিকারীগণকে ইজমা ও ইখতিলাফকারী আলিমদের মধ্যে গণ্য করা হয় না।

আমি বলি (আবূ মালিক): উপরের আলোচনা থেকে আমার কাছে যা স্পষ্ট হচ্ছে তা হলো: ইজমা সাব্যস্ত থাকার কারণে রক্ত অপবিত্র। তবে ইমাম আহমাদ (রাহি.) এর চেয়ে যদি আর কোন বড় মাপের ইমামের কাছ থেকে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে রক্ত পবিত্র হওয়ার মতামতটি প্রাধান্য পাবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

মানুষের বমি কি নাপাক?

ইতিপূর্বে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তু মূলতঃ পবিত্র। আর এ মৌলিকতা থেকে পরিবর্তন করা যাবে না যতক্ষণ না এ ব্যাপারে দলীলের উপযোগী কোন সহীহ প্রমাণ পাওয়া যায়, যেটি প্রাধান্য পাওয়ার ফলে বিতর্কমুক্ত হয় অথবা সমতা বজায় থাকে। যদি তার দলীল পাওয়া যায়, তাহলে ভাল কথা; আর যদি দলীল না পাওয়া যায় তাহলে, নাপাক হওয়ার দাবী বাতিল করাই আমাদের জন্য আবশ্যক হবে।

কেননা এ দাবীর ফলে এ কথা বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার প্রতি এ সমস্ত বস্তু ধৌত করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। যার ফলে ধারণা করা হয় যে, এগুলো নাপাক, এগুলো সালাতে বাধা দেয়। অথচ এর দলীল কোথায়?

বমি ও এ জাতীয় কিছু জিনিস মৌলিক পবিত্রতা থেকে পরিবর্তন হওয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ প্রমাণ পাওয়া যায় নি, এ ব্যাপারে আম্মার (ﷺ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

«إِنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالْقَيْءِ»

অর্থাৎ: তোমার কাপড়ে পেশাব, পায়খানা, বমি, রক্ত ও মনি লাগলে তা ধুয়ে ফেল। কিন্তু হাদীসটি যঈফ। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

সহীহ সূত্রে আবূ দারদা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ »
অর্থাৎ: একদা মহানাবী (ﷺ) বমি করার পর ইফতার করলেন, অতঃপর ওযূ করলেন।[৯৪]

এ হাদীসে বমি নাপাক হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। এ হাদীস এটাও প্রমাণ করে না যে, বমি করার ফলে ওযূ করা ওয়াজিব। এর দ্বারা ওযূ ভঙ্গেরও কোন প্রমাণ নেই। শুধু বমনের কারণে ওযূকে শরীয়াত সম্মত করা হয়েছে। কেননা শুধু মহানাবী (ﷺ) এর কর্মটিই কোন আমল ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ করে না।
ব্যাপারটি এমন নয় যে, যে সব বস্তু ওযূ ভঙ্গ করে তা নাপাক হিসেবে গণ্য হবে। এটা ইবনে হাযম (রাহি.) এর অভিমত এবং এটা শাইখুল ইসলাম তার ফাৎওয়ায় গ্রহণ করেছেন।

মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে নির্গত তরল জাতীয় পদার্থের বিধান কি? এবং তাদের লজ্জাস্থান থেকে নির্গত ভিজা তরল পদার্থের নাম কি রাখা যেতে পারে?

এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের দু'টি মাযহাব পরিলক্ষিত হয়:[৯৫]

১ম: এটা অপবিত্র:
কেননা এর দ্বারা সন্তান জন্মগ্রহণ করে না। এটা মযির সাদৃশ্য রাখে। তাদের দলীল হলো: যায়েদ বিন খালিদ উসমান বিন আফ্ফান (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞেস করে বলেন:
أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ، قَالَ عُثْمَانُ «يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ» قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

অর্থাৎ: স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর যদি তার বীর্যপাত না ঘটে তাহলে সে ব্যাপারে আপনার মতামত কি? উত্তরে উসমান (رضي الله عنه) বলেন: সে সালাতের ন্যায় ওযূ করবে এবং তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। **উসমান (رضي الله عنه) বলেন,** আমি এটা রাসূল (ﷺ) এর কাছ থেকে শুনেছি।[৯৬]
উবাই বিন কা'ব এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূল (ﷺ) কে বলেন:
يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي»

হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর যদি তার বীর্যপাত না ঘটে তাহলে সে ব্যাপারে **আপনার মতামত** কি? তিনি বললেন: স্ত্রীর অঙ্গে যতটুকু স্পর্শ করেছে ততটুকু ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর **ওযূ করে সালাত** আদায় করবে।[৯৭]

---

[৯৪] **আবূ দাউদ,** সনদ সহীহ হা/ ২৩৮১; তিরমিযী হা/ ৮৭; আহমাদ ২/৪৪৩ প্রভৃতি।
[৯৫] **মুগনী** (২/৮৮), মাজমূ (১/৫৭০)
[৯৬] **সনদ সহীহ;** বুখারী (২৯২), মুসলিম (৩৪৭), কিন্তু তা মানসূখ হয়ে গেছে।
[৯৭] **সনদ সহীহ;** বুখারী (২৯৩), মুসলিম (৩৪৬), কিন্তু তা মানসূখ হয়ে গেছে।

Contents

তারা বলেন: মহানাবী (ﷺ) মহিলাদের লজ্জাস্থানে যতটুকু লেগে যায় তা ধৌত করার নির্দেশ দেয়াটা প্রমাণ করছে যে, লজ্জাস্থানের ভিজা তরল পদার্থ নাপাক।

জবাব: এ হাদীস দু'টি রহিত হয়ে গেছে গোসল করার নির্দেশের হাদীসের মাধ্যমে।[৯৮] এ ব্যাপারে আলোচনা যথাস্থানে করা হবে ইনশা আল্লাহ। এটাও হতে পারে যে, মযির কারণে ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা স্বামীর অথবা স্ত্রীর লজ্জাস্থান থেকে নির্গত হয়। অনুরূপভাবে তারা এটাকে নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে বলেন: এ তরল পদার্থ দু'রাস্তার যে কোন একটি দিয়ে নির্গত হয়। আর নিয়ম হলো: মনি ছাড়া দু'রাস্তা দিয়ে যা নির্গত হয় তা অপবিত্র।

২য়: মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে নির্গত তরল জাতীয় পদার্থ পবিত্র:[৯৯]

এ মাযহাব নিম্নোক্ত ভাবে দলীল দিয়ে থাকেন-

(১) আয়িশা (রা.) মহানাবী (ﷺ) এর কাপড় থেকে মনি উঠিয়ে ফেলতেন। এটা ছিল সহবাসের মনি। কেননা নাবীদের কখনও স্বপ্নদোষ হয় না।[১০০] এটা লজ্জাস্থানের ভিজা তরল পদার্থের সাথে মিলে যায়। কেননা যদি আমরা মহিলাদের লজ্জাস্থানের অপবিত্রতার হুকুম দিই তাহলে তার মনিকেও অপবিত্র বলব। কারণ সেটা মহিলার লজ্জাস্থান থেকে নির্গত হতে পারে। ফলে তার ভিজা তরল পদার্থ দ্বারা তা নাপাক হয়ে যাবে।

(২) এই ভিজা তরল পদার্থের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কথা এই যে, এটা মহিলাদের ক্ষেত্রে অধিক লক্ষ করা যায়। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমান যুগের মহিলাদের মতো মহানাবী (ﷺ) এর যুগের মহিলাদেরও এ তরল পদার্থ নির্গত হতো। অথচ মহানাবী (ﷺ) তাদেরকে এ কারণে গোসল বা ওযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

(৩) এই তরল পদার্থ পেশাব নির্গত হওয়ার যে নাপাক রাস্তা রয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

(৪) ফক্বীহদের উক্তি "মনি ব্যতীত দু'রাস্তা দিয়ে নির্গত বস্তু নাপাকীর অন্তর্ভুক্ত" এটা মহানাবী (ﷺ) এর কোন বাণী নয় এবং এ কথার উপর উম্মতের কোন ইজমা নেই। বরং এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, দু'রাস্তা দিয়ে কতিপয় তরল পদার্থ নির্গত হয় যা ওযূ নষ্ট করে না। যেমন- ইস্তেহাযার রক্ত। এ ব্যাপারে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে ইন্‌শা আল্লাহ্।

আমার বক্তব্য: আমার কাছে সঠিক কথা হলো: যদি এ তরল পদার্থ স্বামীর সাথে আদর সোহাগ, সঙ্গমের ইচ্ছা অথবা অনুরূপ কিছুর কারণে মহিলার লজ্জাস্থান থেকে নির্গত হয়। তাহলে সেটা মযির অন্তর্ভুক্ত

---

[৯৮] ফাতহুল বারী (১/৪৭৩)

[৯৯] মুস্তফা বিন আদাবী (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন!) প্রণীত জামিউ আহকামুন নিসা (১/৬৮)

[১০০] অনুরূপভাবে তিনি মুগনীর মধ্যে বলেছেন (২/৮৮), শাইখ বলেন, এটা কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের মুখাপেক্ষী। এরূপ কোন নাস সম্পর্কে আমি অবগত হতে পারি নি।

www.waytojannah.com

হবে। আর এ ব্যাপারে আমরা জেনেছি যে, এটা নাপাকীর অন্তর্ভুক্ত। তা ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব এবং এর দ্বারা ওযূ নষ্ট হবে।

আর যদি এই তরল পদার্থ অধিকাংশ সময় মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে নির্গত হয় এবং গর্ভধারণের সময়, কঠোর পরিশ্রমের সময় অথবা অধিক চলা-ফেরার সময় এটা বেশি নির্গত হয়, তাহলে এটা মূলতঃ পবিত্র। কেননা এটা নাপাক হওয়ার কোন দলীল নেই। আল্লাহই ভাল জানেন।

যে পরিমাণ নাজাসাত ধর্তব্য নয়:

কাপড়, স্থান অথবা শরীরে লাগা নাজাসাতের পরিমাণ, প্রকারভেদ ও কতটুকু নাজাসাত ধর্তব্য নয় এ ব্যাপারে ফক্বীহগণ মতভেদ করেছেন।[১০১]

তবে এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো: আবশ্যকতা ও ব্যাপকতার কারণে যে সমস্ত নাপাকী থেকে দূরে থাকা অসম্ভব এবং যে সব নাপাকী দূর করা কষ্টকর সে সকল ক্ষেত্রে নাপাকী ধর্তব্য নয়।

যে সমস্ত বস্তু নাপাক হওয়ার ব্যাপারে শারঈ দলীল বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি:

(১) হায়যের রক্ত থেকে কাপড় পাক করার উপায়:

এমতবস্থায় তা রগ্‌ড়িয়ে বা উঠিয়ে ফেলতে হবে। অতঃপর আঙ্গুলের কিনারা দিয়ে তা ঘর্ষণ করতে হবে, যাতে তা বিলীন হয়ে যায় এবং নাপাক দূর হয়ে যায়। এরপর তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে।

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ، قَالَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) বলেন: একদিন একজন মহিলা নাবী (ﷺ) এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), আমাদের কারও কাপড়ে যদি হায়যের রক্ত লেগে যায় তখন সে কি করবে? তিনি বললেন: রক্তের জায়গাটি ভালোভাবে রগ্‌ড়াবে, তারপর পানি দিয়ে কচলিয়ে উত্তমরূপে ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর ঐ কাপড় পরে সালাত আদায় করতে পারবে।[১০২]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদের কারও হায়য হলে, পাক হওয়ার পর রক্ত রগড়িয়ে কাপড় পানি দিয়ে ধুয়ে সেই কাপড়ে তিনি সালাত আদায় করতেন।[১০৩]

কোন মহিলা যদি হায়যের রক্ত দূর করার জন্য খড়ি বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করে অথবা পানি, সাবান কিংবা পরিষ্কারক কোন বস্তু দ্বারা তা ধুয়ে ফেলে তবে তা উত্তম হবে।

---

[১০১] আল ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (১৬৯-১৭৭)

[১০২] বুখারী; মুসলিম হা/ ২৯১

[১০৩] বুখারী হা/ ৩০৮ ; ইবনে মাজাহ হা/ ৬৩০

عن أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ قالتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَالَ: حُكِّيهِ بِضِلْعٍ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

উম্মে কায়েস বিনতে মিহ্‌সান (রা.) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে হায়যের রক্ত কাপড়ে লাগলে কি করতে হবে তা জিজ্ঞেস করি। তিনি (ﷺ) বলেন: প্রথমে এক খণ্ড কাঠ দিয়ে তা খুঁচবে অতঃপর কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে ধৌত করবে।[১০৪]

(২) কাপড়ে দুগ্ধপায়ী শিশুর পেশাব লাগলে পবিত্র করার উপায়:

মহানাবী (ﷺ) বলেন:

«يُغسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ»

মেয়ে শিশুদের পেশাব ধৌত করতে হবে এবং ছেলে শিশুদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।[১০৫]

(৩) মযি থেকে কাপড় পবিত্র করার উপায়:

যখন মযি অত্যধিক নির্গত হবে এবং রোগ হওয়ার কারণে ব্যাপকতা দেখা দিবে, তখন ইসলামী শরীয়াতে তা পবিত্র করার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদান করেছে। সুতরাং মযি লাগার স্থানে কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দিলেই তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। যেমন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনাইফ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তার অত্যধিক মযি নির্গত হতো। অতঃপর তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করেন:

«كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ، قَالَ: يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ»

আমার কাপড়ে মযি লাগল কি করব? তিনি বলেন: কাপড়ের যে স্থানে মযির নিদর্শন দেখবে, এক আজলা পানি নিয়ে উক্ত স্থানে হালকাভাবে ছিটিয়ে দিবে, যাতে তা দূরীভূত হয়।[১০৬]

(৪) মহিলাদের কাপড়ের নিচের (ঝুলে থাকা) অংশ পবিত্র করার পদ্ধতি:

যখন মহিলাদের কাপড়ের নিচের অংশ নাপাক হবে তখন পবিত্র জমিনে স্পর্শ করার ফলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। একদা এক মহিলা রাসূল (ﷺ) এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন-

إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ: أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ

আমি এমন এক মহিলা যে কাপড়ের নিচের অংশ ঝুলিয়ে রাখি। তিনি আরও বলেন, আমি নাপাক স্থানেও চলাফেরা করি। উম্মে সালামা (রা.) বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: পরবর্তী (পবিত্র) স্থান তা পবিত্র করে দেয়।[১০৭]

---

[১০৪] আবূ দাউদ হা/ ৩৬৩; নাসাঈ ১/১৯৫; ইবনে মাজাহ হা/ ৬২৮

[১০৫] সহীহ লিগায়রিহী, আবূ দাউদ হা/ ৩৭৬, নাসাঈ ১/১৫৮; ইবনে মাজাহ হা/ ৫২৬ , এর শাহেদ রয়েছে।

[১০৬] হাসান, আবূ দাউদ হা/ ২১০, তিরমিযী; ইবনে মাজাহ হা/ ৫০৬

[১০৭] সহীহ; আবূ দাউদ হা/ ৩৮৩, তিরমিযী (১৪৩), ইবনে মাজাহ হা/ ৫৩১।

www.waytojannah.com

(৫) জুতা সেন্ডেলের তলদেশ পবিত্র করার পদ্ধতি:

عن أبي سعيد الخدري أن النَّبِيِّ ﷺ قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما فإن رأى فيهما خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما

আবূ সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন: যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে, তখন তার জুতা খুলে তা ভালভাবে দেখে নিবে। যদি তাতে কোন অপবিত্র কিছু দেখে, তাহলে তা জমিনে মুছে নিবে, অতঃপর তা নিয়ে সালাত আদায় করবে।[১০৮]

(৬) কুকুর পাত্রে জিভ দিয়ে চাটলে তা পবিত্র করার উপায়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرَارٍ، أُولَاهُنَّ بِتُرَابٍ

আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী কারীম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন: কুকুর যদি তোমাদের পাত্রে লেহন করে (খায় বা পান করে) তবে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তা সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে, প্রথম বার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করতে হবে।[১০৯]

(৭) দাবাগাত বা পরিশোধনের মাধ্যমে মৃত জন্তুর চামড়া পবিত্র করণ:

মহানাবী (ﷺ) বলেন: إذا دبغ الإهاب فقد طهر তথা, কাঁচা চামড়াকে পাকা করা হলে তা পবিত্র হয়ে যায়।[১১০]

(৮) পেশাব বা এ জাতীয় কিছু থেকে জমিন পবিত্র করার পদ্ধতি:

এমতবস্থায় জমিনে পানি ঢেলে দিলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। যেমন মহানাবী (ﷺ) জনৈক বেদুঈন এর মাসজিদে পেশাব করার ফলে তাতে পানি ঢালার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১১] আর মহানাবী (ﷺ) এটা আদেশ দিয়েছিলেন তাড়াতাড়ি তা পরিষ্কার করার জন্য। তবে যদি পানি না ঢালা হয় তাহলে শুকানোর পর নাপাকের চিহ্ন বা অস্তিত্ব দূর হলে তা পবিত্র হয়ে যাবে।

(৯) কূপে অথবা ঘি এর মধ্যে নাপাকী পতিত হলে তা পবিত্র করার পদ্ধতি:

এমতবস্থায় নাপাক বস্তু ও তার আশপাশের জিনিস তুলে ফেলতে হবে। আর এর বাকি অংশ পবিত্র থাকবে।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (ﷺ) কে ঘি এর মধ্যে পতিত ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দেন যে, ইঁদুরটি এবং তার আশেপাশের অংশ উঠিয়ে ফেলে দাও। তার পর তোমাদের ঘি খাও।[১১২]

---

[১০৮] আবূদাউদ (৬৪৬)
[১০৯] মুসলিম হা/ ২৭৯; আবূ দাউদ হা/ ৭১
[১১০] মুসলিম, প্রভৃতি
[১১১] বুখারী ২১৯; মুসলিম হা/ ২৮৪
[১১২] বুখারী (যবেহ করা অধ্যায়-৩৪)

Contents

নাপাক দূর করার জন্য কি পানি জরুরী? না পানি ব্যতীত অন্য কোন তরল পদার্থ দ্বারা নাপাকী দূর করা জায়েয আছে?

এ মাসআলার ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন, এর মধ্যে প্রসিদ্ধ দু'টি মতামত হলো:

১ম মতামত:

নাপাকী দূর হওয়ার জন্য পানি শর্ত। সঠিক দলীল প্রমাণাদী ছাড়া পানি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা নাপাক দূর করা বিশুদ্ধ নয়।

আর এটা ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর প্রসিদ্ধ দু'টি মাযহাব এবং ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) এর নতুন মতামত। ইমাম শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং তার অনুসারীগণ এ মতামত গ্রহণ করেছেন।[১১৩] তাদের দলীল হলো:

(১) আল্লাহ বলেন:﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ আকাশ হতে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন (*সূরা আনফাল* -১১)। এছাড়াও অন্যান্য দলীল রয়েছে, যা প্রমাণ করে পানি পবিত্রকারী উপাদান।

(২) মহানাবী (ﷺ) জনৈক বেদুঈনের পেশাবে পানি ঢালার নির্দেশ দিয়েছিলেন ।[১১৪] তারা বলেন এখানে أمر বা আদেশটা وجوب বা আবশ্যকতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং পানি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা নাপাক দূর করা যথেষ্ট হবে না।

(৩) আবূ সা'লাবার হাদীসে রয়েছে মহানাবী (ﷺ) আহলে কিতাবদের পাত্র পানি দ্বারা ধৌত করার আদেশ দিয়েছিলেন।[১১৫]

(৪) ইমাম শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জনের মূল হাতিয়ার হচ্ছে পানি। কেননা শরীয়াত প্রবর্তক তাকে প্রবিত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং শরীয়াতের পক্ষ থেকে কোন দলীল প্রমাণ ব্যতীত পানি ছাড়া অন্য কিছুকে পবিত্রকারী হিসেবে গণ্য করা যাবে না। আর যদি দলীল সাব্যস্ত থাকে তাহলে হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে পানি যে পবিত্রকারী এটা জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করা অবশ্যক হচ্ছে, যা শরীয়াতের দাবীর পরিপন্থি।

২য় অভিমত:

যে সমস্ত জিনিস দ্বারা নাপাকী দূর করা সম্ভব তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ। এর জন্য পানি হওয়া শর্ত নয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) এর অভিমত। ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) অপর একটি বর্ণনা মতে এ অভিমত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফেঈ ও ইবনে

---

[১১৩] বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/৯৯), আল-উম্ম (১/৪৯), সাইলুল জার্‌রার (১/৪৯)

[১১৪] বুখারী, মুসলিম, একটু আগেই তা উল্লেখ করা হয়েছে।

[১১৫] বুখারী (৫১৭০), মুসলিম (১৯৩০)।

www.waytojannah.com

হাযম (রাহিমাহুল্লাহ) এর পূর্বের অভিমত এটিই। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) ও আল্লামা ইবনে উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) এ অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন।[১১৬] আর এ অভিমতটিই প্রাধান্য প্রাপ্ত। এর কারণ নিম্নরূপ:

(১) পানি নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্রকারী। তাই এটা অন্য কোন বস্তুকে পবিত্রকারী হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেয় না। কেননা নিয়ম হল: কোন নির্দিষ্ট কারণ (সাবাব) না হওয়াটা কোন নির্দিষ্ট বিষয় (মুসাব্বাবকে) না-বোধক করতে চায় না। চাই তার দলীল থাক বা না থাক। কেননা কার্যকরণ (মুয়াস্সার) কখনও অন্য বস্তুও হতে পারে। আর এটা নাজাসাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।[১১৭]

আমার বক্তব্য: কতিপয় পানীয় দ্রব্য, যেমন: শির্কা এবং শিল্পজাত পবিত্রকারী জিনিস পানির মতই নাজাসাত দূর করতে পারে। বরং পানির চেয়ে এগুলোতে বেশি পরিষ্কার হয়।

(২) ইসলামী শরীয়াত নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পানি দ্বারা নাপাকী দূর করার নির্দেশ দিয়েছে। সার্বজনীন ভাবে এ নির্দেশ দেয়া হয় নি যে, পানি দ্বারাই নাপাকী দূর করতে হবে।

(৩) ইসলামী শরীয়াত কতিপয় নাপাকী পানি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা করার অনুমতি দিয়েছে। যেমন: পাথর দ্বারা ইসতিনজা করা, জুতা সেন্ডেল মাটিতে মর্দন করে পবিত্র করা, কাপড়ের নিচের অংশ ভূমিতে স্পর্শ করার ফলে পবিত্র করণ ইত্যাদি। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(৪) নাজাসাত দূর করাটা নির্দেশিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এটা নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে- এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কোন উপায়ে তা অর্জিত হলেই হুকুম সাব্যস্ত হবে। এ কারণে নাপাকী দূর করার জন্য নিয়ত শর্ত নয়। কিন্তু যদি তা বান্দার কর্ম ও নিয়তের মাধ্যমে দূর করা হয়, তাহলে তা বেশি উত্তম হবে। আর যদি কর্ম ও নিয়ত ছাড়া হয়, তাহলে শুধু ক্ষতিকর জিনিসের বিধান দূর হবে মাত্র। এতে কোন সাওয়াব হবে না এবং শাস্তিও হবে না।

এর সমর্থনে আরও বলা যায় যে, মুসলমানদের ঐকমত্যে যারা মদকে নাজাসাত বলেন, তাদের নিকট মদকে যদি শির্কা বানানো হয়, তাহলে তা নিজে পবিত্র।

আমার বক্তব্য: বিশুদ্ধ মতামত হচ্ছে এটাই যে, কোন বস্তু দ্বারা নাপাকী দূর হলেই তার (অপবিত্রতার) হুকুম দূরিভুত হবে এবং তা পবিত্র হিসেবে গণ্য হবে।

প্রয়োজনীয় কথা:

(১) কারও কাপড় অথবা শরীরে নাপাক বস্তু লাগলে পানি ব্যতীত অন্য কোন পরিষ্কারকারী বস্তু ব্যবহার করে নাপাকী দূর করা বৈধ হবে, এর জন্য পানি ব্যবহার করা আবশ্যক নয়।

(২) প্রয়োজন ছাড়া খাদ্য বা পান করার বস্তু নাপাকী দূর করার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। উপরন্তু এর দ্বারা সম্পদ নষ্ট বা অপচয় হয়।[১১৮]

(৩) পানি ব্যতীত অন্যকোন তরল পদার্থ দ্বারা নাপাকী অর্জন করা নাজাসাতে হাকীকী (প্রকৃত নাপাক) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে নাপাক শরীরে, কাপড়ে বা স্থানে লাগে। আর ত্বহারাতে হুকমী তথা বিধানগত পবিত্রতা যেমন: ওযূ, গোসল ইত্যাদির ক্ষেত্রে পানি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বৈধ হবে না।

---

[১১৬] আল-বাদাঈ (১/৮৩), ফাতহুল কাদীর (১/২০০), মাজমূউল ফাৎওয়া (২১/৪৭৫), মুহাল্লা (১/৯২-৯৪), শারহুল মুমতি (১/৩৬১-৩৬৩)

[১১৭] শারহুল মুমতি (১/৩৬২)

[১১৮] মাজমূউল ফাৎওয়া (২১/৪৭৫),

Contents

الإستنجاء (ইসতিনজা)

الإستنجاء (ইসতিনজা) এর পরিচয় এবং তার হুকুম:

إستنجاء শব্দটি বাবে إستفعال এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ: পরিত্রাণ পাওয়া বা কর্তন করা। যেমন বলা হয় نجوت الشجرة অর্থাৎ: আমি গাছ কর্তন করেছি। একে إستنجاء এজন্যই বলা হয় যে, এর মাধ্যমে কষ্ট কর্তন বা দূরিভুত করা হয়।

পরিভাষায়: পানি, পাথর, কাগজ বা অনুরূপ কিছু দ্বারা দু'রাস্তা (অগ্র ও পশ্চাদ) দিয়ে নির্গত নাপাক দূর করাকে ইসতিনজা বলে। ইসতিনজাকে ইসতিজমার নামেও অবহিত করা হয়। কেননা অনেক সময় ইসতিনজা করার ক্ষেত্রে ছোট পাথর ব্যবহার করা হয়। অনুরূপভাবে একে ইসতিতাবাও বলা হয়। কেননা এর মাধ্যমে শরীর থেকে নাপাকী দূর করার পর পবিত্রতা অর্জন করা হয়।[১১৯]

ইসতিনজার হুকুম:

ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ)[১২০] ব্যতীত জমহুর আলিমদের মতে, দু'রাস্তা দিয়ে স্বভাবত যা নির্গত হয়; যেমন: পেশাব, মযি বা পায়খানা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসতিনজা করা ওয়াজিব।
যেমন মহানাবী (ﷺ) এর বাণী:

«إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا؛ فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ»

তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় গমন করে, তখন সে যেন তার সাথে তিনটি পাথর (কুলুখ) নিয়ে যায়, যা দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট।[১২১]

এটা আদেশ সূচক বাণী। আর এ আদেশটি ওয়াজিব বা আবশ্যকতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পর মহানাবী (ﷺ) এর বাণী فَإِنَّهَا تَجْزِي এর মধ্যে تَجْزِي (যথেষ্ট) শব্দটি ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মহানাবী (ﷺ)আরও বলেন: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار -অর্থাৎ: তোমরা কেউ তিনটি পাথরের কম পাথর দ্বারা ইসতিনজা করবে না।[১২২]
এখানে তিনটি পাথরের কম ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞা এটাই প্রমাণ করে যে, এর চেয়ে কম ব্যবহার করা হারাম। যেহেতু নাপাকীর ক্রিয়দাংশ পরিত্যাগ করা হারাম, সেহেতু তার সম্পূর্ণটা পরিত্যাগ করা আরও বেশি হারাম।

---

[১১৯] আল-মুগনী (১/২০৫)
[১২০] ইমাম আবু হানীফা (রাহি.) বলেন: ইসতিনজা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, যতক্ষণ না নির্গত নাজাসাত থেকে মুক্ত না হওয়া যায়। তাদের দলীল হল, "من إستجمر فليوتر, من فعل فقد أحسن, ومن لا فلا حرج" অর্থাৎ, "যে ইসতিনজা করার জন্য ঢিলা নিবে সে যেন বেজোড় ঢিলা নেই। যে এটি করল সে ভাল কাজ করল। আর যে করল না তার কোন ক্ষতি নেই"। হাদীসটি যঈফ। যঈফুল জামে (৫৪৬৮)
[১২১] শাওয়াহেদের কারণে হাসান; আবূ দাউদ হা/ ৪০; নাসাঈ ১/১৮; আহমাদ ৬/১০৮-১৩৩ সনদ যঈফ, তবে শাওয়াহেদ থাকার কারণে তা শক্তিশালী হয়েছে। দেখুন, ইরওয়া (৪৪)
[১২২] মুসলিম হা/ ২৬২; নাসাঈ ১/১২; তিরমিযী (১৬); আবূ দাউদ।

www.waytojannah.com

যে সব বস্তু দ্বারা ইসতিনজা করা বৈধ

নিম্নে উল্লেখিত দু'টি বস্তু দ্বারা ইসতিনজা করা বৈধ। যথা:

১। পাথর এবং অনুরূপ জমাটবদ্ধ পদার্থ, যেগুলো দ্বারা নাপাক দূর করা যায় ও যা ব্যবহার হারাম নয়। যেমন: কাগজ, নেকড়া, শুকনো কাঠ এবং যা দ্বারা নাপাকমুক্ত করা যায় এমন বস্তু।
আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) বলেন:

«إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا؛ فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ»

তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় গমন করে, তখন সে যেন তার সাথে তিনটি পাথর (কুলুখ) নিয়ে যায়, যা দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট।[১২৩]

বিশুদ্ধ মতে তিনটি পাথরের কমে ইসতিনজা করা বৈধ নয়:

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ

(ক) সালমান (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নাবী কারীম (ﷺ) আমাদেরকে ক্বিবলামুখী হয়ে পেশাব পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন: আমরা যেন ডান হাত দিয়ে ইসতিনজা না করি, তিনটি পাথরের কমে যেন ইসতিনজা না করি এবং গোবর ও হাড্ডি দ্বারা যেন ইসতিনজা না করি।[১২৪]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا

(খ) জাবির ইব্নে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: তোমরা কেউ যখন ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করবে তখন, সে যেন তিনটি ঢিলা ব্যবহার করে।[১২৫]

عن خلاد الجهني عن أبيه السائب أن النبي ﷺ قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار

(গ) খিলাদ আল জাহনী তার পিতা সায়িব এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেন: যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশ করবে, তখন সে যেন তিনটি পাথর নেয়।[১২৬]

আমার বক্তব্য: যদি তিনটি পাথর দ্বারা নাপাকমুক্ত হয় তাহলে ভাল কথা। আর না হলে তিনটির বেশি নেয়া ওয়াজিব হবে, যতক্ষণ না নাপাকমুক্ত হবে।

---

[১২৩] শাওয়াহেদের কারণে হাসান; আবূ দাউদ হা/ ৪০; নাসাঈ ১/১৮; আহমাদ ৬/১০৮-১৩৩ সনদ যঈফ, তবে শাওয়াহেদ থাকার কারণে তা শক্তিশালী হয়েছে। দেখুন, ইরওয়া (৪৪)

[১২৪] মুসলিম হা/ ২৬২; নাসাঈ ১/১২; তিরমিযী (১৬); আবূ দাউদ।

[১২৫] সহীহ; আহমাদ, ইবনে আবী শায়বা, ইবনে খুযায়মা। হুয়ায়নী (আল্লাহ তাঁকে হিফাযত করুন!) 'বাযলুল ইহসান' এর ১/৩৫১ তে বলেন, এর সনদ সহীহ।

[১২৬] হাসান ; তবরানী কাবীর ৮/৬৬২৩, দেখুন, 'বযল' এর ১/৩৫২।

Contents

হাড্ডি ও গোবর দ্বারা ইসতিনজা করা বৈধ নয়:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلَا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: তোমরা গোবর ও হাড্ডি দ্বারা ইসতিনজা করো না। কেননা তা তোমাদের ভাই জিনদের খাবার।[১২৭]

عن عَبْدَ اللَّه ابن مسعودٍ قال: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী (ﷺ) একবার শৌচ কাজে যাবার সময় তিনটি পাথর কুড়িয়ে দিতে আমাকে আদেশ দিলেন। তখন আমি দু'টি পাথর পেলাম এবং তৃতীয়টির জন্য খোঁজাখুঁজি করলাম কিন্তু পেলাম না। তাই এক খণ্ড শুকনো গোবর নিয়ে তার কাছে গেলাম। তিনি পাথর দু'টি নিলেন এবং গোবর খণ্ড ফেলে দিয়ে বললেন, এটা অপবিত্র।[১২৮]

২। পানি দ্বারা ইসতিনজা:

عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ،قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا، وَغُلَامٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পায়খানায় প্রবেশ করতেন, আর আমি ও আমার মত আরেকটি ছেলে তখন পানির পাত্র ও বর্শার ন্যায় লাঠিসহ তার পানি নিয়ে যেতাম। এই পানি দিয়ে তিনি শৌচকার্য করতেন।[১২৯]

পাথর দ্বারা ইসতিনজা করার চাইতে পানি দ্বারা ইসতিনজা করাই উত্তম। মহান আল্লাহ পানি দ্বারা ইসতিনজা করার জন্য কুবা বাসীদের প্রশংসা করেছেন। যেমন: আবূ হুরাইরা হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন: এ আয়াতটি কুবা বাসীদের প্রশংসায় বর্ণিত হয়েছে, 'এখানে কিছু লোক রয়েছে যারা পবিত্রতাকে পছন্দ করে" *(সূরা তাওবা-১০৮)*, রাসূল (ﷺ) বলেন, তারা পানি দ্বারা ইসতিনজা করে। ফলে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।[১৩০]

ইমাম তিরমিজী (১/৩১) বলেন: এর উপরই বিদ্বানগণ আমল করে থাকেন। তারা পানি দ্বারা ইসতিনজা করাকেই পছন্দ করেন, যদিও পাথর দ্বারা ইসতিনজা করা তাদের নিকট বৈধ। তারা পানি দ্বারা ইসতিনজা করাকে উত্তম মনে করেছেন। এটি সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাকের অভিমত।

---

[১২৭] সহীহ ; মুসলিম (৬৮২), তিরমিযী হা/১৮; আহমাদ ১/৪৩৬।

[১২৮] বুখারী হা/ ১৫৬; প্রভৃতি। এ হাদীস পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

[১২৯] বুখারী হা/ ১৫১; মুসলিম হা/২৭০,২৭১; প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থ।

[১৩০] শাওয়াহেদের কারণে হাসান; আবূ দাউদ হা/ ৪৪; তিরমিযী ৩১০০; ইবনে মাজাহ ৩৫৭; সনদ যঈফ, তবে শাওয়াহেদ থাকার কারণে তা শক্তিশালী হয়েছে। দেখুন, ইরওয়া (৪৫)।

www.waytojannah.com

বায়ু নির্গত হলে ইসতিনজা করতে হবে না এবং ওযূর পূর্বে ইসতিনজা আবশ্যক নয়:

যার বায়ু নির্গত হবে অথবা ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, তার উপর ইসতিনজা আবশ্যক নয়। ইবনে কুদামা বলেন: এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে বলে আমরা জানি না। আবূ আব্দুল্লাহ বলেন: আল্লাহর কিতাবে এবং তাঁর রাসূলের সুন্নায় বায়ু নির্গত হলে ইসতিনজা করার বিধান নেই। এ ক্ষেত্রে শুধু ওযূ আবশ্যক। যায়েদ ইবনে আসলামা থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাপারে বলেন:

﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾

যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ধৌত কর। (*মায়েদা*-৬)

এখানে এর অর্থ হলো: যখন তোমরা ঘুম থেকে জাগ্রত হবে (তখন তোমরা মুখমন্ডল ধৌত করবে)। ধৌত করা ব্যতীত অন্য কিছুর আদেশ এখানে দেয়া হয় নি। সুতরাং এটা প্রমাণিত হয় যে, তা (ইসতিনজা) ওয়াজিব নয়। কেননা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে শরীয়াত কর্তৃক। এখানে ইসতিনজার ব্যাপারে কোন দলীল বর্ণিত হয় নি। এমন কি অর্থগতভাবেও কোন দলীল পাওয়া যায় না। কেননা নাপাকী দূর করার জন্য ইসতিনজার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। অথচ এ ক্ষেত্রে নাপাকীর কোন অবস্থা পাওয়া যায় না।[১৩১]

যে সব কারণে ওযূ আবশ্যক সে সব কারণে ইসতিনজা আবশ্যক নয়। এটা সুন্নাতও নয় মুস্তাহাবও নয়, যেমনটি অনেক মানুষ ধারণা করে থাকেন। বরং এটা একক ইবাদত। ইসতিনজা করার উদ্দেশ্য হলো: স্থান নাপাকমুক্ত করা। এ ব্যাপারে কেউ বর্ণনা করেন নি যে, রাসূল (ﷺ) যখনই ওযূ করতেন তখনই ইসতিনজা করতেন। আর তিনি এ ব্যাপারে নির্দেশও দেন নি।

ইসতিনজার কতিপয় বিধিমালা

ইসতিনজা করার কিছু বিধিমালা রয়েছে যা পালন করা বাঞ্ছনীয়।

(১) ডান হাত দ্বারা ইসতিনজা করবে না:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ

আবূ ক্বাতাদাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন পেশাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ না ধরে, পায়খানার পর ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য না করে এবং পানি পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে।[১৩২]

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قِيلَ لَهُ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: أَجَلْ لَقَدْ «نَهَانَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ،

---

[১৩১] ইবনে কুদামাহ প্রণীত আল-মুগনী ১/২০৬।

[১৩২] বুখারী হা/ ১৫৩; মুসলিম হা/২৬৭ প্রভৃতি।

Contents

সালমান (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, একদা তাকে বলা হলো: তোমাদের নাবী তোমাদের প্রত্যেক জিনিস শিক্ষা দেন, এমন কি পেশাব-পায়খানার বিধান শিক্ষা দেন। তিনি বললেন: হ্যাঁ আমাদের নাবী (ﷺ) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, আমরা যেন পেশাব পায়খানার সময় ক্বিবলাকে সামনে না করি। ডান হাত দিয়ে যেন ইসতিনজা না করি এবং যেন তিনটি পাথরের কমে ইসতিনজা না করি।[১৩৩]

(২) ডান হাত দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে না: এর দলীল হলো: পূর্বে উল্লেখিত আবূ ক্বাতাদাহ এর হাদীস।

(৩) ইসতিনজার পর মাটিতে হাত মাজবে অথবা সাবান বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা হাত ধৌত করবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ – ﷺ – إِذَا أَتَى الْخَلاَءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ

আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন নাবী কারীম (ﷺ) পায়খানায় গমন করতেন তখন আমি তার জন্য পিতল বা চামড়ার পাত্রে পানি নিয়ে যেতাম। অতঃপর তিনি ইসতিনজা করে মাটিতে হাত মলতেন।[১৩৪]

মায়মূনা (রা.) বর্ণিত হাদীসও এ বিধানটিকে শক্তিশালী করে:

«ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَغَسَلَهَا»

অর্থাৎ: অতঃপর রাসূল (ﷺ) তার লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন এবং তার লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। তার পর তার হাতকে মাটিতে মললেন এবং ধুয়ে ফেললেন।[১৩৫]

(৪) সন্দেহ দূর করার জন্য পেশাবের পর কাপড় ও লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটিয়ে দিবে:

«عن بن عباس : أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة ونضح فرجه»

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত: রাসূল (ﷺ) একবার করে ওযূ করতেন এবং তার লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটিয়ে দিতেন।[১৩৬]

বহুমূত্র বা এ জাতীয় রোগী কিভাবে ইসতিনজা করবে?

যে ব্যক্তি বহুমূত্র বা এ জাতীয় সমস্যায় ভুগবে, সে ইসতিনজা করবে ও প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযূ করবে। এরপর অন্য সালাতের ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত যতটুকুই তা নির্গত হোক না কেন, তাতে কোন সমস্যা নেই। এটাই বিদ্বানদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতামত। ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ আহমাদ, ইসহাক ও আবূ সাওরসহ অন্যান্য বিদ্বানগণ এমতামত পেশ করেছেন। বহুমূত্র রোগে ভুক্তভোগীর হুকুম মুস্তাহাযার হুকুমের ন্যায়।

---

[১৩৩] মুসলিম (২৬২) , আবূ দাউদ (৮), তিরমিযী (১৬), নাসাঈ (১/১৬)

[১৩৪] হাসান লি গায়রিহী; আবূ দাউদ হা/৪৫; ইবনে মাজাহ হা/ ৬৭৮; নাসাঈ ১/৪৫; দেখুন, মেশকাত হা/৩৬০

[১৩৫] বুখারী হা/ ২৬৬; মুসলিম হা/৩১৭

[১৩৬] দারিমী হা/৭১১; বায়হাকী ১/১৬১; আলবানী 'তামামুল মিন্নাহ' এর ৬৬ পৃঃ বলেন : শাইখাইনের (বুখারী ও মুসলিম) শর্ত অনুযায়ী এর সনদ সহীহ।

www.waytojannah.com

আর মহানাবী (ﷺ) মুস্তাহাযার ব্যাপারে বলেন:

«إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»

এ তো ধমনি নির্গত রক্ত, হায়য নয়। তোমার যখন হায়য আসবে তখন সালাত ছেড়ে দিও। আর যখন তা বন্ধ হয়ে যাবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর সালাত আদায় করবে।[১৩৭]

বুখারীতে রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা বলেছেন:

«ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ»

তারপর এভাবে আরেক হায়য না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযূ করবে।[১৩৮]

আমি মনে করি: এটা ওযরের হুকুমের অন্তর্গত। এটা করা হয়ে থাকে জটিলতা দূর করার জন্য। আর শরীয়াতে উম্মতের উপর থেকে জটিলতা দূর করার বিধান এসেছে।
যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

অর্থাৎ: আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। (*সূরা বাকারাহ-১৮৬*)
ইমাম মালিক ও অন্যরা মনে করেন: এ ক্ষেত্রে ইসতিনজা ও ওযূ কোনটিই আবশ্যক নয়, যতক্ষণ না ওযূ নষ্টের অন্য কোন কারণ পাওয়া যায়।

আমার বক্তব্য: যারা ওযূ নষ্টের কারণ না পাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযূ আবশ্যক নয় বলে মনে করেন, তারা সম্ভবতঃ পূর্বোল্লেখিত হাদীসের- «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» "প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযূ করবে" অংশটিকে যঈফ মনে করেন। তবে বিশুদ্ধ মতামত হলো: প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযূ করতে হবে। যেমনটি হায়য অধ্যায়ে আলোচনা হবে।

---

[১৩৭] বুখারী হা/ ২২৮; মুসলিম হা/৩৩; প্রভৃতি, নাসাঈ (১/১৮৫ পৃঃ) "فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ و توضئى" শব্দ অতিরিক্ত করে "وَصَلِّي" এ শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এটা শায এর অন্তর্গত। নাসাঈ ও বাইহাক্বী (১/৩২৭) এটাকে মুয়াল্লাল বলেছেন। ইমাম মুসলিম এটাকে মুয়াল্লাল (ত্রুটিযুক্ত) হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইমাম বুখারী এর তাখরীজ করেন নি। দেখুন! মুস্তফা বিন আদাবী (আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করুন!) প্রণীত 'জামিউ আহকামুন নিসা' (১/২২৩-২২৬)।

[১৩৮] এটা মহানাবী (স.) এর মারফূ বাণী হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। অথবা আয়িশা থেকে বর্ণনাকারী রাবী উরওয়াহ বিন যুবাইরের উক্তি হতে পারে। এর দ্বারা তিনি সে মহিলাটিকে ফতওয়াহ দিয়েছেন যে মহিলাটি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিল, যেমনটি দারিমীতে বর্ণিত হয়েছে (১/১৯৯)। ফতহুল বারীতে (১/৩৩২) হাফেজ ১ম সম্ভবনার দিকে ধাবিত হয়েছেন। আর সুনানে (১/৩৪৪) ইমাম বাইহাকী (রহঃ) ২য় সম্ভবনার দিকেই মত প্রকাশ করেছেন। আমাদের শাইখ মুস্তফা বিন আদাবী (আল্লাহ তার হিফাযত করুন!) 'জামিউ আহকামুন নিসা' (১/২২৭) তে এটাকে প্রধান্য দিয়েছেন।

মল-মূত্র ত্যাগের বিধি

যে ব্যক্তি পেশাব অথবা পায়খানা করার ইচ্ছা করবে তার জন্য নিম্নোক্ত বিধিমালা মেনে চলা বাঞ্ছনীয়:

(১) জনসাধারণের সান্নিধ্য থেকে দূরে এবং আড়ালে যেতে হবে, বিশেষত খোলা জায়গা হলে:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى

জাবির (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমরা এক সফরে রাসূল (ﷺ) এর সাথে বের হলাম, রাসূল (ﷺ) মলমূত্র ত্যাগের জন্য এতদূর যেতেন যে, তাকে কেউ দেখতে পেত না।[১৩৯]

(২) আল্লাহর যিকর বা নাম লিখিত আছে এমন কোন জিনিস মলমূত্র ত্যাগকারীর সাথে নিয়ে যাবে না:[১৪০] যেমন- এমন আংটি যাতে আল্লাহর নাম লিখিত আছে অথবা অনুরূপ কিছু। কেননা ইসলামী শরীয়াতে আল্লাহর নামকে সম্মান করা জরুরী।
আল্লাহ বলেন:

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾

যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাক্বওয়া থেকেই (*সূরা হাজ্জ*-৩২)।
এ ব্যাপারে আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ»

অর্থাৎ: মহানাবী (ﷺ) যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন তার আংটিটি খুলে রাখতেন।[১৪১] কিন্তু হাদীসটি মুনকার। হাফেজ এ হাদীসটিকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। এ কথা সবারই জানা যে, মহানাবী (ﷺ) এর আংটিতে محمد رسول الله (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) কথাটি খোদিত ছিল।[১৪২]

আমি মনে করি: যদি আংটি বা অনুরূপ কিছুকে আবৃতকারী কোন কিছু দ্বারা আবৃত করে রাখা সম্ভব হয় তথা পকেটে বা অনুরূপ কিছুর মধ্যে, তাহলে তা নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করা বৈধ হবে। আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: চাইলে তা হাতের তালুর মধ্যে রেখে দিবে। যদি বাইরে রাখলে হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে তাহলে জরুরী প্রয়োজনে তা নিয়েই প্রবেশ করা বৈধ। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

(৩) পায়খানায় প্রবেশের সময় 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করবে ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে: এটা মলমূত্র ত্যাগের ঘরে প্রবেশের সময় এবং খোলা ময়দানে কাপড় তোলার সময় বলতে হবে।

---

[১৩৯] আবূ দাউদ হা/ ২, ইবনে মাজাহ হা/২৩৫ শব্দগুলো তার।
[১৪০] মাজমূ (২/৮৭), মুগনী (১/২২৭), আওসাত্ব (১/৩৪২)।
[১৪১] যঈফ ; আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।
[১৪২] বুখারী হা/৫৮৭২, মুসলিম হা/২০৯২, প্রভৃতি

www.waytojannah.com

রাসূল (ﷺ) বলেন:

«سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ»

অর্থাৎ: জিন ও মানুষের গোপন অঙ্গের মাঝে পর্দা হলো, যখন সে পায়খানায় প্রবেশ করবে তখন সে যেন বলে: «بِسْمِ اللَّهِ» অর্থাৎ: আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি।[১৪৩]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ

আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত: মহানাবী (ﷺ) যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ»

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও মহিলা জিন (-এর অনিষ্ট) হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৪৪]

(৪) পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা আগে ও বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রাখতে হবে:

এ ব্যাপারে আমি মহানাবী (ﷺ) এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোন দলীল পাই নি। তবে ইমাম শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) আস-সাইলুল জার্‌রার (السيل الجرار) গ্রন্থে (১/৪৬) তা উল্লেখ করেছেন। প্রবেশের সময় বাম পা আগে ও বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রাখার কারণ হলো, সম্মানিত কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা হয় আর অসম্মানিত কাজ বাম দিক থেকে শুরু করা হয়। এর প্রমাণ বর্ণিত আছে।

(৫) মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য বসার সময় ক্বিবলাকে সামনে বা পেছনে রাখবে না:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى

আবূ আইয়ূব আনসারী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন: যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও, তখন ক্বিবলার দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠও দিবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। আবূ আইয়ূব আনসারী (رضي الله عنه) বলেন: আমরা যখন সিরিয়ায় এলাম তখন পায়খানাগুলো ক্বিবলামুখী বানানো পেলাম। আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।[১৪৫]

কিন্তু ইবনে উমার (رضي الله عنه) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

«لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ»

অর্থাৎ: আমি একদিন আমাদের ঘরের ছাদের উপর উঠলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে দেখলাম বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দু'টি ইটের উপর তার প্রয়োজনে বসেছেন।[১৪৬] অর্থাৎ: যখন তিনি মদিনায় থাকা অবস্থায় বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাজাত সারছিলেন তখন কা'বা তার পিছনে ছিল।

---

[১৪৩] আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দেখুন 'সহীহুল জা'মে' ৩৬১১

[১৪৪] বুখারী হা/ ১৪২; মুসলিম হা/৩৭৫।

[১৪৫] বুখারী হা/ ৩৯৪; মুসলিম হা/২৬৪; প্রভৃতি

[১৪৬] বুখারী হা/১৪৫; মুসলিম হা/২৬৬, প্রভৃতি

Contents

আমার বক্তব্য: এ হাদীস দু'টি অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ চারটি প্রসিদ্ধ অভিমত পেশ করেছেন।[১৪৭]

১ম অভিমত: ক্বিবলাকে সামনে বা পেছনে রাখার নিষেধাজ্ঞা সাধারণভাবে করা হয়েছে। চাই তা প্রাচীর বেষ্টিত ঘর হোক বা খোলা ময়দান হোক। এটা ইমাম আবূ হানীফা, আহমাদ ও ইবনে হাযমের অভিমত। শাইখুল ইসলাম মতামতটিকে পছন্দ করেছেন। আর ইবনে হাযম তা নকল করেছেন: আবূ হুরাইরা, আবূ আইয়ূব, ইবনে মাসউদ, সোরাকাহ ইবনে মালিক, আত্বা, নাখঈ, সাওরী, আওযায়ী ও আবূ সাওর থেকে। তারা এ ব্যাপারে পূর্বোল্লেখিত আবূ আইয়ূব (رضي الله عنه) এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন।[১৪৮]
আর তারা ইবনে উমার (رضي الله عنه) এর হাদীসটির বিভিন্নভাবে জবাব দিয়ে থাকেন-

(ক) নিষিদ্ধ বিষয় বৈধ বিষয়ের উপর প্রাধান্য পাবে।

(খ) এখানে একথা বলা হয় নি যে, এটা ক্বিবলাকে সামনে বা পিছনে রাখার নিষেধাজ্ঞার পরের বিধান।

(গ) রাসূল (ﷺ) এর কর্ম উম্মতের জন্য সংশ্লিষ্ট বাণীর পরিপন্থি হয় না, তবে এটা ব্যতীত, যা এ মর্মে দলীল প্রদান করে যে, তিনি ঐ বিষয়ে তার অনুসরণের ইচ্ছা করেন। আর যদি তা না হয় তাহলে শুধু তার কর্ম তার সাথে নির্দিষ্ট হবে।

আমার বক্তব্য: শেষোক্ত কথাটির সমর্থনে বলা যায়, ইবনে উমার (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) কে ইচ্ছা ছাড়াই দেখেছিলেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল (ﷺ) যেন শরীয়াতের নতুন বিধান বর্ণনা না করারই ইচ্ছা করেছেন।

২য় অভিমত: এই নিষেধাজ্ঞা শুধু খোলা ময়দানের জন্য নির্দিষ্ট। প্রাচীরের মধ্যে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। এটা ইমাম মালিক ও শাফেঈ'র অভিমত। আহমাদ ও ইসহাক এর দু'টি অভিমতের একটি বিশুদ্ধ অভিমত। উভয় দলীলের মাঝে তারা সমন্বয় সাধন করে বলেন: নিয়ম হলো, কর্মের উপর কথা প্রাধান্য পায়। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বিষয়কে নির্ধারিত করা অবস্থায় এর উপর আমল করা হয়। এ ক্ষেত্রে তার কোন দলীল থাকে না।

৩য় অভিমত: ক্বিবলাকে সামনে করা ছাড়া শুধু পেছনে করা জায়েয আছে। এটা আবূ হানীফা ও আহমাদ থেকে বর্ণিত আছে। আবূ আইয়ূবের হাদীসের সাথে উমারের হাদীসটির প্রকাশ্য আমলের জন্য এটা করা হয়।

৪র্থ অভিমত: সাধারণভাবে ক্বিবলাকে সামনে ও পেছনে রাখা বৈধ। এটা আয়িশা, উরওয়াহ, রাবিয়াহ ও দাউদ এর অভিমত। তাদের দলীল হলো: হাদীসগুলো যেহেতু একটি অপরটির বিরোধী তাই মূলতঃ এটা বৈধ।

আমি মনে করি: প্রথমোক্ত কথাটি তথা সাধারণ ভাবে ক্বিবলাকে সামনে ও পেছনে করা হারাম, এটিই দলীলের দিক দিয়ে বেশি শক্তিশালী ও আমল করার দিক দিয়ে সতর্কতা মূলক। আল্লাহই ভাল জানেন।

---

[১৪৭] ইমাম নাববী মাজমূতে উল্লেখ করেছেন (২/৮২), হাফেজ তার ফতহুল বারীতে (১/২৯৬) আরও তিনটি মতামত উল্লেখ করেছেন।
[১৪৮] মুহাল্লা (১/১৯৪), ফাতফ (১/২৯৬), আল-ওয়াসত (১/৩৩৪), সাইলুল জার্‌রার (১/৬৯), ইখতিইয়ারাতুল ফিক্বহিয়্যাহ (৮)।

www.waytojannah.com

(৬) প্রয়োজন ছাড়া কোন কথা-বার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে:

«عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وهو يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ»

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেছেন): একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পেশাব করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে সালাম দিলে তিনি তার সালামের জবাব দিলেন না।[১৪৯]

সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজিব। অথচ মহানাবী (ﷺ) পেশাব করার সময় সালামের উত্তর দিলেন না। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, এ অবস্থায় কথা বলা হারাম। বিশেষত এ সময় আল্লাহর যিকর থেকে বিরত থাকবে। তবে একান্ত জরুরী কথা বলা যাবে। যেমন: কোন ব্যক্তিকে পথের সন্ধান দেয়া, পানি চেয়ে নেয়া অথবা অনুরূপ কিছু। এটা জরুরী ভিত্তিতে বৈধ। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

(৭) মানুষ চলাফেরা করার রাস্তায় বা যে সকল গাছের ছায়ায় মানুষ বিশ্রাম নেয় অথবা অনুরূপ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকবে:

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ»

আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: তোমরা এমন দু'টি কাজ হতে বিরত থাক যা অভিশপ্ত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই অভিশপ্ত কাজ দু'টি কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: যে ব্যক্তি মানুষের যাতায়াতের পথে কিংবা ছায়াযুক্ত স্থানে (বৃক্ষের ছায়ায় যেখানে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে) পেশাব পায়খানা করে।[১৫০]

(৮) গোসলখানায় পেশাব করা থেকে বিরত থাকবে: বিশেষত যে স্থানে পানি জমা হয়ে থাকে। যেমন: বাথটাব অথবা গোসলের চৌবাচ্চা বা অনুরূপ কিছু। মহানাবী (ﷺ) নিষেধ করেছেন, কোন ব্যক্তি যেন গোসল খানায় পেশাব না করে।[১৫১]

(৯) প্রবহমান নয় এমন আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা থেকে বিরত থাকবে:

«عَنْ جَابِرٍ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ»

জাবির (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন: নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) আবদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।[১৫২]

(১০) পেশাব করার সময় নরম ও নীচু জায়গা খুঁজে নিবে। শক্ত জায়গা নির্বাচন করবে না, যাতে নাপাকী শরীরে ছিটকে না আসে।

(১১) পূর্বোল্লেখিত ইসতিনজার বিধিমালা মেনে চলবে।

---

[১৪৯] সহীহ ; মুসলিম হা/৩৭০; আবূ দাউদ ১৬; তিরমিযী, নাসাঈ ১/১৫; ইবনে মাজাহ হা/ ৩৫৩

[১৫০] মুসলিম হা/ ২৬৯; আবূ দাউদ হা/ ২৫

[১৫১] সহীহ; নাসাঈ ১/১৩০; আবূ দাউদ হা/ ২৮।

[১৫২] সহীহ; মুসলিম হা/২৮১; নাসাঈ ১/৩৪।

(১২) মলমূত্র ত্যাগের পর বের হওয়ার সময় বলবে:

«غُفْرَانَكَ»

অর্থাৎ: হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই।

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ»

আয়িশা থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) মলমূত্র ত্যাগের পর বের হওয়ার সময় বলতেন: غُفْرَانَكَ ।[১৫৩]

কোন ব্যক্তির জন্য কি দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয?

এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ হতে ৫ টি হাদীস পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৩টি সহীহ। এর একটিতে আয়িশা (রা.) রাসূল (ﷺ) এর দাঁড়িয়ে পেশাব করাকে অস্বীকার করেছেন। ২য়টিতে রাসূল (ﷺ) এর দাঁড়িয়ে পেশাব করার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। আর ৩য়টিতে বসে পেশাব করার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। আর ২টি হাদীস যঈফ। তার একটিতে দাঁড়িয়ে পেশাব করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। অপরটিতে দাঁড়িয়ে পেশাব করাকে অহমিকার সাথে বিশেষিত করা হয়েছে।

হাদীসগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا

(১) আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তোমাদের মধ্যে যদি কেউ বলে যে, রাসূল (ﷺ) দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তাহলে তোমরা তা বিশ্বাস করো না।[১৫৪]

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: ادْنُهْ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ

(২) হুযাইফাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: একদিন আমি নাবী (ﷺ) এর সঙ্গে ছিলাম। এক সময় তিনি লোকজনের আবর্জনা ফেলার স্থানে পৌঁছলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। এ দেখে আমি কিছুটা দূরে সরে দাঁড়ালাম। কিন্তু তিনি আমাকে নিকটে আসতে বললেন। আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম। এমনকি একেবারে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি প্রয়োজন সেরে ওযূ করলেন এবং মোজার উপর মাসাহ করলেন।[১৫৫]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ، فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا، فَبَالَ إِلَيْهَا.

(৩) আব্দুর রহমান ইবনে হাসানাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) একদা আমাদের কাছে আগমন করলেন। তাঁর হাতে চামড়ার তৈরি ঢালের মত একটি বস্তু ছিল। তিনি তা স্থাপন করলেন। এরপর তার পেছনে বসলেন এবং সে দিকে ফিরে পেশাব করলেন।[১৫৬]

---

[১৫৩] হাসান লি গাইরিহী; তিরমিযী (৮) আবূ দাউদ হা / ৩০; আহমাদ ২/১৫৫।
[১৫৪] সহীহ লিগাইরিহী; তিরমিযী (১২), নাসাঈ ১/২৬ ইবনে মাজাহ হা/ ৩০৭, আহমাদ ৬/১৩৬।
[১৫৫] বুখারী হা/ ২২৬; মুসলিম হা/২৭৩; প্রভৃতি।
[১৫৬] সহীহ; আবূ দাউদ হা/ ২২, নাসাঈ ১/২৭; ইবনে মাজাহ হা/ ৩৪৬; আহমাদ ৪/১৯৬।

www.waytojannah.com

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: " رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ

(৪) ইবনে উমার (ﷺ) বর্ণনা করেন: উমার (ﷺ) বলেন, একদা রাসূল (ﷺ) আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখলে তিনি আমাকে বললেন: হে উমার! দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। উমার (ﷺ) বলেন, এর পর থেকে আমি আর কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করি নি।[১৫৭]

عن بريدة أن النبي ﷺ قال " ثلاثة من الجفاء: أن يبول الرجل قائما, أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته, أو ينفخ فى سجوده"

(৫) বুরাইদাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন: তিনটি কাজ অহমিকার অন্তর্ভুক্ত। দাঁড়িয়ে পেশাব করা, সালাত সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই কপাল মুছা ও সাজদার সময় ফুঁক দেয়া।[১৫৮]

আমার বক্তব্য: এ সমস্ত হাদীসগুলোর কারণে বিদ্বানগণ দাঁড়িয়ে পেশাব করার হুকুমের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়:[১৫৯]

১ম অভিমত: কোন ওযর ছাড়া দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ। এটা আয়িশা, ইবনে মাসউদ ও উমার এর দু'টি অভিমতের মধ্যে একটি অভিমত। আবূ মূসা, শা'বী, ইবনে উয়াইনা, হানাফী ও শাফেঈগণ এ অভিমত পোষণ করেছেন।

২য় অভিমত: এটা সাধারণভাবে জায়েয। উমার (ﷺ) অন্য এক বর্ণনা মতে এ অভিমত পোষণ করেছেন। আলী, যায়েদ বিন সাবিত, ইবনে উমার, সাহল ইবনে সা'দ, আনাস, আবূ হুরাইরা ও হুযাইফা (ﷺ) এ মতামত ব্যক্ত করেছেন। হাম্বালীগণ এ মতের অনুসারী।

৩য় অভিমত: যদি এমন নরম জায়গায় পেশাব করা হয় যেখান থেকে পেশাব শরীরে ছিটকে আসা সম্ভব নয় তাহলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যাবে। নচেৎ যাবে না। এটা ইমাম মালিকের অভিমত। ইবনে মুনযির এমতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আমার বক্তব্য: বিশুদ্ধ মতামত হলো, যদি পেশাব শরীরে ছিটকে এসে পড়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ নয়। এর কারণ নিম্নরূপ-

(১) এর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে মহানাবী (ﷺ) থেকে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না।

(২) মহানাবী (ﷺ) এর বসে পেশাব করাটা দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয হওয়াকে বাধা দেয় না। বরং উভয়টিই বৈধ হওয়াকেই সমর্থন করে।

(৩) মহানাবী (ﷺ) থেকে দাঁড়িয়ে পেশাব করার হাদীস সাব্যস্ত হয়েছে।

(৪) মূলতঃ আয়িশা এর পক্ষ থেকে মহানাবী (ﷺ) এর দাঁড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে যে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে তা ছিল তাঁর বাড়িতে থাকা অবস্থায়। তাই তিনি শুধু দাঁড়িয়ে পেশাব না করার ব্যাপারেই জানতেন। সুতরাং তা বাইরে দাঁড়িয়ে পেশাব করার ঘটনাকে না বোধক করে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকাটা কোন জ্ঞানকে না বোধক করে না। এ বিষয়ে হুযাইফাসহ অন্যরা জানতেন। সুতরাং, এটা যারা জানতেন না তাদের উপর প্রমাণ। আর হাঁ বোধক বিষয় না- বোধকের উপর প্রধান্য পায়। আল্লাহই ভাল জানেন!

---

[১৫৭] যঈফ: ইবনে মাজাহ ৩০৮; বায়হাক্বী ১/২০২; হাকেম ১/১৮৫; ইমাম তিরমিযী (রহঃ) মুয়াল্লাক্ব সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাকে যঈফ বলেছেন (আহওয়াযী ১/৬৭)।

[১৫৮] মুনকার; ইমাম বুখারী তারীখে (৪৯৬) উল্লেখ করেছেন, বায্যার (১/৫৪৭), ইমাম বুখারী ও তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। মূলতঃ এটা ইবনে মাসউদের উক্তি হিসেবে সাব্যস্ত।

[১৫৯] মাজমূ (২/৯৮), ওয়াসত (১/৩৩৩)।

Contents

স্বভাবজাত (ফিতরাত) সুন্নাতসমূহ

স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এবং সেগুলো কি কি?

স্বভাবজাত সুন্নাত হলো এমন রীতি যা সম্পাদন করলে এর সম্পাদনকারী এমন ফিতরাতের সাথে বিশেষিত হবেন যে ফিতরাতের উপর আল্লাহ তার বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করে তার হাশর-নাশর হবে। আল্লাহ তাদেরকে এর জন্য ভালবাসবেন। যেন তারা এর মাধ্যমে পূর্ণগুণের অধিকারী হতে পারে এবং আকৃতিগতভাবে মর্যাদা পায়। এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াত একমত যে, এটা একটি প্রাচীন সুন্নাত যা সকল নাবী পছন্দ করেছেন। এটি স্বভাবজাত বিষয়, যা সকল নাবী পছন্দ করেছেন।[১৬০]

স্বভাবজাত রীতি অনুসরণের মাধ্যমে দীনই ও দুনিয়াবী অনেক কল্যাণ রয়েছে। যেমন: এর ফলে সমুদয় দৈহিক গঠন সুন্দর থাকে এবং শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।[১৬১]

অতঃপর কতিপয় স্বভাবজাত সুন্নাত নিম্নে আলোচিত হলো:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الِاخْتِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ

(ক) আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন: স্বভাবজাত বিষয় ৫ টি। খাতনা করা, নাভীর নিচের লোম মুণ্ডন করা, গোঁফ খাটো করা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা।[১৬২]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ " قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ

(খ) আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: ১০ টি বিষয় স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। গোঁফ খাটো করা, দাঁড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, অঙ্গের গিরাসমূহ ঘষে মেজে ধৌত করা, বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা, নাভীর নিচের পশম মুণ্ডন করা, মলমূত্র ত্যাগের পর পানি ব্যবহার করা তথা ইসতিনজা করা। যাকারিয়া বলেন, মাস'আব বলেছেন: আমি দশ নম্বরটি ভুলে গেছি। সম্ভবতঃ তা হলো কুলি করা।[১৬৩]

---

[১৬০] নাইলুল আওতার (১/১০৯), আল্লামা আইনী প্রণীত উমদাতুল কারী (২২/৪৫)।

[১৬১] মানাভী প্রণীত ফাইযুল কাদীর (১/৩৮)।

[১৬২] সহীহ; বুখারী হা/ ৫৮৯১; মুসলিম হা/২৫৭।

[১৬৩] হাসান; মুসলিম হা/ ২৬১ আবূ দাউদ হা/ ৫২, তিরমিযী ৬/২৯ নাসাঈ ৮/১২৬; ইবনে মাজাহ হা/ ২৯৩;

www.waytojannah.com

এ দু'টি হাদীস থেকে বুঝা যায় স্বভাবজাত ফিতরাতসমূহ শুধু এই দশটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নিম্নে তা থেকে উল্লেখ করা হলো:

(১) খাতনা করা

(২) মলমূত্র ত্যাগের পর পানি ব্যবহার করা তথা ইসতিনজা করা

(৩) মিসওয়াক করা

(৪) নখ কাটা

(৫) গোঁফ খাটো করা

(৬) দাড়ি লম্বা করা

(৭) নাভীর নিচের পশম মুণ্ডন করা

(৮) বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা

(৯) বিভিন্ন অঙ্গের গিরাসমূহ ঘষে মেজে ধৌত করা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত গিরা যেগুলোতে ময়লা জমা হয়। যেমন: আঙ্গুলের গিরাসমূহ, কানের গোড়াসমূহ ইত্যাদি।

(১০) কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া।

খাতনা করা (الختان)

الختان বা খাতনার পরিচয় ও তার হুকুম:

الختان শব্দটি মাসদার। এর মূলবর্ণ ختن –আভিধানিক অর্থ কর্তন করা।

পরিভাষায়: পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ আবৃতকারী চামড়া ও নারীর যৌনাঙ্গের পর্দা (ভৌগলিক কারণে পর্দা বা হাইমেন মেমব্রেন অনেক মোটা হয়) কেটে দেয়াকে খাতনা বলে।[১৬৪]

খাতনা করার হুকুম: বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে তিনটি মতামত পেশ করেছেন।

(১) নারী পুরুষ সকলের খাতনা করা ওয়াজিব।

(২) উভয়ের জন্য খাতনা করা মুস্তাহাব।

(৩) পুরুষের জন্য ওয়াজিব ও নারীর জন্য মুস্তাহাব।

ইবনে কুদামা মুগনি গ্রন্থে (১/৮৫) বলেন: খাতনা করা পুরুষের জন্য ওয়াজিব। আর মহিলাদের জন্য সম্মানজনক কাজ। এটা তাদের প্রতি ওয়াজিব নয়। অনেক আলিম এ অভিমত পেশ করেছেন।
ইমাম নাববী মাজমূ গ্রন্থে (১/৩০১) বলেন: সঠিক মতামত হলো- যা ইমাম শাফেঈ দলীলসহ বর্ণনা করেছেন এবং অধিকাংশ (জমহুর) এ অভিমতকে অকাট্য বলে প্রমাণ করেছেন যে, এটা নারী-পুরুষ সকলের উপর ওয়াজিব।

---

[১৬৪] ইবনুল কাইয়্যিম প্রণীত তুহফাতুল মাওদূদ (১০৬-১৩২), মাজমূ (১/৩০১)।

Contents

আমার বক্তব্য: পুরুষের খাতনা করা নিম্নোক্ত কারণে ওয়াজিব:

(১) কেননা এটা ইবরাহীম (عليه السلام) এর রীতি। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: ইবরাহীম খলীলুর রহমান ৮০ বছর বয়সে তাঁর খাতনা করেছিলেন।[১৬৫]

মহান আল্লাহ তার রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) কে লক্ষ্য করে বলেন:

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

অর্থাৎ: তারপর আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি যে, তুমি মিল্লাতে ইবরাহীমের আনুগত্য কর, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না (*সূরা নাহল*-১২৩)।

(২) বর্ণিত আছে: একদা এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল (ﷺ) তাকে বলেন:

«أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ»

অর্থাৎ: তুমি তোমার দেহ থেকে কুফরীর চিহ্ন দূর কর এবং খাতনা কর।[১৬৬]

(৩) খাতনা করা মুসলমানদের নিদর্শন। এটা তাদের (মুসলমানদের) ইহুদি-খ্রিষ্টান থেকে পৃথককারী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সুতরাং অন্যান্য নিদর্শনের মত এটাও ওয়াজিব।

(৪) শরীরের কোন অংশ কাটা হারাম। আর হারাম জিনিস ওয়াজিব না হলে তা বৈধ হয় না। এটা ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমাদ এর অভিমত। ইমাম মালিক এ ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বন করেছেন। এমন কি তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি খাতনা করে নি, তার ইমামতি করা বৈধ হবে না এবং তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে না।

আবার অনেক ফক্বীহ্ ইমাম মালিক এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এটা সুন্নাত। কিন্তু এটা তার কাছে সুন্নাত হলেও তা পরিত্যাগ করা গুনাহের কাজ।[১৬৭]

মহিলাদের খাতনা:

শরীয়াতে মহিলাদের খাতনা করার বিধান রয়েছে। মহানাবী (ﷺ) বলেন:

«إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»

অর্থাৎ: যখন নারী-পুরুষ উভয়ের গোপনাঙ্গ একত্রিত হবে, তখন তাদের উপর গোসল ওয়াজিব হবে।[১৬৮]

---

[১৬৫] বুখারী হা/ ৬২৯৮; মুসলিম হা/ ৩৭০

[১৬৬] শাহেদ থাকার কারণে আলবানী এ হাদীসকে হাসান বলেছেন। আবূ দাউদ (৩৫৬), বাইহাক্বী (১/১৭২) এ হাদীসের সনদে দু'জন মাজহুল (অপরিচিত) রাবী ও বিচ্ছিন্নতা আছে। এ সত্ত্বেও এর কতিপয় শাহেদ (সমর্থক) হাদীস থাকার কারণে আলবানী হাসান বলেছেন। যা তার সহীহ আবূ দাউদ (৩৮৩), ইরওয়াউল গালীল (৭৯) এ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমি তা অবগত হতে পারি নি। ইমাম নাববী ও শাওকানী এ হাদীসকে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন।

[১৬৭] তুহফাতুল মাউদুদ- পৃ.১১৩

[১৬৮] সহীহ; আলোচ্য শব্দে ইবনে মাজাহ (৬১১) তে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আর সহীহাইনে এসেছে: "ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" এ শব্দে।

www.waytojannah.com

এখানে الختان শব্দটি দ্বারা নারী-পুরুষের যৌনাঙ্গের কর্তিত স্থানকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহিলারা খাতনা করতেন।

নারীদের খাতনা করার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তবে একটিও ত্রুটিমুক্ত নয়। তন্মধ্যে উম্মে আত্বীয়া বর্ণিত হাদীস:

أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَنْهكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

উম্মে আত্বীয়া হতে বর্ণিত, জনৈক মহিলা মদীনায় (মেয়েদের) খাতনা করাতো। নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, খাতনাস্থানের অংশ খুব বেশি কাটিও না। কেননা এটা (কম কাটার জন্য সঙ্গমের সময়) নারীর জন্য অধিক তৃপ্তিদায়ক এবং স্বামীর কাছে খুবই প্রিয়।[১৬৯]

অপর বর্ণনায় রয়েছে:

إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أضوأ للوجه وأحظى عند الزوج

অর্থাৎ: "যখন নারীদের খাতনা করবে, তখন একে বারে কেটে শেষ করে দিও না । কেননা এতে চেহারা উজ্জ্বল থাকবে এবং স্বামীর জন্য তা তৃপ্তিদায়ক হবে" ।[১৭০]

এ হাদীসগুলোর সনদ দুর্বল, যদিও আলবানী সিলসিলা সহীহাহ" গ্রন্থে (হাদীস নং ৭২২) সহীহ বলেছেন। ব্যাপারটি এরূপ হওয়ার ফলে এক দল বলেন: এসব হাদীস যঈফ হলেও পুরুষের ন্যায় মহিলাদের খাতনা করা ওয়াজিব। কেননা নারী-পুরুষ উভয়েই শরঈ বিধান পালনের ক্ষেত্রে সমান, যতক্ষণ না বিধানগতভাবে উভয়কে পৃথক করার দলীল বর্ণিত হয়। অথচ এরূপ দলীল বর্ণিত হয় নি।

আর অপর একদল বলেন: এটা মহিলাদের জন্য মুস্তাহাব ও সম্মানজনক কাজ। এটা ওয়াজিব নয়।[১৭১] আর নারী পুরুষের মাঝে পৃথক করার কারণ হলো, পুরুষদের খাতনা করায় অনেক কল্যাণ রয়েছে। এর ফলে সালাতের জন্য পবিত্র হওয়ার যে শর্ত রয়েছে তা রক্ষা পায়। কেননা পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের এ চামড়াটি যদি কাটা না হয়, তাহলে তাতে পেশাব অবশিষ্ট ও জমা হয়ে থাকে।

আর মহিলাদের খাতনা করার ফলে তাদের কামভাব হ্রাস পায়, অথচ এটা পরিপূর্ণ পাওয়াটা স্বাভাবিকতার দাবী। মূলতঃ তাদের কষ্ট দূর করার জন্য খাতনা করা হয় না।

আমার বক্তব্য: মহিলাদের খাতনার বিধান ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মাঝা-মাঝি। মহানাবী (ﷺ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, খাতনা করা পুরুষের জন্য সুন্নাত ও মহিলাদের জন্য সম্মান জনক কাজ।[১৭২] কিন্তু হাদীসটি যঈফ। যদি তা সহীহ হতো তাহলে দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব হতো। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

---

[১৬৯] **যঈফ; আবূ দাউদ** (৫২৭১) এবং তিনি একে যঈফ বলেছেন।

[১৭০] **মুনকার; খতীব** বাগদাদী প্রণীত আত তারীখ-(৫/৩২৭), জামি' আহকামুন নিসা (১/১৯)।

[১৭১] **এ পদ্ধতিটি ইবনু** উসাইমীন উল্লেখ করেছেন। যেমন এসেছে আল-মুমতি' (১/১৪৩) তে।

[১৭২] **যঈফ; আহমাদ** (৫/৭৫)।

মিসওয়াক করা (السواك)

السواك বা মিসওয়াকের পরিচয় এবং শরীয়াতে এর বিধান:

السواك শব্দটি ساك শব্দ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ: دلك বা ঘষা, মাজা, মর্দন করা ইত্যাদি।

পরিভাষায়: দাঁত থেকে হলুদ বর্ণ বা এ জাতীয় ময়লা দূর করার জন্য কাঠ বা গাছের ডাল ব্যবহার করাকে মিসওয়াক বলে।[১৭৩]

সবসময় মেসওয়াক করা মুস্তাহাব। যেমন আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ، النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন : তিনি বলেছেন যে, মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায়।[১৭৪]

নিম্নোক্ত সময়গুলোতে মিসওয়াক করা উত্তম বলে তাকিদ দেয়া হয়েছে:

১। ওযূর সময়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوضُوْءِ

আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট মনে না করতাম তাহলে আমি ওযূর সময় তাদের মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম।[১৭৫]

২। সালাতের সময়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট মনে না করতাম তাহলে আমি প্রত্যেক সালাতের সময় তাদের মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম।[১৭৬]

৩। কুরআন পাঠের সময়:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أُمِرْنَا بِالسِّوَاكِ وَقَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّى أَتَاهُ الْمَلَكُ فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ وَيَدْنُو ، فَلاَ يَزَالُ يَسْتَمِعُ وَيَدْنُو حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ ، فَلاَ يَقْرَأُ آيَةً إِلاَّ كَانَتْ فِى جَوْفِ الْمَلَكِ.

---

[১৭৩] নাইলুল আওতার (১/১০২)।
[১৭৪] সহীহ; নাসাঈ (১/৫০), আহমাদ (৬/৪৭, ৬২) প্রভৃতি।
[১৭৫] আহমাদ; তা বর্ণিত হয়েছে, সহীহ আল-জামে' (৫৩১৬)।
[১৭৬] সহীহ; বুখারী (৬৮১৩), মুসলিম (২৫২)।

আলী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদের মিসওয়াক করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা যখন কোন বান্দা সালাতে দাঁড়ায় তখন তার কাছে ফেরেশতা এসে তার পিছনে দাঁড়ায় ও কুরআন পড়া শুনতে থাকে এবং তার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমন কি ফেরেশতা তার মুখকে তেলাওয়াতকারীর মুখের সাথে লাগিয়ে দেয়। ফলে প্রত্যেক আয়াত ফেরেশতার পেটের ভিতর প্রবেশ করে।[১৭৭]

৪। গৃহে প্রবেশের সময়:

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ.

আল মিকদাম ইবনু শুরাইহ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কোন কাজ করতেন? তিনি বলেন, মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজা।

৫। রাতের সালাত আদায়ের সময়:

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

হুযাইফা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক দ্বারা ঘষে মুখ পরিষ্কার করতেন। তথা তার দাঁতগুলোকে মিসওয়াক দ্বারা ঘষতেন।[১৭৮]

মিসওয়াক করার জন্য 'আরাক' নামক গাছের ডাল ব্যবহার করা মুস্তাহাব। যদি তা না পাওয়া যায়, তাহলে দাঁত ও মুখ পরিষ্কার হয়ে যায় এমন কোন বস্তু ব্যবহার করা যথেষ্ট হবে। যেমন নির্দিষ্ট কোন পেষ্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করা। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা, বগলের লোম উপড়ানো ও নাভীর নিচের লোম মুণ্ডন করার জন্য কি নির্দিষ্ট সময় সীমা রয়েছে?

এ রীতিগুলোর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা বাঁধা নেই। বরং প্রয়োজন অনুযায়ী তা কাট-ছাঁট করবে। সুতরাং যে সময় তা কাট-ছাঁট করার প্রয়োজন হবে, সেটাই তার সময়। তবে চল্লিশ দিনের বেশি তা রেখে দেয়া উচিত নয়।

যেমন আনাস (رضي الله عنه) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

রাসূল (ﷺ) আমাদের জন্য গোঁফ খাটো করা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা ও নাভীর নিচের পশম মুণ্ডন করার জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা বেঁধে দিয়েছেন, আমরা যেন তা চল্লিশ রাতের বেশি ছেড়ে না রাখি।[১৭৯]

---

[১৭৭] আলবানী একে সহীহ বলেছেন; বাইহাক্বী (১/৩৮), সহীহা (১২১৩)।

[১৭৮] সহীহ: বুখারী (২৪৬), মুসলিম (২৫৫)।

[১৭৯] সহীহ: মুসলিম (২৫৭) ও অন্যান্য।

Contents

দাড়ি লম্বা করা

দাড়ি লম্বা করার হুকুম:

পুরুষের জন্য দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব। এর কারণ নিম্নরূপ:

১। মহানাবী (ﷺ) দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশটা ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানদূব (যা আমল করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে আর পরিত্যাগ করলে শাস্তি হবে না) অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কোন ইঙ্গিত এখানে নেই।

এ ব্যাপারে মহানাবী (ﷺ)এর বাণী হলো:

خالفوا المشركين : وفروا اللحى وأحفوا الشوارب

(দাড়ি ও গোফের ব্যাপারে) তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর। দাড়ি লম্বা কর এবং গোঁফ ছোট কর।[১৮০]

তিনি আরও বলেন:

جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس

'তোমরা গোঁফ কাট এবং দাড়ি লম্বা কর আর অগ্নি পূজকদের বিরোধিতা কর'।[১৮১]

২। দাড়ি মুণ্ডন করা কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমনটি পূর্বোল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে।

৩। দাড়ি কর্তন করলে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করা হয় এবং শয়তানের আনুগত্য করা হয়।

আল্লাহর বাণী:

﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾

অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে *(সূরা নিসা-১১৯)*।

৪। দাড়ি মুণ্ডন করলে নারীদের সাদৃশ্য হয়ে যায়। যে সব পুরুষেরা নারীর সাদৃশ্য গ্রহণ করে; আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাদের প্রতি অভিশাপ করেছেন।[১৮২]

এজন্য শাইখুল ইসলাম বলেন: দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম।[১৮৩] ইবনে হাযম ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন: দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম, এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে।[১৮৪]

এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি ছাঁটা জায়েয আছে কি?

কতিপয় বিদ্বানের মতে: এক মুষ্টি দাড়ি রেখে বাকি অংশ কেটে ফেলা জায়েয আছে। তারা ইবনে উমার (رضي الله عنه) এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন।

---

[১৮০] সহীহ; বুখারী (৫৮৯২), মুসলিম (২৫৯)।
[১৮১] সহীহ; মুসলিম (২৬০)।
[১৮২] বুখারী (৫৮৮৫), তিরমিযী (২৯৩৫)।
[১৮৩] ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ (পৃ. ১০) আলাউদ্দীন আল-বা'লী প্রণীত। আল-ফুরু' (১/২৯১) 'ইবনু মুফালিহ' প্রণীত।
[১৮৪] মারাতীবুল ইজম', রাদ্দুল মুহতার-(২/১১৬)।

www.waytojannah.com

كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ»

ইবনে উমার (ﷺ) যখন হাজ্জ ও উমরা করতেন তখন তার দাড়ি ধরে অতিরিক্ত অংশ ছেঁটে ফেলতেন।[১৮৫] তারা বলেন: তিনি (উমার) দাড়ি লম্বার নির্দেশ দেয়া হাদীসের রাবী। সুতরাং তিনিই তার বর্ণনা সম্পর্কে বেশি বুঝেন।

এই আসারের মাধ্যে তাদের কোন দলীল নেই।[১৮৬] কেননা-

(১) ইবনে উমার এটা হাজ্জ ও উমরা থেকে হালাল হওয়ার পর করেছিলেন। অথচ সেটাকে তারা সর্বাবস্থার জন্য বৈধ মনে করেন।

(২) ইবনে উমার (ﷺ) একাজটি আল্লাহর বাণী- مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ অর্থাৎ: তোমাদের মাথা মুণ্ডন করে এবং চুল ছেঁটে (নির্ভয়ে মাসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে) (*সূরা : ফাতাহ*-২৭)। এ আয়াতটির উপর তা'বীল (ব্যাখ্যা) করে এমন করেছেন। অর্থাৎ: হাজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন করতে হবে, আর দাড়ি ছোট করতে হবে।[১৮৭]

(৩) সাহাবাগণ যখন তাদের বর্ণনার বিপরীত কিছু বলেন বা করেন, তখন যা বর্ণনা করেছেন তাই গ্রহণ করতে হয়। তাদের বোধগম্যতা ও কর্ম ধর্তব্য নয়। বরং মহানাবী (ﷺ) এর দিকে সম্পৃক্ত বিষয়টিই ধর্তব্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বিশুদ্ধ মতামত হলো, দাড়ি ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব। অনেক সহীহ হাদীসে দাড়ি লম্বা করার ব্যাপারে সাধারণভাবে নির্দেশ দেয়ার ফলে তা কাট-ছাঁট করা যাবে না।

হাদীসে বিভিন্ন শব্দে এ নির্দেশগুলো বর্ণিত হয়েছে। যেমন: أعفوا তথা লম্বা হতে দাও, أرخوا তথা ছেড়ে দাও, أرجوا তথা অবকাশ দাও, وفروا তথা পূর্ণ বা বেশি হতে দাও, أوفوا সম্পূর্ণ কর। অধিকাংশ বিদ্বান এ অভিমত পোষণ করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

---

[১৮৫] সহীহ: বুখারী (৫৮৯২), মুসলিম (২৫৯)।
[১৮৬] ইহা শাইখ আল-হাবীহ ওয়াহিদ আঃ সালাম তাঁর আল ইকলিল (১/৯৬) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
[১৮৭] দেখুন! শারহুল কিরমানী আলাল বুখারী (২১/১১১)।

Contents

ত্বহারাতে হুকমিয়্যাহ বা বিধানগত পবিত্রতার বর্ণনা

পানির প্রকারভেদঃ পানি বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। তবে তা নিম্নোক্ত দু'প্রকারের বাইরে নয়। যথাঃ

১। সাধারণ পানি (পবিত্র পানি):

এ প্রকার পানি তার সৃষ্টিগত মৌলিকতার উপর বজায় থাকে। এটা ঐ সমস্ত পানি যা ভূমি থেকে উদ্ভূত হয় অথবা আকাশ থেকে বর্ষিত হয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾

অর্থাৎঃ তিনি আকাশ হতে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন। (*সূরা আনফাল-১১*)

এ প্রকার পানির অন্তর্ভুক্ত হলোঃ নদীর পানি, বরফগলা পানি, তুষারের পানি ও কুপের পানি। এমনকি তাতে পানি দীর্ঘ সময় থাকার কারণে যদি তার পরিবর্তন ঘটে অথবা এমন পবিত্র বস্তু মিশে যায় যা তা থেকে দূর করা সম্ভব নয় তবুও তা এ প্রকার পানির অন্তর্ভুক্ত হবে।

অনুরূপভাবে সাগরের পানি। মহানাবী (ﷺ) কে সাগরের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

অর্থাৎঃ সাগরের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী (মাছ ইত্যাদি) খাওয়া হালাল।[১৮৮]

আলিমদের ঐকমত্যেঃ এ প্রকার পানি দ্বারা ওযূ, গোসল করা বৈধ। যদি তাতে পবিত্র বস্তু মিশ্রিত হয়, তাহলে পানি পদবাচ্য থাকা পর্যন্ত তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ হবে। উম্মে হানী (রা.) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

উম্মে হানী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও মায়মূনা (রা.) একই পাত্রে গোসল করতেন, তা এমন পাত্র ছিল যাতে আটার খামিরের চিহ্ন ছিল।[১৮৯]

যে সমস্ত মহিলারা মহানাবী (ﷺ) এর কন্যা যায়নাব (রা.) কে গোসল করিয়েছিলেন, তাদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ

اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا

তোমরা তাকে তিনবার, পাঁচবার কিংবা চাইলে এরচেয়ে অধিকবার বরই পাতা দিয়ে গোসল দাও এবং শেষবার কর্পূর ব্যবহার করবে।[১৯০]

আর পানিতে পবিত্র বস্তু মিশ্রিত হওয়ার ফলে যদি পানি নাম থেকে অন্য কোন নামে পরিচিতি লাভ করে যেমন চা, তাহলে এ দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ হবে না। অনুরূপভাবে সে বস্তু দ্বারা অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন বৈধ হবে না, যে বস্তু অন্য কোন পবিত্র বস্তু থেকে প্রস্তুতকৃত। যেমনঃ গোলাপের পানি,

---

[১৮৮] সহীহ; আবূ দাউদ (৮৩), তিরমিযী (৬৯), নাসাঈ (১/১৭৬) ইবনে মাজাহ (৩৮৬)।

[১৮৯] সহীহ; নাসাঈ (২৪০), ইবনে মাজাহ (৩৭৮)।

[১৯০] সহীহ; বুখারী (১২৫৩), মুসলিম (৯৩৯)।

www.waytojannah.com

ইত্যাদি। কেননা এগুলো প্রকৃত পক্ষে পানি নয়। ইবনুল মুনযির বলেন,[১৯১] আমি বিদ্বানগণের অভিমত তদন্ত করে দেখেছি যে, সর্বাধিক অভিমত হলো: গোলাপের পানি, গাছের পানি ও স্প্রে থেকে নির্গত সুগন্ধিযুক্ত তরল পানি দ্বারা ওযূ জায়েয নয়। সাধারণ পানি পদবাচ্য ছাড়া পবিত্রতা অর্জন বৈধ নয়।

২। নাপাক পানি:

এটা এমন পানি যাতে নাপাক জিনিসের মিশ্রণ ঘটে এবং তার কোন একটি বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়, ফলে তার রং গন্ধ অথবা স্বাদের পরিবর্তন ঘটে এবং ব্যবহারকারী ধারণা করে যে, সে নাপাক পানি ব্যবহার করছে। এ প্রকার পানি দ্বারা ওযূ করা বৈধ নয়। কেননা এটা নিজেই নাপাক।

ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ঝরে পড়া পানি দ্বারা ওযূ করার বিধান:

ওযূকারীর অঙ্গ থেকে ঝরে পড়া পানি বা অনুরূপ পানিকে الماء المستعمل বা ব্যবহৃত পানি বলে। এ প্রকার পানি পবিত্রতা দানকারী পানি থেকে ব্যতিক্রম, না ব্যতিক্রম নয়, এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন।

বিশুদ্ধ মতামত হলো: যতক্ষণ পর্যন্ত তা সাধারণ পানি পদবাচ্য থাকে এবং এমন নাপাকী মিশ্রিত না হয় যাতে পানির বৈশিষ্ট্য সমূহে কোন প্রভাব পড়ে (অর্থাৎ: রং, গন্ধ ও স্বাদ অবিকৃত থাকে), ততক্ষণ তা পবিত্রকারী থাকবে। এটা আলী ইবনে আবি তালিব, ইবনে উমার, আবূ উমামা ও সালফে সালেহীনের একটি দলের অভিমত। ইমাম মালিক (রাহি.) এর প্রসিদ্ধ মতামত এটাই। ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ (রাহি.) তাদের দু'টি রিওয়ায়াতের একটিতে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে হাযম ও ইবনুল মুনযিরও এ মতামতের প্রবক্তা। শাইখুল ইসলাম এ অভিমতটি পছন্দ করেছেন।[১৯২] নিম্নোক্ত বাণীগুলো এ অভিমতকে শক্তিশালী করে:

(১) **মৌলিকভাবেই পানি পবিত্র**। তাকে কোন জিনিস অপবিত্র করতে পারে না। মহনাবী (ﷺ) বলেন, **الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ অর্থাৎ:পানি পবিত্র**। তাকে কোন জিনিস অপবিত্র করতে পারে না।[১৯৩] তবে তার **কোন একটি বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হলে অথবা পবিত্র বস্তু মিশ্রণের ফলে তা সাধারণ পানি পদবাচ্য থেকে বহির্ভূত হলে তা নাপাক হয়ে যাবে**।

(২) **সাহাবাগণ মহানাবী (ﷺ)** এর ওযূর অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতেন বলে প্রমাণিত:

(الف) عن أَبِي جُحَيْفَةَ، قالُ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ

---

[১৯১] **আল-মুগনী** (১/১১), আল মুহাল্লা (১/১৯৯)।

[১৯২] **আল-মুগনী** (১/৩১), আল মাজমু' (১/২০৫), আল-মুহাল্লা (১/১৮৩), মাজমু' আল-ফাতাওয়া (২০/৫১৯), আল-আউসাত (১/২৮৫)।

[১৯৩] **হাসান; আবূ দাউদ** (২৬৬), তিরমিযী (৩৬), নাসঈ (১/১৭৪)।

www.waytojannah.com

Contents

(ক) আবূ যুহাইফা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একবার দুপুরে নাবী (ﷺ) আমাদের সামনে বেরিয়ে এলেন। তাকে ওযূর পানি এনে দেয়া হলো। তখন তিনি ওযূ করলেন। লোকেরা তার ওযূর ব্যবহৃত পানি নিয়ে গায়ে মাখতে লাগল।[১৯৪]

হাফেয ফাতহ গ্রন্থে (১/৩৫৩) বলেন: সম্ভবতঃ সাহাবাগণ মহানাবী (ﷺ) এর ওযূর অঙ্গ থেকে ঝরে পড়া পানি গ্রহণ করতেন। এর মাধ্যমেই ব্যবহৃত পানি পবিত্র হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যায়।

(খ) মিসওয়ার বিন মুখরামাহ এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ-অর্থাৎ: নাবী (ﷺ) যখন ওযূ করতেন তখন তার ব্যবহৃত পানির উপর তারা (সাহাবায়ে কেরাম) যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তেন।[১৯৫]

عن أَبِي مُوسَى: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا

অর্থাৎ: আবূ মুসা আল-আশআরী (رضي الله عنه) বলেন: নাবী (ﷺ) একটি পাত্র আনতে বললেন, যাতে পানি ছিল। তারপর তিনি তার মধ্যে উভয় হাত ও চেহারা মুবারাক ধৌত করলেন এবং তার মধ্যে কুলি করলেন। তারপর তাদের দু'জন {আবূ মুসা (রা.) ও বিলাল (রা.)} কে বললেন: তোমরা এ থেকে পান কর এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে ঢাল।[১৯৬]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا

(৩) ইবনে উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ এর যামানায় পুরুষ এবং মহিলা একত্রে ওযূ করতেন।[১৯৭]

অপর বর্ণনায় রয়েছে-

كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنَا

অর্থাৎ: আমরা পুরুষ ও মহিলারা রাসূল (ﷺ) এর যামানায় একসাথে এক পাত্রে ওযূ করতাম এবং এ সময় কখনও কখনও একের হাত অপরের সাথে লেগে যেত।

عنابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন: রাসূল (ﷺ) তার স্ত্রী মাইমূনাহ এর গোসলের পর অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করতেন।[১৯৮]

عَنِ الرُّبَيِّعِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ

---

[১৯৪] সহীহ; বুখারী (১৮৭)।

[১৯৫] সহীহ; বুখারী (১৮৯)।

[১৯৬] সহীহ; বুখারী (১৮৮)।

[১৯৭] সহীহ; বুখারী (১৯৩); আবূ দাউদ (৭৯), নাসাঈ (১/৫৭) ইবনে মাজাহ (৩৮১), এখানে পরের অংশটি আবু দাউদে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

[১৯৮] সহীহ; মুসলিম (৩২৩) এ হাদীসটি সহীহাইনে এসেছে "كانا يغتسلان من إناء واحد" এ শব্দে।

www.waytojannah.com

Contents

(৫) রুবাই বিনতে মুয়াব্বিয (রা.) হতে বর্ণিত: নাবী কারীম (ﷺ) তার হাতের অতিরিক্ত পানি দ্বারা মাথা মাসাহ করেন।[১৯৯]

(৬) ইবনে মুনযির 'আওসাত্ব' গ্রন্থে (১/২৮৮) বলেন: বিদ্বানগণের ঐকমত্যে, ওযূকারী ও গোসলকারীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে ও কাপড় থেকে ঝরে পড়া পানি পবিত্র। সুতরাং এ অভিমতটি ব্যবহৃত পানি পবিত্র হওয়া প্রমাণ করে। অতএব তা যেহেতু পবিত্র তাই তা দ্বারা ওযূ নাজায়েয বলা যাবে না। যারা এর বিপরীত মন্তব্য করেন, তাদের উপযুক্ত প্রমাণ থাকতে হবে।
অপর একদল আলিম বলেন: ব্যবহৃত পানি দ্বারা ওযূ বৈধ নয়। এটা ইমাম মালিক, আওয়ায়ী ও ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এর দু'টি অভিমতের একটি অভিমত। 'আসহাবে রায়' এ অভিমতই পোষণ করেছেন।[২০০] কিন্তু তাদের উপযুক্ত এমন কোন প্রমাণ নেই যার উপর নিশ্চিত হওয়া যায়। সুতরাং প্রকৃত দাবীর দিকে ফিরে যাওয়াই উচিত।

মহিলাদের ব্যবহার করা অতিরিক্ত পানি দিয়ে পুরুষদের গোসল করা বৈধ কি না

মহিলাদের ওযূ বা গোসলের অতিরিক্ত পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জনের বিধানের ব্যাপারে আলিমগণের মাঝে দু'টি অভিমত লক্ষ করা যায়:

১ম মতামত: মহিলাদের ব্যবহৃত অতিরিক্ত পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ নয়। এটা ইবনে উমার, আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস, উম্মুল মুমিনীন জুয়ায়রিয়্যাহ বিনতে হারিস, হাসান, আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ইসহাক্ব, শাবী ও দাউদ জাহেরী এর অভিমত।[২০১]
তাদের দলীল হলো:

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْأَقْرَعُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

(১) হাকাম হতে বর্ণিত: নাবী কারীম (ﷺ) মহিলাদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা পুরুষদের ওযূ করতে নিষেধ করেছেন।[২০২]

عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ أَرْبَعَ سِنِينَ، كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، زَادَ مُسَدَّدٌ: «وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا»

(২) হুমায়েদ আল-হিময়ারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করি, যিনি চার বছর যাবৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর খেদমতে ছিলেন- যে ভাবে আবূ হুরাইরা রাসূলের খেদমত করতেন। তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) মহিলাদেরকে পুরুষদের অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল করতে নিষেধ

---

[১৯৯] হাসান; আবূ দাউদ (১৩০), আদ-দারাকুতবী (১/৮৭)।
[২০০] আল-ইস্তিযকার (১/২৫৩), আত-তামহীদ (৪/৪৩), আলমুগনী (১/১৯), আল-আউসাত (১/২৮৫)।
[২০১] আল-আউসাত (১/২৯২), আল-মুগনী (১/২৮২)।
[২০২] আইম্মায়ে কেরাম এর ত্রুটি বর্ণনা করেছেন; আবূ দাউদ (৮২) তিরমিযী (৬৪), নাসাঈ (১/১৭৯), ইবনে মাজাহ (৩৭৩), আহমাদ (৫/৬৬) ইমাম বুখারী, দারাকুত্বনী ও নাববী এর ত্রুটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনে হাজার আসকালানী ও আলবানী একে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আল-ইরওয়া (১/৪৩)।

www.waytojannah.com

করেছেন এবং একইভাবে পুরুষদেরকে মহিলাদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল করতে নিষেধ করেছেন। মুসাদ্দাদ এর সঙ্গে যোগ করেছেন যে, নারী-পুরুষ একসাথে একই পাত্র হতে হাত দিয়ে পানি উঠানো নিষেধ।[২০৩]

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ

(৩) আলী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত: রাসূল (ﷺ) এবং তার পরিজন একই পাত্রে গোসল করতেন। তবে তাদের একজন অপরজনের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন না।[২০৪]

২য় অভিমত: মহিলাদের ব্যবহৃত, অতিরিক্ত পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন বৈধ। এটা উমার, আবূ হুরাইরা, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসসহ সালফে সালেহীনের একটি দলের অভিমত। আবূ ওবাইদ ও ইবনুল মুনযিরও এ মতামত ব্যক্ত করেছেন। এটা ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও শাফেঈ (রাহি.) এর মাযহাব। একটি বর্ণনা মতে আহমাদও এ মতামত ব্যক্ত করেছেন।[২০৫] তাদের দলীল হলো:

عن ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, রাসূল (ﷺ) তার স্ত্রী মাইমূনাহ এর গোসলের পর অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করতেন।[২০৬]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ: لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ

(২) ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: একদা নাবী কারীম (ﷺ) এর কোন এক স্ত্রী বড় একটি পাত্রের পানি দ্বারা গোসল করছিলেন। এমতাবস্থায় নাবী করীম (ﷺ) সেখানে ওযূ অথবা গোসল করার জন্য আগমন করলেন। তখন তিনি (পত্নী) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি অপবিত্র ছিলাম। জবাবে রাসূল (ﷺ) বললেন: নিশ্চয়ই পানি অপবিত্র হয় না।[২০৭]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ وفى رواية نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا

(৩) আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ও নাবী জানাবাত অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম । অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আমরা অঞ্জলিপূর্ণ করে তা থেকে একই সাথে পানি নিতাম।[২০৮]

---

[২০৩] এ হাদীসের সনদ সহীহ; আবূ দাউদ (৮০), নাসাঈ (১/১৩০) বাইহাকী (১/১৯০)।

[২০৪] যঈফ; ইবনে মাজাহ (১/১৩৩)।

[২০৫] মুসান্নাফ আঃ রাযযাক (১/১১০), ইবনে আবী শায়েবাহ (১/৩৮) আল-আউসাত্ব (১/২৯৭), আবূ উবাইদ এর আত-ত্বহুর (২৩৬) আল মাসবূত্ব (১/৬১), আল-উম্ম (১/৮), আল-মুগনী (১/২৮৩)।

[২০৬] সহীহ; এর তাহক্বীক পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

[২০৭] আবূ দাউদ (৬৮), তিরমিযী (৬৫), নাসাঈ (১/১৭৩) ইবনে মাজাহ (৩৭০), কতিপয় উলামা সিমাক এর ইকরামার সূত্রে বর্ণিত বেওয়ায়াত এর ত্রুটি বর্ণনা করে। এ রেওয়ায়াতটিকে 'মুযতারিব' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে এ মন্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা শু'বা তার থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। এ ছাড়া তিনি তার ওস্তাদদের বর্ণিত হাদীসকে সহীহ মনে করেন। (আল্লাহই অধিক অবগত)।

[২০৮] সহীহ; বুখারী (২৯৯), মুসলিম (৩২১)।

Contents

বিশুদ্ধ মতামত:

যারা ১ম মতামত অনুযায়ী মহানাবী (ﷺ) এর সাথে চার বছর অবস্থান করা ব্যক্তির হাদীসকে সঠিক মনে করেন, তাদের সে হাদীসের ব্যাপারে ইমাম বাইহাক্বী নেতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি প্রকাশ করেছেন এবং ২য় অভিমতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দু'ভাবে এ দলীলগুলোর মাঝে সমতা আনয়ন করা সম্ভব:[২০৯]

(১) নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলোকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ঝড়ে পড়া পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করবে। আর জায়েযের হাদীসগুলোকে পাত্রে অবশিষ্ট থাকা পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করবে। ইমাম খত্ত্বাবী এ ভাবেই সমাধান দিয়েছেন।

(২) দু'টি বৈধ হওয়া সত্ত্বেও সতর্কতার জন্য নিষেধাজ্ঞার বিধান দেয়া হয়েছে।

আমার বক্তব্য: সম্ভবতঃ ২য় অভিমতটিই উত্তম। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ওযূ (الوضوء)

ওযূর সংজ্ঞা ও এর শারঈ প্রমাণ:

ওযূ এর আভিধানিক অর্থ : وضوء শব্দটি الوضائة শব্দ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ: পরিচ্ছন্নতা ও উজ্জ্বলতা وضوء শব্দের واو বর্ণে পেশ পড়লে, তখন তা فعل (ক্রিয়া) এর অর্থ দিবে। আর واو বর্ণে যবর পড়লে, এর অর্থ হবে: ওযূর পানি এবং সেটা مصدر (ক্রিয়ামূল)ও হবে অথবা এ দু'টি আলাদা শব্দও হতে পারে।[২১০]

পরিভাষায়: সালাত অথবা অনুরূপ ইবাদাত থেকে বাধা প্রদান করে, এমন অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা মুখ, দু'হাত, মাথা ও দু'পায়ে পানি ব্যবহার করার নাম ওযূ।

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা ওযূ শারঈভাবে প্রমাণিত। যথা:

(ক) কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

অর্থাৎ: হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত কর (*সূরা মায়েদা*-৬)।

(খ) হাদীসে বলা হয়েছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

(১) আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তির বায়ু নির্গত হয় তার সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে ওযূ করে।[২১১]

---

[২০৯] **ফতহুল** বারী (১/৩০০), সুবুলস সালাম (১/২৮), নাইলুল আওতার (১/২৬)।

[২১০] **আল-কামুস** (১/৩৩), মুখতারুস সিহাহ (৫৭৫), আল-মাজমু' (১/৩৫৫)।

[২১১] **সহীহ;** বুখারী (১৩৫), মুসলিম (২২৫) প্রভৃতি।

www.waytojannah.com

عَنْ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

(২) ইবনে উমার (رضي الله عنه) বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল হয় না এবং আত্নসাৎ বা খিয়ানতের সম্পদ থেকে সাদকা কবুল হয় না।[২১২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ

(৩) ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: আমাকে তো সালাত আদায়ের সময় ওযূ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[২১৩]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

আবূ সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন: সালাতের চাবি হলো পবিত্রতা (অর্থাৎ ওযূ বা গোসল) এর তাকবীর পার্থিব যাবতীয় কাজকে হারাম করে এবং সালাম (অর্থাৎ সালাম ফিরানো) যাবতীয় ক্রিয়া কর্মকে হালাল করে দেয়।[২১৪]

(গ) আর এ ব্যাপারে ইজমা হলো: উম্মতের সকল আলিম এ বিষয়ে একমত যে, পবিত্রতা অর্জনে সক্ষম হলে পবিত্রতা ব্যতীত সালাত কবুল হবে না।[২১৫]

ওযূর ফযীলত:

১। এটাকে ঈমানের অর্ধেক হিসাবে গণ্য করা হয়:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

আবূ মালিক আশআ'রী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।[২১৬]

২। ওযূ ছোট-ছোট পাপগুলো মোচন করে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ – أَوِ الْمُؤْمِنُ – فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ – أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ –، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ –، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ – أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ – حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ

---

[২১২] সহীহ; মুসলিম (২২৪)।
[২১৩] সহীহ; তিরমিযী (১৮৪৮), আবূ দাউদ (৩৭৬০), নাসাঈ (১/৭৩) সহীহুল জামে' (২৩৩৩)।
[২১৪] হাসান লিগাইরহী; তিরমিযী (৩), আবূ দাউদ (৬০), ইবনে মাজাহ (২৭৫), আলবানী তার সহীহুল জামে' (৫৭৬১) গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।
[২১৫] "আল আউসাত্ব" (১/১০৭) ইবনু মুনযির প্রণীত।
[২১৬] সহীহ; মুসলিম (২২৩) প্রভৃতি।

Contents

(ক) আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন: কোন মুসলিম বান্দা ওযূর সময় যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত গুনাহ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন) পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে দু'খানা হাত ধৌত করে তখন তার দু'হাতের স্পর্শের মাধ্যমে সব গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে পা দু'খানা ধৌত করে, তখন তার দু'পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত সব গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়, এভাবে সে যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।[২১৭]

عَنْ عُثْمَانَ،: إِنَّ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

(খ) উসমান (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করবে তার পূর্বকৃত সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ফলে তার সালাত ও মাসজিদে যাওয়া অতিরিক্ত আমল হিসেবে গণ্য হবে।[২১৮]

যে ব্যক্তি এ ওযূ করার পর ফরয ও নফল সালাত আদায় করবে তার জন্য ফযীলত ও সাওয়াবের তা'কীদ দেয়া হয়েছে। যেমন:

(গ) উসমান (رضي الله عنه) এর হাদীসে আছে, তিনি রাসূল (ﷺ) এর ওযূর বিবরণের হাদীসে বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করার পর একাগ্র চিত্তে দু'রাক'আত সালাত পড়বে এবং এ সময় অন্য কোন ধারণা তার অন্তরে উদয় হবে না। তাহলে তার পূর্বকৃত সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[২১৯]

৩। ওযূর দ্বারা বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন: আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ জানাবো না, যা করলে আল্লাহ (বান্দাহর) গুনাহসমূহ মাফ করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল আপনি বলুন। তিনি বললেন: কষ্টকর অবস্থায়ও পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ করা, সালাতের জন্য মাসজিদে বারবার যাওয়া এবং এক সালাতের পর আর এক সালাতের জন্য প্রতীক্ষা করা; আর এ কাজগুলোই হলো সীমান্ত প্রহরা।[২২০]

---

[২১৭] **সহীহ: মুসলিম** (২৪৪) প্রভৃতি।
[২১৮] **সহীহ: মুসলিম** (২২৯) প্রভৃতি।
[২১৯] **সহীহ: বুখারী** (৬৪৩৩), মুসলিম (২২৬) প্রভৃতি।
[২২০] **সহীহ: মুসলিম** (২৫১) প্রভৃতি।

www.waytojannah.com

৪। জান্নাত যাওয়ার পথ সুগম করে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلاَلٍ: عِنْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ

(ক) আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) একদিন ফযরের সালাতের সময় বেলাল (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে বিলাল তুমি ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক কি আমল করেছে, তার কথা আমার নিকট ব্যক্ত কর। কেননা জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল (রাঃ) বলেন, দিন রাতের যে কোন প্রহরে আমি ত্বহারাত অর্জন করেছি, তখনই সে ত্বহারাত দ্বারা আমি সালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাকদিরে লেখা ছিল। আমার কাছে এর চাইতে (অধিক) আশাব্যঞ্জক, এমন কোন বিশেষ আমল আমি করি নি।[২২১]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

(খ) উকবা ইবন আমীর জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুলল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে তারপর দু'রাক'আত সালাত নিষ্ঠার সাথে আদায় করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[২২২]

৫। এটা এমন একটা নিদর্শন যার দ্বারা হাওযে কাওসারের নিকট উপস্থিত হওয়ার সময় উম্মতকে পৃথক করা হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبَرَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا "

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (ﷺ) কবরস্থানে গিয়ে বললেন: তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, এটা তো ঈমানদারদের কবর স্থান। ইনশা আল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমার মনে আমাদের ভাইদের দেখার আকাঙ্ক্ষা জাগে। যদি আমরা তাদেরকে দেখতে পেতাম। সাহাবাগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমরা কি আপনার ভাই নই? জবাবে তিনি বললেন:

---

[২২১] বুখারী (১১৪৯), মুসলিম (২৪৫৮)।
[২২২] সহীহ; মুসলিম (২৩৪), নাসাঈ (১/৮০) প্রভৃতি।

Contents

তোমরা হচ্ছো আমার সঙ্গী সাথী! আর যেসব ঈমানদার এখনও (দুনিয়াতে) আগমন করে নি তারা হচ্ছে আমার ভাই। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনার উম্মাতের যারা এখনও (দুনিয়াতে) আসে নি, আপনি তাদেরকে কিভাবে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন: অনেকগুলো কালো ঘোড়ার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির একটি কপাল চিত্রা ঘোড়া থাকে, তবে কি সে উক্ত ঘোড়াটিকে চিনতে পারবে না? তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তা অবশ্যই পারবো। তখন তিনি বললেন: তারা (আমার উম্মতরা) ওযূর প্রভাবে জ্যোতির্ময় চেহারা ও হাত পা নিয়ে উপস্থিত হবে। আর আমি আগেই হাওযে কাওসারের কিনারে উপস্থিত থাকবো। সাবধান! কিছু সংখ্যক লোককে আমার হাওয থেকে এমন ভাবে তাড়িয়ে দেয়া হবে যেমন বেওয়ারিশ উটকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আমি তাদেরকে ডেকে ডেকে বলবো: আরে এদিকে এসো, এদিকে এসো। তখন বলা হবে, এরা আপনার ইন্তিকালের পর (নিজেদের দীন) পরিবর্তন করে ফেলেছে। তখন আমি তাদেরকে বলবো: (আমার নিকট থেকে) দূর হও, দূর হও।[২২৩]

الغرة এর অর্থ উজ্জ্বল শুভ্রতা, যা ঘোড়ার কপালে দেখা যায়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য নূর বা উজ্জ্বলতা, যা উম্মতে মুহাম্মাদীর চেহারায় দেখা দিবে। আর التحجيل-অর্থ এমন শুভ্রতা, যা ঘোড়ার তিন পায়ে দেখা যায়। এর দ্বারাও নূর বা উজ্জ্বলতা উদ্দেশ্য।[২২৪]

৬। এটা ক্বিয়ামতের দিন বান্দার জন্য জ্যোতি স্বরূপ:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ، حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ

আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আমার বন্ধু রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: যে স্থান পর্যন্ত ওযূর পানি পৌঁছবে সে স্থান পর্যন্ত মু'মিন ব্যক্তির চাকচিক্য অথবা সৌন্দর্যও পৌঁছবে।[২২৫] الْحِلْيَةُ অর্থ: ক্বিয়ামাত দিবসের জ্যোতি।

৭। ওযূ শয়তানের গ্রন্থি খুলে দেয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ»

আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার গ্রীবাদেশে তিনটি গিঁঠ দেয়। প্রতি গিঁঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত। অতএব তুমি ঘুমাও। তার পর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে তখন একটি গিঁঠ খুলে যায়, পরে ওযূ করলে আর একটি গিঁঠ খুলে যায়, তার পর সালাত আদায় করলে আরও একটি গিঁঠ খুলে যায়।

---

[২২৩] সহীহ: মুসলিম (২৩৪), নাসাঈ (১/৮০) প্রভৃতি।
[২২৪] ইমাম নাববী প্রণীত 'সারহু মুসলিম' (৩/১০০)।
[২২৫] সহীহ: মুসলিম (২৫০), নাসাঈ (১/৮০)।

www.waytojannah.com

তখন তার প্রভাত হয় প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষিত মনে ও অলস চিত্তে।[২২৬]

সংক্ষিপ্তভাবে ওযূর পূর্ণাঙ্গ নিয়মাবলী ঃ

أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

হুমরান থেকে বর্ণিত, তিনি উসমান বিন আফ্ফান (رضي الله عنه) কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনিয়ে উভয় হাতের তালুতে তিন বার পানি ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন। এর পর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। তার পর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তার মুখমণ্ডল তিন বার ধুয়ে দুই হাত তিনবার কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিলেন। এর পর মাথা মাসাহ করলেন। তার পর উভয় পা গিরা পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। পরে বললেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম ওযূ করবে তারপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোন খিয়াল করবে না। তার পেছনের গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[২২৭]

এ হাদীস এবং সামনে বিস্তারিত বর্ণনায় যে সকল হাদীস আসবে, সেগুলোর আলোকে ওযূর বর্ণনা নিম্নরূপ:

(১) অপবিত্রতা দূর করার জন্য ওযূর নিয়ত করা।
(২) বিসমিল্লাহ বলে ওযূ শুরু করা।
(৩) দু' হাতের কব্জি ৩ বার করে ধৌত করা।
(৪) ডান হাতে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মুখে ও নাকে দেয়া। অতঃপর কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা
(৫) তার পর বাম দিকে নাক ঝেড়ে ফেলা। এরূপ তিন বার করবে।
(৬) দাড়ি খিলাল সহ সমস্ত মুখমণ্ডল তিন বার ধৌত করা
(৭) দু'হাতের আঙ্গুলগুলো খিলালসহ ডান হাত ও বাম হাত পর্যায়ক্রমে কনুই পর্যন্ত ধৌত করা।
(৮) সমস্ত মাথার সামনে থেকে পিছনে একবার মাসাহ করা।
(৯) দু'কানের বাহির ও ভিতর মাসাহ করা।
(১০) দু'পায়ে গিট পর্যন্ত ধৌত করা। প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা এবং দু'পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করা।

---

[২২৬] সহীহ: বুখারী (১১৪২), মুসলিম (৭৭৬)।
[২২৭] সহীহ: বুখারী (১৫৮), মুসলিম (২২৬)।

Contents

ওযূ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত[২২৮]:

ওযূ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়তকে শর্ত করা হয়েছে। আর তা হলো: ওযূ করার জন্য অন্তরে দৃঢ় সংকল্প করা, যেন আল্লাহ ও রাসূলের (ﷺ) নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়। যেমন: সমস্ত উদ্দেশ্য মূলক ইবাদাতকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

অর্থাৎ: আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে *(সূরা বায়্যিনা-৫)*।

রাসূল (ﷺ) বলেন:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

অর্থাৎ: প্রত্যেকটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে যা সে নিয়ত করবে।[২২৯]

এটা ইমাম মালিক শাফেঈ, আহমাদ, আবূ সাওর ও দাউদ এর অভিমত।[২৩০]

অপর পক্ষে, ইমাম আবূ হানীফা এর মতে ওযূতে নিয়ত শর্ত নয়,[২৩১] কারণ এটা যুক্তিগত ইবাদাত। এটা নিজেই উদ্দেশ্যমূলক ইবাদাত নয়। তা যেন অপবিত্রকে পবিত্র করার সাদৃশ্য রাখে।

অধিকাংশের (জমহুর) মতামতটিই সঠিক। কেননা দলীল প্রমাণ করছে যে, প্রত্যেক ওযূতে সাওয়াব রয়েছে। আর সকলের ঐকমত্যে, নিয়ত ব্যতীত কোন সাওয়াব হয় না। তা এমন ইবাদাত যা শরীয়াত ছাড়া কল্পনা করা যায় না। সুতরাং ওযূতে নিয়ত শর্ত।[২৩২]

নিয়তের স্থান হলো ক্বলব বা অন্তর:

শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:[২৩৩] সকল ইবাদাতের ক্ষেত্রে মুসলিম ইমামদের ঐকমত্যে, নিয়ত করার স্থান হল ক্বলব বা অন্তর। এর স্থান জিহ্বা বা মুখ নয়।

যেমন: ত্বহারাত, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, দাস মুক্ত করা, জিহাদ করা প্রভৃতি। সুতরাং নিয়ত জোরে পাঠ করা শরীয়াতসম্মত নয় এবং তা বার বার পাঠ করা যাবে না। বরং তাকে এ ক্ষেত্রে সতর্ক

---

[২২৮] শর্ত বলা হয়, যেটি না হলে অন্যটি না হওয়া অবধারিত হয়ে যায় এবং তার প্রাপ্তি অন্যটির প্রাপ্তিকে অবধারিত করে না ও তার মূলকেও বাতিল করে না। আর শর্ত কোন কাজের পূর্বেই সংঘটিত হয় এবং তা মূল কাজের বাইরের বিষয়।

[২২৯] সহীহ; বুখারী (১), মুসলিম (১৯০৭)।

[২৩০] বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/৬), আল-মাজমু' (১/৩৭৪) আত-তামহীদ (২২/১০০, ১০১)।

[২৩১] বাদায়ূস সানাঈ (১/১৯-২০)।

[২৩২] অনুরূপ এসেছে ইবনু মুফলিহ প্রণীত আল-ফুরু (১/১১১) গ্রন্থে।

[২৩৩] মাজমুআতুর রাসাঈলুল কুবরা (১/২৪৩)।

www.waytojannah.com

করার পরও যদি এরূপ করে তাহলে তাকে ধমক দিয়ে শিক্ষা দেয়া উচিত। বিশেষ করে যখন সে এটা বার বার বলে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। জোরে উচ্চারণ করে নিয়তকারী ত্রুটিকারী হিসেবে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি এটাকে দীন হিসেবে বিশ্বাস করবে এবং তা মুখে উচ্চারণ করে আল্লাহর ইবাদাত করবে, সে বিদ'আত করবে। কেননা মহানাবী (ﷺ) এবং তার সাহাবাগণ কখনও এভাবে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করেন নি এবং এ ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে কোন বর্ণনাও পাওয়া যায় না । যদি তা শরীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার রাসূলের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়ে নিতেন। উপরন্তু নিয়ত উচ্চারণের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ মানুষের মনের খবর জানেন।[২৩৪]

উপকারিতাঃ

(১) শাইখুল ইসলাম বলেনঃ সকল মুসলিম ইমামের ঐকমত্যে, যদি কেউ অন্তরে যা নিয়ত করেছে তার বিপরীত মুখে কিছু বলে, তাহলে যা নিয়ত করেছে সেটাই ধর্তব্য হবে। মুখে যা উচ্চারণ করেছে তা ধর্তব্য নয়। আর যদি কেউ মুখে উচ্চারণ করেছে কিন্তু অন্তরে নিয়ত করে নি, তাহলে তা ধর্তব্য নয়। কেননা নিয়তটা হলো সংকল্প ও দৃঢ়তার ব্যাপার।

(২) যখন অনেকগুলো নাপাকী এক সঙ্গে একত্রিত হবে তখন ওযূ ওয়াজিব হবে। যেমনঃ কেউ পেশাব করলো তারপর পায়খানা করলো, তারপর ঘুমালো। তাহলে এ ক্ষেত্রে যে কোন একটি অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করলে, সবগুলো নাপাকীর পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। এটাই বিশুদ্ধ মতামত। কেননা অপবিত্রতা একটিই অবস্থা, যদিও তার কারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়।[২৩৫]

(৩) আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে সর্বোত্তম হলো, ওযূকারী নিয়তের সকল সুরাত বা রূপগুলো ঠিক রাখার জন্য সাধারণভাবে অপবিত্রতা দূর করার নিয়ত করবে। ওযূর ক্ষেত্রে নিয়তের সুরাত বা রূপগুলো হলোঃ অপবিত্রতা দূর করার নিয়ত করা অথবা যে পবিত্রতা তার জন্য ওয়াজিব তার জন্য নিয়ত করা অথবা যে পবিত্রতা অর্জন করা তার জন্য সুন্নত তার জন্য নিয়ত করা অথবা সুন্নাত পালনের জন্য নতুন ওযূ করার সময় নিয়ত করা।[২৩৬]

---

[২৩৪] যাদুল মায়াদ (১/১৯৬), ইগাসাতুল লুহফান (১/১৩৪) বাদায়ূল ফাওয়াঈদ (৩/১৮৬), আল ফুরু' (১/১১১), 'শারহুল মুমতি' (১/১৫৯)।

[২৩৫] আল-মাজমু' (১/৩৮৫), শারহুল মুমতি' (১/১৬৫)।

[২৩৬] এ মাসাআলার ব্যাপারে উলামাদের মতভেদ আলোচিত হয়েছে আল-মাজমু' (১/৩৮৫) এবং অন্যান্য গ্রন্থে।

www.waytojannah.com

Contents

ওযূর রুকনসমূহ

ওযূর রুকন হলো: যার মাধ্যমে ওযূর মূল কাঠামো গঠিত হয়। যদি একটি রুকন উলট-পালট হয়ে যায় তাহলে, ওযূ বাতিল হয়ে যাবে এবং তা শরীয়াতসম্মত হবে না। সেগুলো হলো:

১। সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করা:

মুখমণ্ডল দ্বারা সমস্ত চেহারা উদ্দেশ্য। তার সীমা হলো: দৈর্ঘের দিক থেকে মাথার অগ্রভাগের কপালের গোড়া তথা চুল গজানোর স্থান হতে চোয়াল ও থুতনীর নিচ পর্যন্ত, আর প্রস্থে এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত।

মুখমণ্ডল ধৌত করা ওযূর রুকন সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি রুকন। এটা ব্যতীত ওযূ বিশুদ্ধ হবে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ধৌত কর *(সূরা মায়েদা-৬)*।

যে সমস্ত রাবী মহানাবী (ﷺ) এর ওযূর নিয়মাবলীর হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের প্রত্যেকেই মুখমণ্ডল ধৌত করা রুকনটি সাব্যস্ত করেছেন এবং বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব :

মুখ ধৌত করা ও তাতে পানি দিয়ে গড়গড়া করাকে কুলি বলা হয়। নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে নিঃশ্বাস দ্বারা তা নাকের প্রান্ত সীমায় পৌঁছানোকে إستنشاق বা নাকে পানি দেয়া বলে। আর নাকে পানি দেয়ার পর তা থেকে পানি ঝেড়ে বের করে দেয়াকে إستنثار বা নাক ঝাড়া বলে। আলিমদের বিশুদ্ধ অভিমতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব। এর কারণ নিম্নরূপ:

(১) আল্লাহ তা'আলা মুখমণ্ডল ধৌত করার আদেশ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আর মুখ ও নাক মুখমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত। মুখের ভিতরের অংশ ছাড়া শুধু বাহিরের অংশকে মুখ বলে নির্দিষ্ট করা উচিত নয়, কেননা আরবী ভাষায় সবকিছুর সমষ্টিকে মুখমণ্ডল বলা হয়। যদি তুমি বল যে, মুখ ও নাকের ছিদ্রের তো আলাদা নাম রয়েছে। আরবী ভাষায় তো এগুলোকে মুখ বলা হয় না?

এ ক্ষেত্রে আমরা বলব: তাহলে তো দু'গাল, কপাল, নাকের বাহ্যিক অংশ, দুই ভ্রু ও মুখমণ্ডলের সমস্ত অংশের আলাদা আলাদা বিশেষ নাম রয়েছে, এগুলোকে তাহলে মুখ বলা যাবে না! যদি এরূপ দাবী করা হয়; তাহলে মুখমণ্ডল ধৌত করা ওয়াজিব হওয়ার আবশ্যকতা বাতিলের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাবে।[২৩৭]

(২) আল্লাহ তা'আলা শুধু সাধারণভাবে মুখমণ্ডল ধৌত করার আদেশ দিয়েছেন। আর মহানাবী (ﷺ) তাঁর কর্ম ও শিক্ষার মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফলে তিনি যখন ওযূ করেছেন তখন কুলি ও নাকে

[২৩৭] নাইলুল আউতার (১/১৭৪), আহকামুল কুরআন (২/৫৬৩) ইবনুল আরাবী প্রণীত।

www.waytojannah.com

পানি দিয়েছেন। তিনি কখনও সামান্য ওযূ করে ওযূকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, এমন কোন প্রমাণ তাঁর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয় নি। রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে যখন কোন নির্দেশকে বাস্তবায়নের জন্য কোন কাজ প্রকাশ পায়, তখন তার বিধানটা ওয়াজিবের চাহিদা অনুযায়ী হুকুমের মতো হয়ে থাকে।[২৩৮]

(৩) নাকে পানি দেয়া ও নাক ঝাড়া প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর নির্দেশ প্রমাণিত হয়েছে:

مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وفى رواية إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْثُرْ

(ক) যে ওযূ করবে সে যেন নাক ঝেড়ে ফেলে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ওযূ করবে তখন সে যেন তার নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করায়। অতঃপর যেন নাক ঝেড়ে ফেলে।[২৩৯]

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيستنشق

(খ) তোমাদের কেউ যখন ওযূ করে, তখন সে যেন তার নাকে পানি দেয়।[২৪০]

وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

(গ) সিয়াম পালনকারী না হলে, নাকে ভালভাবে পানি পৌঁছাও।[২৪১]

শাইখুল ইসলাম বলেন,[২৪২] "মহানাবী (ﷺ) নাকে পানি দেয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। এটা মূলতঃ মুখের চেয়ে নাক ধৌত করা বেশি উত্তম এ বিবেচনায় নয়। যদি এমনটি বিবেচনা করা হতো তাহলে মুখকে ধৌত করাই বেশি উত্তম হতো। কেননা নাকের চেয়ে মুখ বেশি মর্যাদার অধিকারী, কারণ মুখ দ্বারা আল্লাহর যিকর করা হয়, কুরআন পাঠ করা হয় এবং মুখ থেকেই বেশি দুর্গন্ধ বের হয়। আসলে নাককে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা মুখের সাথে সাদৃশ্য রাখে তাই। আল্লাহই ভাল জানেন। যেহেতু মিসওয়াক দ্বারা মুখ পবিত্র করার বিধান রয়েছে এবং এ ব্যাপারে জোরালো নির্দেশও দেয়া হয়েছে। আবার শরীয়াতে খাওয়ার পর মুখ ধৌত করার কথা বলা হয়েছে এবং কোন কোন মতে খাওয়ার পূর্বেও মুখ ধৌত করার কথা বলা হয়েছে, সেহেতু বুঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়াত নাকের চেয়ে মুখ পবিত্র করার ব্যাপারে বেশি তৎপর। তবে নাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে শুধু তার বিধান বর্ণনা করার জন্য। যেন কেউ নাক ধৌত করা ছেড়ে না দেয়"।

(৪) অনুরূপভাবে কুলি করার ব্যাপারেও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার সনদগত অবস্থা হাসান পর্যায়ের। লাকীত বিন সবরাহ এর বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল (ﷺ) বলেন: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمضمض অর্থাৎ: যখন তুমি ওযূ করবে তখন কুলি কর।[২৪৩]

---

[২৩৮] শারহুল উমদাহ (১/১৭৮) ইবনে তাইমিয়্যাহ প্রণীত। আত-তামহীদ (৪/৫৬৩) ইবনু আব্দিল বার প্রণীত।
[২৩৯] সহীহ; বুখারী (১৬১), মুসলিম (২৩৭) প্রভৃতি।
[২৪০] সহীহ; মুসলিম (২৩৭)।
[২৪১] সহীহ; এর তাহক্বীক সামনে কয়েক বার আসবে।
[২৪২] শারহুল উমদাহ (১/১৭৯-১৮০)।
[২৪৩] সহীহ; আবূ দাউদ (১৪০), তিরমিযী (৩৮), নাসাঈ (১/৬৬), ইবনে মাজাহ (৪৪৮)।

Contents

আমার বক্তব্য: যদি কেউ বলে যে, কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব হওয়ার দলীলগুলোকে সালাতে ভুলকারীর ঘটনায় বর্ণিত রিফায়াহ বিন রাফেঈ এর হাদীস দ্বারা বৈধতার দিকে ফিরানো যেতে পারে। যেমন সে হাদীসে বলা হয়েছে,

«إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ،»

রাসূল (ﷺ) সালাতে ভুলকারীকে বললেন: তোমাদের কারও সালাত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে ওযূ করা হয়। সুতরাং সে যেন তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করে, মাথা মাসাহ করে ও দু'পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত ধৌত করে।[২৪৪]

অত্র হাদীসে আল্লাহর নির্দেশের মতই কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয় নি। সুতরাং এ হাদীসটি কুরআনের আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে মুখমণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হয় নি, যার ফলে এটা বলা যাবে না যে, হাদীস দ্বারা এর ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট করতে হবে। এ মতামতটিও শক্তিশালী এবং যথোপযুক্ত। আল্লাহই ভাল অবগত।

কিছু প্রয়োজনীয় কথা:

ওযূ ও গোসল এ দু'টি পবিত্রতার ক্ষেত্রে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিধানের ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। এ ব্যাপারে চারটি অভিমত পাওয়া যায়:[২৪৫]

১ম অভিমত: কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া শুধু গোসল করার ক্ষেত্রে ওয়াজিব, ওযূর ক্ষেত্রে নয়। ইমাম আবূ হানীফা, সাওরী ও আহলুর রায়গণ এমত পোষণ করেছেন।

২য় অভিমত: ওযূ ও গোসল উভয়ের ক্ষেত্রে এ দু'টি সুন্নাত। এটা ইমাম মালিক, শাফেঈ, লাইস ও আওযায়ীসহ একদল বিদ্বানের অভিমত।

৩য় অভিমত: ওযূ ও গোসল উভয়ের ক্ষেত্রেই এ দু'টি করা ওয়াজিব। এ অভিমত পোষণ করেছেন, আত্বা, ইবনে জুরাইয, ইবনুল মুবারাক ও ইসহাক। এটা ইমাম আহমাদ (রাহি.) এরও একটি রেওয়ায়াত এবং হাম্বালীদের প্রসিদ্ধ মাযহাব।

৪র্থ অভিমত: নাকে পানি দেয়া ওযূ ও গোসলের ক্ষেত্রে ওয়াজিব এবং কুলি করা উভয় ক্ষেত্রে সুন্নাত। একটি বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদ এ মত পোষণ করেছেন। আবূ উবাইদ, আবূ সাওর ও আসহাবে হাদীসের একটি দলও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবনুল মুনযির এ অভিমতকে পছন্দ করেছেন।

---

[২৪৪] সহীহ; আবূ দাউদ (৮৫৯), তিরমিযী (৩০২), নাসাঈ (২/২০, ১৯৩) ইবনে মাজাহ (৪৬০) প্রভৃতি।

[২৪৫] আল-মারওয়াযী প্রণীত 'ইখতিলাফুল উলামা' (পৃ. ২৩-২৪) আত-তামহীদ (৪/৩৪), আল-আউসাত (১/৩৭৯) ইবনু জাওযীর আত-তাহক্বীক (১/১৪৩), আল-মুহাল্লা (২/৫০)।

www.waytojannah.com

দাড়ি ও মুখমণ্ডলের সমগ্র চুল ধৌত করা:[২৪৬]

'যখন মুখণ্ডলের উপর গজানো সমস্ত চুল তথা দাড়ি, গোঁফ , নিমদাড়ি[২৪৭], ভ্রু, ও দু'চোখের পশমসমূহ ঘন হওয়ার ফলে মুখের চামড়া দেখা না যায়, তাহলে বাহ্যিকভাবে তা ধুয়ে ফেললেই চলবে। আর যদি চামড়া দেখা যায়, তাহলে দাড়ির সাথে চামড়াও ধুয়ে ফেলতে হবে। যদি কিছু অংশ পাতলা হয় আর কিছু অংশ ঘন হয় তাহলে দাড়ির সাথে পাতলা অংশটুকু ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব এবং ঘন অংশটুকু বাহ্যিকভাবে ধুলেই চলবে।

আর যদি দাড়ি লম্বা হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রাহি.) এর মতে ও ইমাম আহমাদ (রাহি.) এর একটি বর্ণনা মতে, লম্বা অংশটুকু ধোয়া ওয়াজিব নয়, শুধু মুখমণ্ডলের সীমানায় যে দাড়িগুলো রয়েছে তা ধৌত করলেই চলবে। কেননা وجه বা মুখমণ্ডল দ্বারা শুধু মুখের চামড়া উদ্দেশ্য।

অপরদিকে, ইমাম শাফেঈর মতে ও ইমাম আহমাদের প্রকাশ্য অভিমতে, লম্বা অংশটুকু ধোয়া ওয়াজিব, দাড়ি যত বড়ই লম্বা হোক না কেন। কেননা যে অংশটুকু ধোয়া ফরয সেখান থেকে এ দাড়ি উদ্‌গত হয়েছে। ফলে বাহ্যিকভাবে তা মুখমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

২। দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করাঃ

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾

অর্থাৎ: হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর *(সূরা মায়েদা- ৬)*।

বিদ্বানগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ওযূতে উভয় হাত ধৌত করা ওয়াজিব।

জেনে রাখা ভাল যে, আল্লাহর বাণী: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ এর মধ্যে 'إِلَى ' অব্যয়টি مع (সাথে) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ অর্থাৎ: তোমরা তাদের মালকে তোমাদের মালের সাথে ভক্ষণ করো না *(সূরা নিসা-২)*। অন্যত্রে বলা হয়েছে-وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ - অর্থাৎ: مع قُوَّتِكُم (এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরও শক্তি বৃদ্ধি করবেন)।

মুবাররাদ বলেন: যখন সীমারেখাটা সীমায়িত বস্তুর সত্তা হবে, তখন সীমারেখাটি তার মধ্যে প্রবিষ্ট হবে। এর উপর ভিত্তি করে দু'হাতের কনুইকে ধৌত করার মধ্যে শামিল করা ওয়াজিব। কতিপয় মালিকী ব্যতীত এটাই অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত।[২৪৮]

---

[২৪৬] শরহে ফাতহুল কাদীর (১/১২), আল-মুগনী (১/৮৭) আল-মাজেমু' (১/৩৮০)।

[২৪৭] নিচের ঠোঁট ও থুতনির মাঝে গজানো কেশগুচ্ছকে নিমদাড়ী বলা হয়।

[২৪৮] আল-মাসবূত্ব (১/৬), বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/১১), আল-মাজমু (১/৩৮৯), আল-মুগনী (১/৯০)।

www.waytojannah.com

Contents

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর আমল অভিমতকে শক্তিশালী করে:

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ "، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

নু'আইম ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুজমির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি খুব ভালোভাবে মুখমণ্ডল ধুলেন, এরপর ডান হাত ধুলেন এবং বাহুর কিছু অংশ ধুলেন। পরে বাম হাত ও বাহুর কিছু অংশসহ ধুলেন। এরপর মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর ডান পায়ের নলার কিছু অংশসহ ধুলেন, এরপর বাম পাও একইভাবে ধুলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এভাবে ওযূ করতে দেখেছি।[২৪৯]

এর পর একটি কায়দা হলো: যে বিষয় ছাড়া ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, তা পালন করা ওয়াজিব । তদ্রুপভাবে হাত পূর্ণভাবে ধৌত করা বুঝা যায় না যতক্ষণ না দু'কনুই বরাবর পানি প্রবাহিত করা হয়।[২৫০]

৩। মাথা মাসাহ করা:

আল্লাহ বলেন:

﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾

অর্থাৎ: তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ কর *(সূরা মায়েদা - ৬)* ।

বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মাথা মাসাহ করা ফরয। তবে কতটুকু পরিমাণ মাসাহ করলে যথেষ্ট হবে, সে পরিমাণ নিয়ে মতভেদ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনটি মতামত পাওয়া যায়:

১ম অভিমত: নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ওয়াজিব:

এটা **ইমাম মালিক** (রাহি.) এর মাযহাব। ইমাম আহমাদ ও তার অধিকাংশ অনুসারীদের প্রসিদ্ধ অভিমত এটিই। **আবূ উবাইদ** ও ইবনে মুনযিরও এ মত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে তাইমিয়াহ এ মতটিকে পছন্দ করেছেন।[২৫১] তাদের দলীল নিম্নরূপ:

(১) আল্লাহ বাণী: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ – অত্র আয়াতে 'ب' (বা) অব্যয়টি إلصاق বা মিলানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মূল উদ্ধৃতি হবে - وَامْسَحُوا رُءُوسَكُمْ - যেমনটি তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসাহ করা হয়। কেননা উভয় বিধানটি কুরআনে একই শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যেমন

---

[২৪৯] সহীহ; মুসলিম (২৪৬)।

[২৫০] আল্লামা গামেদী প্রণীত 'ইখতিয়ারাতু ইবনে কুদামাহ' (১/১৬৪)।

[২৫১] আল-মুদাও ওয়ানাহ (১/১৬), আল-মুগনী (১/৯২), আত-ত্বহুর (পৃ. ৩৫৮), আল-আউসাত্ব (১/৩৯৯), মাজমু' আল ফাতাওয়া (২১/১২৩)।

www.waytojannah.com

আল্লাহ মুখমণ্ডল মাসাহ করার ব্যাপারে বলেন: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾ অর্থাৎ: সমস্ত মুখমণ্ডল মাসাহ কর *(সূরা মায়েদা -৬)।*

(২) এই নির্দেশটিকে মহানাবী (ﷺ) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে । মহানাবী (ﷺ) যখন ওযূ করতেন তখন সমগ্র মাথা মাসাহ করতেন। তন্মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেন:

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ[২৫২] فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ

অর্থাৎ: একবার রাসূল (ﷺ) আমাদের বাড়িতে এলেন। আমরা তাঁকে পিতলের একটি পাত্রে পানি দিলাম। তিনি তা দিয়ে ওযূ করলেন। তার মুখমণ্ডল তিনবার ও উভয় হাত দু'বার করে ধৌত করলেন এবং তাঁর হাত সামনে ও পেছনে এনে মাথা মাসাহ করলেন। আর উভয় পা ধৌত করলেন।
অপর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তার সমস্ত মাথা মাসাহ করলেন।[২৫৩]

(৩) মুগিরাহ বিন শু'বা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ

অর্থাৎ: রাসূল (ﷺ) একদা ওযূ করলেন, অতঃপর মোজার উপর, মাথার অগ্রভাগে এবং পাগড়ির উপর মাসাহ করলেন।[২৫৪]
যদি মাথার অগ্রভাগ মাসাহ করাই যথেষ্ট হতো, তাহলে তিনি কেন পাগড়ির উপর মাসাহ করলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত মাথাই মাসাহ করা ওয়াজিব।

২য় অভিমত : মাথার কিছু অংশ মাসাহ করলেই যথেষ্ট হবে:

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেঈ (রাহি.) এর অভিমত।[২৫৫] তারা আবার মতভেদ করেছেন, কতটুকু অংশ মাসাহ করলে যথেষ্ট হবে। কেউ কেউ বলেন, তিন চুল পরিমাণ মাসাহ করলেই চলবে। কেউ বলেন, মাথার চার ভাগের একভাগ মাসাহ করতে হবে। আবার কারও মতে, মাথার অর্ধেক মাসাহ করতে হবে। **তাদের দলীল হলো:**

(১) আল্লাহর বাণী - وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ - আয়াতে 'ب' (বা) অব্যয়টি تبعيض তথা আংশিক অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। إلصاق বা মিলানোর অর্থে ব্যবহৃত হয় নি।

(২) রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ناصيه (নাসিয়া) তথা মাথার অগ্রভাগ মাসাহ করেছেন।

---

[২৫২] التور অর্থ: পাত্র অথবা পিয়ালা। আর الصفر অর্থ: উত্তম পিতল।

[২৫৩] সহীহ: বুখারী (১৮৫), মুসলিম (২৩৫)।

[২৫৪] মুসলিম (১৭৫), আবূ দাউদ (১৫০), তিরমিযী (১০০), এ হাদীসের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে, তবে আলবানী একে সহীহ বলেছেন।

[২৫৫] আল-মাসবূত্ব (১/৮), আল-মাজমূ' (১/৩৯৯), আল-মুগনী (১/৯২)।

Contents

৩য় অভিমত: নারী ব্যতীত পুরুষদের জন্য সমস্ত মাথা মাসাহ করা ওয়াজিব :

এটা ইমাম আহমাদ (রাহি.) এর একটি অভিমত। তিনি বলেন, আমি মনে করি: মহিলাদের মাথা মাসাহ করার ব্যাপারে শিথিলতা রয়েছে। আয়িশা (রা.) তার মাথার অগ্রভাগ মাসাহ করতেন। ইবনে কুদাম (রাহি.) বলেন, " ইমাম আহমাদ (রাহি.) হলেন একজন আহলুল হাদীস বিদ্বান। সুতরাং আল্লাহর কৃপায় তাঁর নিকট হাদীস সাব্যস্ত হওয়া ব্যতীত শুধুমাত্র ঘটনা থেকে দলীল গ্রহণের প্রত্যাশা করা যায় না।[২৫৬]

আমার বক্তব্য (আবূ মালিক): পূর্বের আলোচনার মধ্যে বিশুদ্ধ অভিমত হলো: ওযূতে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করাই ওয়াজিব। কারণ এর দলীল বেশি শক্তিশালী। আর যারা বলেন যে, 'ب' অব্যয়টি تبعيض বা আংশিক অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের এ কথা সঠিক নয়। কেননা সরফের পন্ডিত সিবওয়ায় এ কথাটিকে স্বীয় গ্রন্থে ১৫ বার অস্বীকার করেছেন। ইবনে বুরহান বলেন: যারা 'ب' অব্যয়টি تبعيض বা আংশিক অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধারণা করেন, তাদের এ কথার কোন ভিত্তি নেই। কেননা এটা ভাষাবিদদের কাছে অপরিচিত।[২৫৭]
রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে একটিও সহীহ হাদীস নেই যে, তিনি মাথার আংশিক মাসাহ করেছেন। তবে তিনি যখন ناصيه (নাসিয়া) বা মাথার অগ্রভগে মাসাহ করেছেন তখন তিনি তা পূর্ণ করার জন্য পাগড়ির উপরও মাসাহ করেছেন।[২৫৮]

আর এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য করার ব্যাপারে কোন প্রমাণ রয়েছে বলে আমার জানা নেই। তবে নারীদের ঘোমটার (খিমার) উপর মাসাহ করা জায়েয । যদি তারা ঘোমটাসহ মাথার অগ্রভাগ মাসাহ করে তাহলে তা বিতর্কমুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম হবে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত ।

প্রয়োজনীয় কথা

মাথায় যদি মেহেদী বা আঠালো দ্রব্যের প্রলেপ লাগানো থাকে, তাহলে তার উপর মাসাহ করা বৈধ:
কেননা মহানাবী (ﷺ) থেকে প্রমাণিত যে, তিনি ইহরাম অবস্থায় মাথার চুলে আঠালো দ্রব্যের প্রলেপ লাগিয়েছেন (এ সংক্রান্ত আলোচনা হাজ্জ অধ্যায়ে আলোচিত হবে)। সুতরাং ওযূর কারণে তা কষ্ট করে খুলে ফেলার প্রয়োজন নেই। কারণ মাথার সাথে যা লাগানো থাকে তা মাথারই আওতাধীন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত ।

৪। দু' কান মাসাহ করা:

মাথার সাথে কানদ্বয় মাসাহ করা ওয়াজিব। কেননা দু'কান মাথার অন্তর্ভুক্ত ।

---

[২৫৬] আল-মুগনী (১/৯৩)।
[২৫৭] নাইলুল আওতার (১/১৫৫), আল মুগনী (১/৮৭)।
[২৫৮] মাজমূ' আল ফাতাওয়া (২১/১২২), ইবনুল আরাবী প্রণীত আহকামুল কুরআন (২/৫৭১), সুবুলুস সালাম (১/১০৭)।

www.waytojannah.com

মহানাবী (ﷺ) এর পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'দু'কান মাথার অন্তর্ভুক্ত'।[২৫৯] বিশুদ্ধ অভিমতে হাদীসটি মারফূ সূত্রে যঈফ। তবে অনেক সালাফের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত আছে যে, দু'কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে ইবনে উমার (رضي الله عنه) অন্যতম।[২৬০]

বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ সাক্ষ্য দেয় যে, মহানাবী (ﷺ) তার মাথা ও দু'কান একবার মাসাহ করেছেন।[২৬১] এটা অনেক সাহাবীর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: আলী (رضي الله عنه), ইবনে আব্বাস(رضي الله عنه), রুবাই (رضي الله عنها) ও উসমান (رضي الله عنه) । সুনয়ানী (রাহি.) বলেন, তাদের প্রত্যেকেই মাথার সাথে দু'কান একই সাথে মাসাহ করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। যেমন: مرة (একবার) শব্দটি দ্বারা তা স্পষ্ট বুঝা যায়। যদি তিনি দু'কানের জন্য নতুনভাবে পানি নিতেন, তাহলে 'তিনি মাথা ও দু'কান একবার মাসাহ করেছেন' বলে যে বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে তা সাব্যস্ত হত না। যদি ধারণা করা হয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তিনি মাসাহ বার বার করেন নি, আর তিনি দু'কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নিয়েছেন। তাহলে তা হবে সুদূর প্রসারী ধারণা।[২৬২]

আমার বক্তব্য: যদি দু'কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেয়া হয় তাহলে সমস্যা নেই। কেননা এ ব্যাপারে ইবনে উমার (رضي الله عنه) থেকে প্রমাণ সাব্যস্ত আছে।[২৬৩]

সতর্কবাণী: ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা শরীয়াত সম্মত নয় । কেননা এ ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি।[২৬৪]

৫। দুই পা গিঁঠসহ ধৌত করা:[২৬৫]

অধিকাংশ আহলে সুন্নাহ এর নিকট দু'পা ধৌত করা ওয়াজিব। কেননা মহান আল্লাহ বলেন: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ আয়াতে বর্ণিত পূর্বের সকল مغسولات তথা ধৌত করা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর আতফ করার কারণে 'أَرْجُلَكُمْ' এ যবর দিয়ে পড়তে হবে।

---

[২৫৯] যঈফ; এর অনেকগুলো সূত্র রয়েছে, যার প্রত্যেকটিই ত্রুটিযুক্ত। এর সমষ্টি দ্বারা 'হাসান' আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করা হয়েছে। এমনকি- আলবানী (রহঃ) তাঁর 'আস-সহীহা' (১/৫৫) গ্রন্থে বলেন, কতিপয় উলামা এ হাদীসকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বলে ধারণা করে থাকেন। আমাদের শাইখ এ হাদীসটি তার আন-নাযরাত কিতাবে উল্লেখ করে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। আর এটাই অতি উত্তম। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ শাইখ 'হাসান' ইমাম বাইহাক্বী প্রণীত আল-খালাফিয়্যাত (১/৪৪৮) এর হাশিয়া অতিনিপূণ ভাবে অনুসন্ধান শেষে একে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন।

[২৬০] এর সনদ হাসান; দারাকুতনী (১/৯৮), ইবনে আবী শাইবাহ (১/২৮) প্রভৃতি।

[২৬১] সহীহ; আবূ দাউদ (১৩৩), তিরমিযী (৩৬), নাসাঈ (১/৭৪), ইবনে মাজাহ (৪৩৯) প্রভৃতি। ইবনে আব্বাসের সূত্রে এ হাদীসের বেশ কয়েকটি সূত্র পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে একে সহীহ আখ্যা দেয়া হয়। এর মূল সনদ ইমাম বুখারী সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন (১৫৭)। এবং রুবাঈ বিনতে মুয়াববিয এর হাদীসটি তার শাহেদ। যা আবূ দাউদ (১২৬) তিরমিযী (৩৩), ইবনে মাজাহ (৪১৮) বর্ণনা করেছেন, আর এমন হাদীস মিকদাম ইবনে মা'দিকারিব থেকে ও বর্ণিত হয়েছে।

[২৬২] সুবুলুস সালাম (১/৪৯)।

[২৬৩] তার সনদ সহীহ; মুসনাদে আবদুর রাযযাকে (২৯) বাইহাক্বী (১/৬৫)।

[২৬৪] মাজমূ' ফাতাওয়া (১/৫৬), যাদুল মায়াদ (১/৪৯) আস-সিলসিলাতুয যঈফা (৬৯-৭৪৪)।

[২৬৫] দু'পায়ের গোঁড়ায় উদ্গত উঁচু হাড্ডিকে কা'ব বা গিঁঠ বলা হয়।

Contents

যে সকল রাবী (বর্ণনাকারী) রাসূল (ﷺ) এর ওযূর করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন তাদের প্রত্যেকেই গিঁঠসহ পা ধৌত করার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উসমান (رضي الله عنه) এর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। সেখানে বলা হয়েছে: 'অতঃপর তিনি তার দু'পা গিঁঠসহ তিনবার ধৌত করলেন।[২৬৬] দু'পায়ের গিঁঠ ধৌত করার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা যখন সীমারেখাটা সীমায়িত বস্তুর সত্তা হবে, তখন সীমারেখাটি তার মধ্যে প্রবিষ্ট হবে। যেমনটি এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারটি ইবনে উমার (رضي الله عنه) বর্ণিত হাদীস দ্বারাও প্রমাণ করা যায়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا – وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ – وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا

অর্থাৎ: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক সফরে রাসূল (ﷺ) আমাদের পেছনে রয়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছলেন, এ দিকে আমরা আসরের সালাত আদায় করতে দেরি করেছিলাম। আর আমরা ওযূ করছিলাম। আমরা আমাদের পা কোনমত পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। তিনি উচ্চস্বরে বললেন: পায়ের গোড়ালীগুলোর (শুষ্কতার) জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে। তিনি দু'বার বা তিনবার একথা বললেন।[২৬৭]

আর মহানাবী (ﷺ) এর ওযূর মধ্যে মাসাহ করার ব্যাপারে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা মোজা মাসাহ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা হলো একটা ওযর। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হবে। এ মাসআলার ব্যাপারে রাফেযী ও অধিকংশ শিয়াপন্থি দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বলেন: শুধু দু'পা মাসাহ করা ওয়াজিব, তা ধৌত করার দরকার নেই।

সঠিক কথা হলো: প্রথম অভিমতটিই (দু'পা ধৌত করা ওয়াজিব) আমল যোগ্য। আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা বলেন: 'রাসূল (ﷺ) এর সাহাবাগণ দু'পা ধৌত করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন'।[২৬৮]

দু'হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা:

আঙ্গুলসমূহ এবং তার আশে-পাশে যে অংশ রয়েছে তা ফরযের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা ধৌত করা ওয়াজিব। যদি খিলাল করা ছাড়া ধৌত কার্য সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে খিলাল করা ওয়াজিব। আর যদি খিলাল করা ছাড়াই ধৌত কার্য সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে খিলাল করা মুস্তাহাব। সামনে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

৬। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা:

তারতীব বা ধারাবাহিকতা হলো: ওযূর অঙ্গসমূহকে ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকভাবে পবিত্র করা, যে ভাবে **আল্লাহ** আয়াতে কারীমায় নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং প্রথমে মুখমণ্ডল, তারপর দু'হাত ধৌত করা, এরপর মাথা মাসাহ করা, এরপর দু'পা ধৌত করা । আলিমদের বিশুদ্ধ অভিমতে: ধারাবাহিকতা রক্ষা করা

---

[২৬৬] সহীহ: বুখারী (১৫৮), মুসলিম (২২৬)।
[২৬৭] সহীহ: বুখারী (১৬১), মুসলিম (২৪১)।
[২৬৮] ফাতহুল বারী (১/২৬৬), আল-মুগনী (১/১২০)।

www.waytojannah.com

ওয়াজিব। এটা ইমাম শাফেঈ, হাম্বালী, আবূ সাওর, আবূ ওবাইদ এবং জাহেরী মাযহাবীদের অভিমত।[২৬৯]

তারা এটাকে ওয়াজিব বলে নিম্নোক্ত দলীল দিয়ে থাকেন:

(১) আল্লাহ তা'আলা আয়াতে ওযূর ফরযগুলোকে ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করেছেন। এমনকি দু'পা ধৌত করার কথা থেকে দু'হাত ধৌত করার কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন যা কিনা ধৌত করা ফরয, আর হাত ও পা ধৌত করার মাঝে মাথা মাসাহ করার কথা উল্লেখ করেছেন, যা মাসাহ করা ফরয। আর আরবগণ কোন ফায়দা ছাড়া কোন দৃষ্টান্তের একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করেন না। আর এখানে ফায়দা হলো: ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব এ কথাটি বুঝানো।[২৭০]

(২) যে সমস্ত রাবী মহানাবী (ﷺ) এর ওযূর পদ্ধতি বর্ণানা করেছেন, তারা তা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন।[২৭১] আর মহানাবী (ﷺ) এর কর্ম আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

(৩) বর্ণিত আছে: 'একদা মহানাবী (ﷺ) ধারাবাহিকভাবে ওযূ করলেন অতঃপর বললেন: এ ভাবেই ওযূ করতে হবে। এ ভাবে ওযূ ব্যতীত সালাত কবুল হবে না'।[২৭২] কিন্তু হাদীসটি যঈফ।

ইমাম মালিক, সাওরী এবং আসহাবে রা'য় এর মতে[২৭৩], ওযূতে তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা মুস্তাহাব। এটা ওয়াজিব নয়।

তাদের দলীল হলো:

(১) আয়াতে 'আতফ' করাটা তারতীব এর দাবীদার নয়। পূর্বের আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

(২) যেমন: আলী (رضي الله عنه) ও ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন: "যে অঙ্গগুলোই আগে ধৌত করা হোক না কেন তাতে কোন সমস্যা নেই"।[২৭৪]

এর বিপক্ষে জবাব দিয়ে ইমাম আহমাদ (রাহি.) 'মাসাইলু ইবনুহু আব্দুল্লাহ' (২৭-২৮)- তে বলেন: বাম হাতকে ডান হাতের পূর্বে ধৌত করাতে কোন সমস্যা নেই।

---

[২৬৯] আল-মাজমু' (১/৪৩৩), আল-মুগনী (১/১০০), আল-মুহাল্লা (২/৬৬)।

[২৭০] অনুরূপ এসেছে আল মুগনী (১/১০০) তে।

[২৭১] ওজুর বৈশিষ্ট বর্ণনায় নাবী (স:) থেকে ২০ জন সাহাবীর বর্ণনা এসেছে, যার মধ্যে এ দুটি যঈফ হাদীস ছাড়া প্রত্যেকটি ধারাবাহিক সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে আলবানী এ দু'টি হাদীসকে সহীহ বলেছেন। যেমন এসছে তামামুল মিন্না' (পৃ.৮৫) গ্রন্থে।

[২৭২] যঈফ; আল-ইরওয়া (৮৫)।

[২৭৩] মুদাও ওয়ানাহ (১/১৪), আল-মাসবূত্ব (১/৫৫), শরহে ফতহুল কাদীর (১/৩০)।

[২৭৪] এটা আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি আসার হাদীস যা আহমাদ আল-ইলালে বর্ণনা করেছেন (১/২০৫), ইবনে অবি শায়বাহ (১/৫৫) দারাকুতনী (১/৮৮) গ্রন্থে যঈফ সনদে। এ ছাড়া এ মর্মে ইবনে মাসউদ থেকেও একটি আসার হাদীস এসেছে, যা ইমাম বুখারী তার আত-তারিখ (১৬৫০), আবু উবাঈদ তার আত-তুহুর (৩২৫) গ্রন্থে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে "إن شاء بدأ في الوضوء بيساره" শব্দে এসেছে। যেমনটি ইমাম আহমাদ উল্লেখ করেছেন।

Contents

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত কর (*সূরা মায়েদা*-৬)। সুতরাং ডান হাতকে বাম হাতের পর ধৌত করাতে সমস্যা নেই।

আমার বক্তব্য: সুন্নাত অনুসরণের জন্য ডান হাত আগে ধৌত করাই উত্তম । আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

৭। মাওয়ালাত তথা ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত করার সময় বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি ধৌত করা:

মাওয়ালাত হলো: ওযূর অঙ্গগুলো তাড়াতাড়ি করে ধৌত করা, যেন নাতিশীতোষ্ণ মৌসুমে বিলম্ব করার কারণে ধৌত করা অঙ্গটি পরবর্তী অঙ্গ ধৌত করার আগেই শুকিয়ে না যায়।

ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এর প্রাচীন অভিমত ও আহমাদ (রাহি.) এ প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী: মাওয়ালাত ওয়াজিব। ইমাম মালিকও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন । তবে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বকারী এবং ওযরগতভাবে বিলম্বকারীর মাঝে পার্থক্য করেছেন। শাইখুল ইসলাম এ মতটিকে পছন্দ করেছেন।[২৭৫]

এটা ওয়াজিব হওয়ার দলীল হলো, উমার ইবনে খাত্তাব (ﷺ) বর্ণিত হাদীস:

أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى

অর্থাৎ: একদা এক ব্যক্তি পায়ের নখ পরিমাণ জায়গা বাদ দিয়ে ওযূ করল। নাবী (ﷺ) তা দেখে তাকে বললেন: তুমি গিয়ে উত্তমরূপে ওযূ করে এসো। সুতরাং লোকটি গিয়ে উত্তমরূপে ওযূ করে সালাত আদায় করল।[২৭৬]

অপর এক বর্ণনায় নাবী কারীম (ﷺ)-এর কতিপয় সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত আছে:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّ وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ، لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»

অর্থাৎ: নাবী কারীম (ﷺ) এক ব্যক্তিকে সালাত পড়তে দেখলেন- যার পায়ের পাতার উপরের অংশে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ঝকঝকে শুকনা ছিল, যাতে ওযূর সময় পানি পৌঁছে নি। নাবী কারীম (ﷺ) তাকে পুনরায় ওযূ করে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন।[২৭৭]

---

[২৭৫] আল-উম্ম (১/৩০), আল মাজমু' (১/৪৫১), কাশশাফুল কান্না (১/৯৩), আল- মুদাওু ওয়ানাহ (১/১৫), আল-ইস্তিযকার (১/২৬৭) মাজমু' আল-ফাতাওয়া (২১/১৩৫)।

[২৭৬] সহীহ; মুসলিম (২৩২), ইবনে মাজাহ (৬৬৬), আহমাদ (১/২১)। কেউ কেউ এর সমালোচনা করেছেন। তবে এ হাদীসের কিছু শাহেদ হাদীস আছে, যার দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে এ হাদীসকে সহীহ বলা হয়। আত-তালখীস (১/৯৫), আল-ইরওয়া (৮৬)।

[২৭৭] আলবানী একে সহীহ বলেছেন; আবূ দাউদ (১৭৫) আহমাদ (৩/৪২৪), বাকিয়্যাহ বিন ওয়ালীদ বুহাইর থেকে এবং বুহাইর খালেদ থেকে। আহমাদের বর্ণনা মতে, বাকিয়্যাহ বুহাইর থেকে শুনার কথাটি স্পষ্ট করেছেন। আহমাদ এর সনদটি উত্তম বলেছেন। এ জন্য আলবনী (রহ:) ইরওয়াতে (৮৬) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আমার মতে, যদি বাকিয়্যাহ এর পক্ষ থেকে তাসবিয়্যাহ এর আশঙ্কা না থাকত তাহলে তা হাসান হত। আর বুহাইর খালেদ থেকে শুনেছেন এ কথা স্পষ্ট নয়।

www.waytojannah.com

ইমাম আবূ হানীফা (রাহি.) ও শাফেঈ (রাহি.) এর নতুন মতামত অনুযায়ী এটা ওয়াজিব নয়। এটা ইমাম আহমাদ (রাহি.) এরও একটি বর্ণনা এবং ইবনে হাযম এ মতেরই প্রবক্তা।[২৭৮]

তারা বলেন:

(১) আল্লাহ তা'আলা অঙ্গসমূহ ধৌত করা ফরয করেছেন। সুতরাং যে তা আদায় করবে সে দায়িত্বমুক্ত হবে, চায় সে দেরিতে করুক অথবা যথাসময়ে সুবিন্যস্তভাবে করুক।

(২) না'ফে থেকে বর্ণিত:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَالَ فِي السُّوقِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ دُعِيَ لِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (ﷺ) বাজারে পেশাব করে ওযূ করলেন, তিনি তার মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধৌত করলেন এবং মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর তাকে জানাযার সালাত আদায় করানোর জন্য ডাকা হলো, ফলে তিনি মাসজিদে প্রবেশ করে মোজার উপর মাসাহ করলেন এবং সালাত আদায় করালেন।[২৭৯]

(৩) যে সমস্ত হাদীসে ওযূ ও সালাত পুনরায় আদায় করার কথা বলা হয়েছে সে সমস্ত হাদীসকে তারা যঈফ মনে করেন।

(৪) তারা মহানাবী (ﷺ) এর বাণী- ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ -এর তাবীল করে বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল পায়ের যে স্থানে পানি পৌঁছে নি তা পরিপূর্ণভাবে ধৌত করা।

আমার বক্তব্য: পূর্বোল্লেখিত দ্বন্দ্বের সারকথায় বলা যায়, খালিদ বিন মি'দান থেকে নাবী করীম (ﷺ) -এর কতিপয় সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত হাদীস, যেখানে ওযূ ও সালাত পুনরায় আদায় করার আদেশ দেয়া হয়েছে" সেটিকে যারা সহীহ হাদীস মনে করেন তারা এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বে অন্য অঙ্গ ধোয়া ওয়াজিব মনে করেন। এছাড়া বাকি দলীলগুলো সম্ভবনাময়। আমার কাছে মনে হয়, এ হাদীসটির কারণে এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বে অন্য অঙ্গ ধোয়া ওয়াজিব। কেননা ওযূ হলো একটি ইবাদাত। সুতরাং তাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার ক্ষেত্রে পার্থক্য বা বিলম্বিত করা যাবে না। আর ইবনে উমার এর আসারটিতে প্রকাশ্য বুঝা যায় যে, তা ছিল ওযর ও বাধ্যগত অবস্থায়। সুতরাং, স্বাভাবিক অবস্থাকে তার উপর কিয়াস করা যাবে না। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তবে যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে সময়ের সামান্য ব্যবধান হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

---

[২৭৮] আল-মাসবূত্ব (১/৫৬), আল-উম্ম (১/৩০), আল-মাজমূ' (১/৪৫১) আল-মুহাল্লা (২/৭০)।

[২৭৯] এর সনদ সহীহ; মুওয়াত্ত্বা মালেক (৪৮), শাফেঈ (১৬) ইমাম বাইহাক্বী প্রণীত আল-মা'রেফাহ (৯৯)।

Contents

ওযূর সুন্নাতসমূহ

১। মিসওয়াক করা:

কোন কোন সময় মিসওয়াক করা মুস্তাহাব, সে বিষয়ে "سنن الفطرة" অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

২। ওযূর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা:

সকল কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা শরীয়াতসম্মত উত্তম কাজ। ওযূর সময় 'বিসমিল্লাহ' বলার ব্যাপারে কিছু যঈফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যদিও কতিপয় আলিম এগুলোকে সহীহ বলেছেন।

তন্মধ্যে একটি হাদীস হলো:

«وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ»

অর্থাৎ: যে ওযূর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলল না তার ওযূ হবে না।[২৮০] এ ব্যাপারে আরও হাদীস রয়েছে, যেগুলো নিতান্তই যঈফ। এটা দলীলের অযোগ্য। এজন্য ইমাম আহমাদ (রাহি.) বলেন, এ ব্যাপারে সহীহ সনদে বর্ণিত কোন হাদীস আছে বলে আমার জানা নেই।

আমার বক্তব্য: যে সমস্ত রাবী রাসূল (ﷺ) এর ওযূর পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, তাদের বর্ণিত হাদীসগুলো 'বিসমিল্লাহ' বলা ওয়াজিব না হওয়াকেই শক্তিশালী করে। তারা কেউ হাদীসে 'বিসমিল্লাহ' বলার কথা উল্লেখ করেন নি। এটা ইমাম সাওরী, মালিক, শাফেঈ ও আসহাবে রা'য়দের অভিমত এবং ইমাম আহমাদের একটি বর্ণনা।[২৮১]

৩। ওযূর শুরুতে দু'হাত কব্জিসহ ধৌত করা:

যেমন- উসমান (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) এর ওযূর পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا

অর্থাৎ: তিনি উভয় হাতের তালুতে তিনবার পানি ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন ।[২৮২]

৪। এক অঞ্জলি পানি নিয়ে একই সাথে কুলি ও নাকে পানি দিবে, এরূপ তিনবার করবে:

যেমন-মহানাবী (ﷺ) এর ওযূর পদ্ধতি শিক্ষা প্রদানে আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ (رضي الله عنه) এর হাদীস:

فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا

তিনি এক অঞ্জলি পানি নিয়ে একই সাথে কুলি ও নাকে পানি দিলেন, এরূপ তিনি তিনবার করলেন।[২৮৩]

৫। সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্যরা ভালভাবে কুলি করবে ও নাকে পানি দেবে:

যেমন লাকীত্ব বিন সাবরাহ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

অর্থাৎ: সিয়াম পালনকারী না হলে, নাকে ভালভাবে পানি পৌঁছাও।[২৮৪]

---

[২৮০] যঈফ; আবূ দাউদ (১০১), তিরমিযী (২৫), আহমাদ (২/৪১৮) প্রভৃতি। এখানে হাদীসটি যঈফ হওয়াটাই অপ্রাধিকার প্রাপ্ত। যদিও আলবানী তার আল-ইরওয়া (১/১২২) গ্রন্থে একে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

[২৮১] ফাতহুল কাদীর (১/২২২), মাওয়াহিবুল জালীল (১/২৬৬) আল-মাজমু' (১/৩৮৫), আল-ইনসাফ (১/১২৮)।

[২৮২] সহীহ; বুখারী (১৫৯), মুসলিম (২২৬)।

[২৮৩] সহীহ; মুসলিম (২৩৫), তিরমিযী (২৮), ইবনে মাজাহ (৪০৫)।

[২৮৪] সহীহ; আবূ দাউদ (১৪২), নাসাঈ (১/৬৬), ইবনে মাজাহ (৪০৭) আহমাদ (৪/৩৩)।

www.waytojannah.com

৬। বাম হাতের পূর্বে ডান হাত ধৌত করা :

যেমন: মহানাবী (ﷺ) এর ওযূর পদ্ধতি বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَعْنِي الْيُسْرَى

অর্থাৎ: এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে ডান হাত ধুলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে তার বাঁ হাত ধুলেন। এরপর তিনি মাথা মাসাহ করলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে ডান পায়ের উপর ঢেলে দিয়ে তা ধুয়ে ফেললেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে বাম পা ধুলেন।[২৮৫]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

রাসূল (ﷺ) জুতা পরিধান, মাথা আঁচড়ানো ও পবিত্রতা অর্জন তথা সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালোবাসতেন।[২৮৬]

৭। অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা:

মহানাবী (ﷺ) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, "তিনি একবার একবার করে ওযূ করেছেন"।[২৮৭] তিনি দু'বার "দু'বার করে ওযূ করেছেন"।[২৮৮] ওযূর ক্ষেত্রে অধিক পরিপূর্ণতা হলো, অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা, যেমনটি মহানাবী (ﷺ) করেছেন। পূর্বে বর্ণিত উসমান (رضي الله عنه)ও আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ (رضي الله عنه) এর হাদীসদ্বয়ে তা বর্ণিত হয়েছে।

দু'টি সতর্ক বাণী:

(ক) মাথা মাসাহ একবার করতে হবে। দু'বার বা তিনবার করা যাবে না ।

এ ব্যাপারে মহানাবী (ﷺ) এর ওযূর পদ্ধতিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনবার মাসাহ করার ব্যাপারে বর্ণিত রিওয়ায়াতগুলোর একটিও সহীহ নয়। আর যে বর্ণনাগুলো দু'বার মাসাহ করার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মহানাবী (ﷺ) এর বাণী- 'فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ' এ ব্যাখ্যা। যেমনটি ইবনু আব্দিল বার বলেছেন।[২৮৯] মাসাহ করার সময় মাথার উপর বারবার হাত ফিরানোকে পুনরাবৃত্তি বলা যায় না। কেননা পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে কেবল নতুন পানি নেয়ার মাধ্যমে। উপরন্তু পুনরাবৃত্তি করা হয় অঙ্গসমূহ ধৌত করার ক্ষেত্রে। মাসাহ করার ক্ষেত্রে নয়।[২৯০] মাথা মাসাহতে পুনরাবৃত্তি না করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী দলীল হলো: জনৈক আরাবীর হাদীস, যিনি মহানাবী (ﷺ) এর কাছে এসে ওযূর পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে মহানাবী (ﷺ) তাকে প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার তিনবার করে ধৌত করে দেখিয়ে দিলেন।

---

[২৮৫] সহীহ; বুখারী (১৪০)।
[২৮৬] সহীহ; বুখারী (১৬৮), মুসলিম (২৬৮)।
[২৮৭] সহীহ; বুখারী (১৫৬), ইবনে আব্বাসের সূত্রে।
[২৮৮] সহীহ; বুখারী (১৫৭), আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ এর সূত্রে।
[২৮৯] ইমাম বাইহাক্বী প্রণীত আল-খালাফীয়াত (১/৩৩৬)।
[২৯০] মুকাদ্দামাতু ইবনে রাশাদ আল- মুদাও ওয়ানাহ (পৃ. ১৬)।

Contents

অতঃপর বললেন:

هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ

অর্থাৎ: এভাবেই ওযূ করতে হবে। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশিবার ধৌত করবে, সে ভুল করবে, সীমালঙ্ঘন করবে ও জুলুম করবে।[২৯১]

হাফেজ 'ফাতহ' গ্রন্থে (১/২৯৮) বলেন: সাঈদ ইবনে মানসুর এর বর্ণনায় সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহানাবী (ﷺ) একবার মাসাহ করেছেন। সুতরাং এটা প্রমাণ করে যে, একবারের অধিক মাসাহ করা পছন্দনীয় নয়। আর তিনবার মাসাহ করার হাদীসগুলো যদি সহীহ হয়, তাহলে দলীলগুলো একত্রিত করার স্বার্থে বলা যায় যে, তা মাসাহ পূর্ণ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা তা সম্পূর্ণ মাথার জন্য পূর্ণাঙ্গ মাসাহ।

আমার বক্তব্য: এটা ইমাম শাফেঈ ব্যতীত ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও আহমাদ (রাহি.) এর সহীহ অভিমত।[২৯২]

(খ) যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ওযূ করবে তার জন্য তিন বারের বেশি অঙ্গ ধৌত করা মাকরূহ:

ওযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করার ফলে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হয়। তবে তিন বারের বেশি ধৌত করা মাকরূহ। যেমন হাদীস বর্ণিত হয়েছে - فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ -অর্থাৎ: যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশি বার ধৌত করবে, সে ভুল করবে, সীমালঙ্ঘন করবে ও যুলুম করবে। তবে এ অতিরিক্তটা ক্ষতি পূরণের ক্ষেত্রে হলে প্রযোজ্য নয়। যদি তিনবার কিংবা তার কম ধৌত করার মাধ্যমেই উত্তমরূপে ওযূ করা যায়, তাহলে তিনবারের বেশি ধৌত করা মাকরূহ। এ মাসআলাটির ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।[২৯৩]

৮। ঘন দাড়ি খিলাল করা:

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, দাড়ি যদি ঘন হওয়ার ফলে মুখের চামড়া দেখা না যায়, তাহলে বাহ্যিকভাবে তা ধুয়ে ফেললেই চলবে। এখানে আমরা অতিরিক্তভাবে বর্ণনা করছি যে, পানি দ্বারা তা খিলাল করা মুস্তাহাব।

عَنْ أَنَسٍ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ» ، وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

অর্থাৎ: আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) যখন ওযূ করতেন, তখন তিনি এক কোশ পানি হাতে নিয়ে থুতনির নীচে দিয়ে তা দ্বারা দাড়ি খিলাল করতেন। তিনি আরও বলেন, আমার প্রতিপালক আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[২৯৪]

এ বিষয়টিকে মুস্তাহাব বলে প্রমাণ করা যায়, পূর্বে উল্লেখিত 'মাসীউস সালাত বা সালাতে ভুলকারী' এর ঘটনায় বর্ণিত রিফায়াহ বিন রা'ফি এর হাদীস দ্বারা।

---

[২৯১] সহীহ; নাসাঈ (১/৮৮), ইবনে মাজাহ (৪২২), আহমাদ (২/১৮০)।

[২৯২] আল-মাসবূত্ব (১/৫), হাশিয়াতুদ দাসূক্বী (১/৯৮) আল-মুগনী (১/১২৭), আল-উম্ম (১/২৬)।

[২৯৩] আত-তামহীদ (২০/১১৭) ইবনু আব্দিল বার প্রণীত।

[২৯৪] সহীহ লিগাইরীহী; আবূ দাউদ (১৪৫), বাইহাক্বী (১/৫৪), হাকিম (১/১৪৯), আল ইরওয়া (৯২)।

www.waytojannah.com

৯। অঙ্গসমূহ ঘর্ষণ করা:

عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي ﷺ يتوضأ فجعل يدلك ذراعيه

অর্থাৎ: আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল (ﷺ) কে ওযূ করতে দেখলাম। অতঃপর তিনি তার দু'বাহু কচ্লাতে শুরু করলেন।[২৯৫]

১০। দু'হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা:

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

অর্থাৎ: উত্তমরূপে ওযূ কর, আঙ্গুলসমূহের মাঝে খিলাল কর এবং সিয়াম পালনকারী না হলে, নাকে ভালভাবে পানি পৌছাও।[২৯৬] যদি আঙ্গুলসমূহ ও তার আশে-পাশের অংশ খিলাল করা ছাড়া ভালভাবে ধৌত করা সম্ভব না হয়, তাহলে তা খিলাল করা ওয়াজিব। যেমনটি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

১১। যে স্থানসমূহ ধৌত করা ফরয তা বেশি করে ধৌত করা:

মুস্তাহাব হলো: পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা এবং মাথার অগ্রভাগ পর্যন্ত মুখমণ্ডল বেশি করে ধৌত করা। এটাকে "إطالة الغرة" তথা, উজ্জ্বলতা দীর্ঘ করণ বলা হয়। আর দু'কনুই ও পায়ের গিঁট বেশি করে ধৌত করা। এটাকে "إطالة التحجيل" তথা শ্রভ্রতা দীর্ঘকরণ বলা হয়। আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মাতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে ওযূর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল থাকবে উজ্জ্বল। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে।[২৯৭]

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ "، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

অর্থাৎ: নু'আইম ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুজমির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি খুব ভালোভাবে মুখমণ্ডল ধুলেন, এরপর ডান হাত ধুলেন এবং বাহুর কিছু অংশ ধুলেন। পরে বাম হাত ও বাহুর কিছু অংশসহ ধুলেন। এরপর মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর ডান পা ও নলার কিছু অংশ ধুলেন, এরপর বাম পা ও নলার কিছু অংশ একইভাবে ধুলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এভাবে ওযূ করতে দেখেছি।[২৯৮] আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন:

سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ، حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ»

---

[২৯৫] সহীহ; ইবনে হিব্বান (১০৮২), বাইহাক্বী (১/১৯৬)।
[২৯৬] সহীহ; এর তাখরীজ পূর্বে করা হয়েছে।
[২৯৭] সহীহ; বুখারী (৩৬), মুসলিম (২৪৬)।
[২৯৮] সহীহ; মুসলিম (২৪৬)।

Contents

অর্থাৎ: আমি আমার বন্ধু রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, যে স্থান পর্যন্ত ওযূর পানি পৌঁছবে, সে স্থান পর্যন্ত মু'মিন ব্যক্তির চাকচিক্য অথবা সৌন্দর্যও পৌঁছবে।[২৯৯]

১২। পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া:

আনাস (رضي الله عنه) বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ

রাসূল (ﷺ) এক সা (৪ মুদ) থেকে ৫ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল এবং এক মুদ পানি দিয়ে ওযূ করতেন।[৩০০]

১ সা = ৪ মুদ, আর এক মুদ = প্রসিদ্ধ প্রায় আধা লিটারের সমান ।

১৩। ওযূর পর দু'আ পাঠ করা:

ইবনে উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ – أَوْ فَيُسْبِغُ – الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

অর্থাৎ: তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি উত্তম ও পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ করার পর বলে:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই , তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল। তাহলে তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে এর যে কোনো দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করতে পারবে।[৩০১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ: আবূ সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি ওযূ করার পর বলবে:

«سُبْحَانَكَ اللهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

'মহা পবিত্র আপনি হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (অর্থাৎ তাওবা করছি)'। তাহলে তার জন্য কাগজে তার আমলনামা লিখে এমনভাবে মুদ্রণ করা হবে, যা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত নষ্ট হবে না।[৩০২]

---

[২৯৯] মুসলিম (২৫০)।

[৩০০] সহীহ; বুখারী (১৯৮), মুসলিম (৩২৫)।

[৩০১] সহীহ; মুসলিম (২৩৪)।

[৩০২] সহীহ; ইমাম নাসাঈ তাঁর আল-কুবরা (৯৯০৯), হাকিম (১/৫৬৪) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের আরও কিছু শাহিদ হাদীস রয়েছে।

www.waytojannah.com

১৪। ওযূর পর দু'রাকআত সালাত আদায় করা:

উসমান (رضي الله عنه) বলেন: আমি রাসূল (ﷺ) কে আমার এ ওযূর মত করে ওযূ করতে দেখেছি। এরপর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থাৎ: 'যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম ওযূ করবে, তারপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না, তার পেছনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে'।[৩০৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلاَلٍ: «عِنْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ

অর্থাৎ: আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) একদিন ফজরের সালাতের সময় বিলাল (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞেস করলেন: হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক যে আমল তুমি করেছ, তার কথা আমার নিকট ব্যক্ত কর। কেননা, জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল (رضي الله عنه) বললেন: দিন রাতের যে কোন প্রহরে আমি তুহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই সে তুহারাত দ্বারা সালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাকদীরে লেখা ছিল। আমার কাছে এর চাইতে অধিক আশাব্যঞ্জক হয়, এমন কোন বিশেষ আমল আমি করি নি।[৩০৪]

ওযূর পর অঙ্গ সমূহ মুছে শুষ্ক করা বৈধ:

এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয় নি। সুতরাং তা বৈধ। যদি বলা হয় যে, এ ব্যাপারে মাইমূনা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাসূল (ﷺ) এর গোসলের পর একটি গামছা নিয়ে আসলেন, কিন্তু তা দিয়ে তিনি শরীর মুছলেন না। বরং হাত দিয়ে শরীর মুছতে মুছতে চলে গেলেন।[৩০৫]
এ ক্ষেত্রে আমরা বলব : এটি শুধু এক দিনের ঘটনা, যা কয়েকটি বিষয়ের সম্ভবনা রাখে। হয়তোবা তিনি গামছাটি গ্রহণ করেন নি তা অপরিষ্কার থাকার কারণে , অথবা তিনি পানি দ্বারা গামছাটি ভিজে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন, ইত্যাদি। মাইমূনা (রা.) এর গামছা আনার মাধ্যমে এ নিদর্শন পাওয়া যায় যে, তাঁর অঙ্গ মোছার অভ্যাস ছিল।[৩০৬] নিম্নোক্ত হাদীসটি এটা বৈধ হওয়ার দলীল কে আরও শক্তিশালী করে।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ

অর্থাৎ: একদা রাসূল (ﷺ) ওযূ করলেন এবং তিনি তার পরিধানের পশমী জুব্বা উঠিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন।[৩০৭]

---

[৩০৩] সহীহ; বুখারী (৬৪৩৩), মুসলিম (২২৬)।
[৩০৪] সহীহ; বুখারী (১১৪৯), মুসলিম (২৪৫৮)।
[৩০৫] সহীহ; বুখারী (২৭০)।
[৩০৬] আশ-শারহুল মুমতি' (১/১৮১), যাদুল মায়াদ (১/১৯৭)।
[৩০৭] এর সনদ হাসানের নিকটবর্তী; ইবনে মাজাহ (৪৬৮,৩৫৬৪)।

www.waytojannah.com

Contents

ইমাম তিরমিযি (৫৪) বলেন: মহানাবী (ﷺ) এর সাহাবাগণ ও তাদের পরবর্তী বিদ্বানগণ ওযূর পর রুমাল বা গামছা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। যারা এটাকে অপছন্দ মনে করেন। তাদের অপছন্দের কারণ হলো- তারা বলে থাকেন যে, ওযূকে পরিমাপ করা হবে।

নখের উপর প্রোলেপ থাকলে ওযূ বিশুদ্ধ হবে না:[৩০৮]

কেননা এর ফলে যে সমস্ত স্থানে পানি পৌঁছানো ফরয, সে সমস্ত স্থানে তা পানি পৌঁছাতে বাধা প্রদান করে। তবে শুধু রং, যেমন: মেহেদী দ্বারা রং করা বা অনুরূপ কিছু হলে, তাতে কোন সমস্যা নেই, তথাপিও তা ওযূ ও সালাতের পূর্বে দূর করাই উত্তম। যেমন:

عن ابن عباس قال نساءنا يختضبن أحسن خضاب يختضبن بعد العشاء ويترعن قبل الفجر .

অর্থাৎ: ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) বলেন: আমাদের মহিলারা উত্তম খেজাব ব্যবহার করে। তারা ঈশার সালাতের পরে খেজাব ব্যবহার করে এবং ফজরের পূর্বে তা খুলে ফেলে।[৩০৯]

যে মহিলা ওযূ ছাড়াই হাতে মেহেদী বা খেজাব লাগাবে অতঃপর সালাতের সময় হবে, তার ব্যাপারে ইবরাহীম আন নাখঈ বলেন: تترع ما على يديها إذا أرادت أن تصلي - অর্থাৎ: যখন সে সালাত আদায় করার জন্য ইচ্ছা করবে, তখন হাতে যা লাগানো থাকবে তা মুছে ফেলবে।[৩১০]

ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহ

ওযূ ভঙ্গের কারণ বলতে এমন বিষয় বুঝায়, যার মাধ্যমে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। ওযূ ভঙ্গের কারণগুলো হলো:

১। দু'রাস্তা দিয়ে পেশাব, পায়খানা অথবা বায়ু নির্গত হওয়া:

পেশাব ও পায়খানার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾

অর্থাৎ: তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে আসে *(সূরা মায়িদা -৬)* ।

অত্র আয়াতে 'الْغَائِطِ' শব্দ উল্লেখ করে মল-মূত্র ত্যাগ তথা পেশাব পায়খানাকে বুঝানো হয়েছে। বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, দু'রাস্তা তথা সামনে ও পিছন দিয়ে পেশাব-পায়খানা নির্গত হওয়ার কারণে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে।[৩১১]

আর যদি তা সামনে বা পেছনের রাস্তাদিয়ে বের না হয়ে অন্য স্থান দিয়ে বের হয়। যেমন: মুত্রাশয় বা পেটের কোন স্থান যখম হয়ে নির্গত হয়। এ ক্ষেত্রে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ শুধু নির্গত হওয়াকেই ধর্তব্য মনে করেন, যেমন আবূ হানীফা, সাওরী, আহমাদ ও ইবনে হাযম (রাহি.)। তারা বলেন: শরীরের যে কোন স্থান দিয়ে নাপাক নির্গত হলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে।

---

[৩০৮] ফিক্বহুস সুন্নাহ লিননিসা (পৃ. ৩৯)।

[৩০৯] এর সনদ সহীহ; ইবনে আবি শায়বা (১/১২০)।

[৩১০] এর সনদ সহীহ; বাইহাকী (১/৭৭, ৭৮)।

[৩১১] আল-ইজমা' (পৃ. ১৭), ইবনু মুনযির প্রণীত আল আউসাত (১/১৪৭)।

www.waytojannah.com

আবার কেউ শুধু দু'রাস্তা দিয়ে নির্গত হওয়াকেই ধর্তব্য মনে করেন। যেমন: ইমাম শাফেঈ। তিনি বলেন: যদি এ দু'রাস্তা দিয়ে কোন কিছু নির্গত হয়, তাহলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে, যদিও নির্গত বস্তুটি নাপাক না হয়। যেমন: কংকর বা অনুরূপ কিছু।[৩১২]

আর বায়ু যদি পিছনের রাস্তা দিয়ে শব্দসহ বা শব্দবিহীন নির্গত হয়, তাহলে সকলের ঐক্যমতে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। মহানাবী (ﷺ) বলেন:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ

অর্থাৎ: 'যে ব্যক্তির হাদাস হয় তার সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে ওযূ করে। হাযরা-মাওতের এক ব্যক্তি বলল, 'হে আবূ হুরাইরাহ! হাদাস কী?' তিনি বললেন, 'নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু বের হওয়া'।[৩১৩]

যদি সামনের রাস্তা দিয়ে বায়ু নির্গত হয়, তাহলে অধিকাংশের মতে[৩১৪] ওযূ নষ্ট হবে এবং ইমাম আবূ হানীফা ও ইবনে হাযমের মত অনুসারে ওযূ নষ্ট হবে না। কেননা 'فُسَاءٌ' এবং 'ضُرَاطٌ' এমন দুটি নাম, যা পেছনের রাস্তাদিয়ে বের না হলে তাকে বায়ু বলা যায় না।[৩১৫]

আমার বক্তব্য: যদি বায়ু নির্গত হওয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, তাহলে তা সামনের বা পেছনের যে কোন রাস্তা দিয়ে নির্গত হোক না কেন, ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি স্পষ্ট বুঝা না যায়, তাহলে শুধু পেছনের রাস্তাই ধর্তব্য।

সতর্ক বাণী: কখনও কখনও মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে বায়ুর মত কিছু নির্গত হওয়া অনুভব করা যায়। মূলতঃ এটা একটা আলোড়ন বা ঝাকুনী। এটা নির্গত হওয়া বায়ু নয়। এ ক্ষেত্রে তার ওযূ নষ্ট হবে না। কেননা এটা একটা আওয়াজ বা অনুরূপ কিছুর স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু যদি মহিলার পেশাব পায়খানার দ্বার ছিড়ে একত্রিত হয়ে যায়, তাহলে গুহ্যদার দিয়ে বায়ু নির্গত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় সতর্কতামূলক ওযূ করবে।

২। মনি, ওদি ও মযি নির্গত হলে:

মনি নির্গত হলে সকলের ঐক্যমতে ওযূ নষ্ট হবে এবং গোসল ওয়াজিব হবে। গোসলের ব্যাপারে সামনে আলোচনা করা হবে। সর্বসম্মতিক্রমে যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয় সেসব কারণে ওযূ নষ্ট হয়।[৩১৬]

মযির মাধ্যমে ওযূ নষ্ট হয়। যেমন আলী ইবনে তালিব (رضي الله عنه) বলেন:

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ فَقَالَ: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ

অর্থাৎ: আমার অধিক মযি বের হতো। নাবী (ﷺ) এর কন্যা আমার স্ত্রী হওয়ায় লজ্জার কারণে আমি একজনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পাঠালাম। তিনি প্রশ্ন করলে রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন যে, তুমি ওযূ কর ও লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেল।[৩১৭]

---

[৩১২] আল মুহাল্লা (১/২৩২), বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/৪০), আল-আউসাত্ব (১/১৩৭)।
[৩১৩] সহীহ; বুখারী (১৩৫), মুসলিম (২২৫)।
[৩১৪] বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/৪০), আল-উম্ম (১/১৭)।
[৩১৫] আল মুহাল্লা (১/২৩২), আল-মাসবূত্ব (১/৮৩)।
[৩১৬] আল-ইফসাহ (১/৭৮), আল-ইজমা' (পৃ. ৩১)।
[৩১৭] সহীহ; বুখারী (২৬৯), মুসলিম (৩০৩)।

Contents

ওদির হুকুমও অনুরূপ। সুতরাং উভয়টি (মযি ও ওদির) ক্ষেত্রে লজ্জাস্থান ধৌত করা ও ওযূ করা ওয়াজিব।

عن بن عباس قال : المني والودي والمذي أما المني فهو الذي منه الغسل وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة

অর্থাৎ: ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন মনি, ওদি ও মযির হুকুম হলো: মনি নির্গত হলে গোসল করতে হবে। আর ওদি ও মযির ব্যাপারে তিনি বলেন: তা নির্গত হলে তোমার লজ্জাস্থান ধৌত কর এবং সালাতের জন্য ওযূ কর।[৩১৮]

প্রয়োজনীয় কথা:

যে ব্যক্তি বহুমূত্র রোগে ভুগে অথবা অত্যধিক মযি নির্গত হয় কিংবা পূর্বোল্লেখিত নাপাকীগুলো বারবার নির্গত হয়, যার ফলে শারীরিক অসুস্থতার কারণে চলাফেরা কষ্টকর হয় পড়ে, তাহলে সে তার কাপড়ে ও শরীরে যা লেগেছে তা ধুয়ে ফেলবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযূ করবে । যেমনটি মুস্তাহাযার রোগী করে থাকে (মুস্তাহাযার ব্যাপারে সামনে আলোচনা করা হবে)। এরূপ করার পর সালাতে অথবা ওযূ ও সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে যা নির্গত হবে তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

৩। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ব্যক্তি, যার কোন অনুভূতি নেই:

ঘুমের কারণে ওযূ নষ্ট হবে কি না, এ সংক্রান্ত আসারগুলো একটি অপরটির প্রকাশ্য বিরোধী। এ সংক্রান্ত এমন কিছু হাদীস রয়েছে, যা স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, মূলতঃ ঘুমের কারণে ওযূ নষ্ট হয় না। আবার এমনও হাদীস রয়েছে, যা স্পষ্টভাবে ঘুম হাদাস (ওযূ ভঙ্গকারী) হওয়াকে আবশ্যক করছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিদ্বানদের দু'টি মাযহাব পরিলক্ষিত হয়। সমন্বয় প্রদানকারী মাযহাব ও প্রাধান্য দানকারী মাযহাব। যারা প্রাধান্য দানকারী তাদের কেউ বলেছেন: সাধারণভাবে ঘুম ওযূকে নষ্ট করে, তা হাদাস নয়। আবার কেউ সাধারণভাবে ঘুমের কারণে ওযূ করা ওয়াজিব বলেছেন। তারা আরও বলেন, ঘুম হাদাসের অন্তর্ভুক্ত। আর সমন্বয়কারী মাযহাবের অনুসারীরা বলেন, ঘুম হাদাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটা শুধু হাদাসের ধারণা সৃষ্টি করে। এ সমস্ত বিদ্বানগণ মূলতঃ যে ঘুম ওযূকে ওয়াজিব করে সে ঘুমের সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ করেছেন। এ ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ তিনটি পথ অবলম্বন করেছেন। ফলে তাদের মাঝে ৮ টি অভিমতের জন্ম হয়েছে।[৩১৯] তা হলো-

১ম মতামত: ঘুম সাধারণভাবে ওযূ নষ্ট করে না:

এটা সাহাবাদের একটি জাম'আত তথা ইবনে উমার, আবূ মুসা আল আশয়ারী এর অভিমত। সাঈদ ইবনে যুবাইর, মাকহুল, ইবাইদাতুস সালমানী ও আওযায়ীসহ অন্যান্য বিদ্বানরাও এ মত পেশ করেছেন। তাদের দলীল হলো:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ

---

[৩১৮] এর সনদ সহীহ; বাইহাক্বী (১/১১৫)।

[৩১৯] আল মুহাল্লা (১/২২২-২৩১), আল ইস্তিযকার (১/১৯১) আল আউসাত্ব (১/১৪২), ফাতহুল বারী (১/৩৭৬), ইমাম নাববী প্রণীত 'শরহে মুসলিম' (২/৩৭০), নাইলুল আওতার (১/২৪১)।

www.waytojannah.com

(১) আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: একদিন সালাতের জন্য ইকামত দেয়া হয়ে গেল। কিন্তু নাবী (ﷺ) তখনও এক ব্যক্তির সাথে চুপি চুপি আলাপ করছিলেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ আলাপ করলেন। এমনকি সাহাবারা সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর তিনি আসলেন এবং তাদের সাথে করে সালাত পড়লেন।[৩২০]

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ» قَالَ: قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ: إِي وَاللهِ

(২) ক্বাতাদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমি আনাস (رضي الله عنه) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সাহাবাগণ ঘুমিয়ে পড়তেন। কিন্তু পরে ওযূ না করেই সালাত পড়তেন। শুবা বলেছেন, আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, আপনি একথা আনাসের কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্‌র কসম আমি এটি শুনেছি![৩২১] অপর বর্ণনায় আছে:

ينظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم , ثم يقومون إلى الصلاة

অর্থাৎ: তারা সালাতের জন্য অপেক্ষা করতেন। ফলে তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন, এমন কি তাদের মাথা ঢোলে পড়ত। অতঃপর তারা সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হতেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَيْقِظِينِي، " فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي، قَالَ: فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাতে আমি আমার খালা মাইমূনা (রা.) এর ঘরে রাত্রিযাপন করলাম। আমি আমার খালাকে বললাম রাসূল (ﷺ) রাতের সালাতের জন্য উঠলে আমাকে জাগিয়ে দিবেন। অতঃপর রাতে রাসূল (ﷺ) সালাত আদায়ের জন্য উঠলে আমিও তাঁর সাথে উঠলাম এবং তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার হাত ধরে তাঁর ডান পাশে নিলেন। পরে যখনই আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, তখন তিনি আমার কানের নিম্নভাগ ধরে টান দিচ্ছিলেন। ইবনে আব্বাস বলেন: এগারো রাকআত সালাত আদায় করলেন।[৩২২]

(৪) ইবনে আব্বাস (রা.) মাইমূনাহ (রা.) এর বাড়িতে অবস্থানকালে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে:

ثُمَّ نَامَ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

এরপর তিনি শুয়ে পড়লেন। এমন কি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর উঠে তিনি সালাতের জন্য বের হলেন।[৩২৩]

অপর বর্ণনায় রয়েছে, ثم قام فصلى ولم يتوضأ অর্থাৎ: তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। অথচ ওযূ করলেন না।

---

[৩২০] সহীহ; বুখারী (৬৪২), মুসলিম (৩৭৬)।
[৩২১] সহীহ; মুসলিম (৩৭৬), তিরমিযী (৭৮)।
[৩২২] সহীহ; বুখারী (১১৭), মুসলিম (৭৬৩) শব্দগুলো মুসলিমের।
[৩২৩] সহীহ; বুখারী (১১৭), মুসলিম (১৮৪), আহমাদ (১/৩৪১)।

Contents

২য় অভিমত: ঘুম সাধারণভাবে ওযূ নষ্ট করে:

অল্প ঘুম হোক আর বেশি হোক, কেউ ঘুমালেই ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। এটা আবূ হুরাইরাহ, আবূ রাফে, উরওয়াহ বিন যুবাইর, আত্বা, হাসাহ বসরী, ইবনুল মুসাইয়্যিব, যুহরী, মাযিনী, ইবনুল মুনযির ও ইবনে হাযম এর অভিমত। আলবানী এমতটিকে পছন্দ করেছেন।

(১) সফওয়ান বিন আস্সাল (رضي الله عنه) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلَا نَنْزِعَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ»

অর্থাৎ: আমরা যখন সফরে থাকতাম, তখন রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে জানাবাতের অপবিত্রতা ছাড়া তিনদিন ও তিন রাত মোজা না খুলে তার উপর মাসাহ করার নির্দেশ দিতেন। তবে পেশাব-পায়খানা ও ঘুমের কারণে কোন সমস্যা হতো না।[৩২৪]

তারা বলেন, মহানাবী (ﷺ) ব্যাপকভাবে (আমভাবে) ঘুমের কথা বলেছেন। তিনি কম বা বেশি ঘুমকে নির্দিষ্ট করেন নি এবং কোন অবস্থাকেও নির্দিষ্ট করেন নি। আর তিনি ঘুমকে পেশাব-পায়খানার সাথে তুলনা করে সমানভাবে বর্ণনা করেছেন।

(২) আলী ইবনে আবূ তালিব (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

«وِكَاءُ السَّهِ[৩২৫] الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ»

অর্থাৎ: দু'চোখ হলো গুহ্যদারের বাঁধন স্বরূপ। সুতরাং যে ব্যক্তি ঘুমাবে, সে যেন ওযূ করে।[৩২৬] এ হাদীসটি যঈফ।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ»

(৩) আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: সালাত আদায়ের অবস্থায় তোমাদের কারও যদি তন্দ্রা আসে, তবে সে যেন ঘুমের রেশ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেয়। কারণ, তন্দ্রা অবস্থায় সালাত আদায় করলে সে জানতে পারে না, সে কি ক্ষমা চাচ্ছে, না নিজেকে গালি দিচ্ছে।[৩২৭]

অত্র হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী (রাহি.) তাঁর স্বীয় গ্রন্থ "সহীহুল বুখারী" -তে ঘুমের কারণে ওযূ ওয়াজিব হওয়ার দলীল দিয়েছেন। ইমাম বুখারী (রাহি.) এর এ দলীলের ব্যাপারে একটু ভাবার বিষয় রয়েছে, বলে আমি মনে করি। কেননা, অত্র হাদীসে ঘুমের কারণে সালাত পরিত্যাগ করার কারণ হিসেবে যা বর্ণনা

---

[৩২৪] হাসান; নাসাঈ (১/৩২), তিরমিযী (৩৫৩৫) ইবনে মাজাহ (৪৭৮), আল ইরওয়া (১০৪)।

[৩২৫] "السه" বলা হয়, গুহ্যদ্বারের বৃত্তকে। আর "الوكاء" বলা হয়, এমন ফিতা বা দড়িকে যার দ্বারা মশকের মুখ বাঁধা হয়। সুতরাং দু'চোখ জেগে থাকাকে মশকের দড়ির সাথে তুলোনা করা হয়েছে। কেননা যখন দু'চোখ ঘুমিয়ে যায় তখন দড়ি বা বাঁধন খুলে যায়। ফলে তা থেকে বায়ু নির্গত হয়।

[৩২৬] যঈফ; আবূ দাউদ (২০৩), ইবনে মাজাহ (৪৭৭) প্রভৃতি। এভাবে যঈফ হওয়াটাই অগ্রাধিকারযোগ্য। যদিও আলবানী তাকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

[৩২৭] সহীহ; বুখারী (২১২), মুসলিম (২২২)।

www.waytojannah.com

করা হয়েছে তা হলো, ঘুমন্ত অবস্থায় সালাত আদায় করলে নিজেকে গালি দেয়া, অবান্তর কথা-বার্তা বলা অথবা এ সময় সালাতে মনোনিবেশ না থাকার আশঙ্কা থাকে। ফলে সালাতের একাগ্রতা নষ্ট হয়। ঘুমের কারণে ওযূ করতে হবে এ কথা এখানে বলা হয় নি। বরং এ হাদীস দ্বারা কেউ কেউ ঘুমের কারণে ওযূ নষ্ট না হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন। সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।

(৪) তারা বলেন: বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি পাগল হওয়ার কারণে আকল নষ্ট হয় অথবা অজ্ঞান হয় তার ওযূ করা ওয়াজিব। সুতরাং ঘুমের হুকুমও অনুরূপ।

৩য় অভিমত: অধিক ঘুম হলে সর্বাবস্থায় ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে, তবে অল্প ঘুম হলে নষ্ট হবে না:
এটা ইমাম মালিক এর অভিমত এবং একটি রিওয়ায়াতে ইমাম আহমাদ (রাহি.) এ অভিমত পেশ করেছেন। যুহরী, রাবিয়া ও আওয়াযীও এমতের প্রবক্তা। তারা আনাস (ﷺ) এর হাদীসকে সাহাবাদের কম ঘুমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেন। এর প্রমাণে তারা আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) এর হাদীস পেশ করেন:

عَنْ أَبِي هريرة قال من استحق النوم فوجب عليه الوضوء

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি প্রবল ঘুমে আচ্ছন্ন হবে, তার ওযূ করা ওয়াজিব।[৩২৮] হাদীসটি মাওকূফ সূত্রে সহীহ। আর ইবনে আব্বাস (ﷺ) এর হাদীসে বর্ণিত আছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلاَّ مَنْ خَفَقَ برأسه خفقة أو خفقتين

অর্থাৎ: ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রত্যেক ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য ওযূ করা ওয়াজিব। তবে যদি একবার অথবা দু'বার মাথা ঢোলে তাহলে তার ওযূ ওয়াজিব নয়।[৩২৯]

৪র্থ অভিমত: শুয়ে বা হেলান দিয়ে ঘুমালে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে:
আর যে ব্যক্তি সালাতের কোন অবস্থা তথা রুকু, সিজদা, দণ্ডায়মান বা বসা অবস্থায় ঘুমাবে, তার ওযূ নষ্ট হবে না। চাই সালাতে হোক বা সালাতের বাইরে হোক। এটা হাম্মাদ, সাওরী, আবূ হানীফা ও তাঁর অনুসারী, ইমাম দাউদ ও ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এর মতামত। **তাদের দলীল হলো:**

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ ليس على من نام قائما أو قاعدا وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض

(১) আমর বিন শুয়াইব তার পিতা হতে, তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন , রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বা বসে ঘুমায় তাকে ওযূ করতে হবে না। তবে জমিনে হেলোান দিয়ে ঘুমালে ওযূ করতে হবে।[৩৩০] এ হাদীসটি যঈফ। সহীহ নয়।

---

[৩২৮] মাওকূফ সহীহ; ইবনু আবি শায়বাহ (১/১৫৮), আবদুর রাযযাক (৪৮১) সহীহ সনদে মাওকূফ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদীসটি মারফূ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, তবে তা সহীহ নয়। যেমন দারাকুতনী তার আল ইলাল (৮/৩২৮) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আয-যঈফা (৯৫৪)।

[৩২৯] মাওকূফ ও মারফূ' সূত্রে যঈফ; আবদুর রাযযাক (৪৭৯), বাইহাক্বী (১/১১৯), ইলালুদ দারাকুতনী (৮/৩১০)।

[৩৩০] মুনকার; ইবনু আদী প্রণীত আল কামিল (৬/২৪৫৯) দারাকুতনী (১/১৬০) এবং ইমাম ত্বাবারাণী তার আল-আওসাত্ব গ্রন্থে।

Contents

(২) আনাস (রাঃ), রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করে বলেন:

إذا نام العبد في سجوده باهى الله عز وجل به ملائكته , قال : انظروا إلى عبدي, روحه عندي و جسده في طاعتي

অর্থাৎ: যখন কোন বান্দা সিজদারত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে, তখন এ নিয়ে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের কাছে গর্ববোধ করে বলে, তোমরা আমার বান্দার দিকে দেখ, তার আত্মা আমার কাছে রয়েছে এবং তার শরীর আমার আনুগত্য করছে![৩৩১]

তারা মুসল্লির সালাত আদায়ের সকল অবস্থাকে সাজদার উপর ক্বিয়াস করে।

আমার বক্তব্য: এ হাদীসটি সনদগত ভাবে দুর্বল। ইমাম বায়হাকী বলেন: এ হাদীসে ঘুমের কারণে সালাত বাতিল করতে হবে এ কথাও বলা হয় নি। তবে হাদীসটি যদি সহীহ হয় তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ বান্দার প্রশংসা করা, যে সালাতে অটল থাকে, এমনকি এক পর্যায়ে সে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়।

৫ম মতামত: শুধু রুকু ও সাজদারত অবস্থায় ঘুমালে ওযূ নষ্ট হবে:

ইমাম নাববী এ অভিমতটিকে ইমাম আহমাদ (রাহি.) এর দিকে সম্বধোন করেছেন। সম্ভবত এর কারণ হলো, রুকু ও সাজদারত অবস্থায় ঘুমানোর ফলে ওযূ ভঙ্গের ধারণা সৃষ্টি হয়।

৬ষ্ঠ মতামত: শুধু সাজদারত অবস্থায় ঘুমালে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে:

অনুরূপভাবে এটাও ইমাম আহমাদের বর্ণনা বলা হয়ে থাকে।

৭ম মতামত: সালাতের মধ্যে যে কোন অবস্থায় ঘুমালে ওযূ নষ্ট হবে না:

তবে সালাতের বাইরে ঘুমালে ওযূ নষ্ট হবে। এটা আবূ হানীফা (রাহি.) এর বর্ণনা। ৪র্থ মতামতে যে হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে, সে হাদীসের কারণে ইমাম আবূ হানীফা (রাহি.) এ মতামত দিয়েছেন।

৮ম মতামত: যদি কেউ জমিনে বসে ঘুমায়, চায় তা সালাতে হোক কিংবা সালাতের বাইরে হোক, কম ঘুম হোক কিংবা বেশি ঘুম হোক, তাহলে ওযূ নষ্ট হবে না:

এটা ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এর অভিমত। কারণ তার নিকট ঘুম নিজে হাদাস (নাপাক) নয়। বরং তা হাদাসের ধারণা সৃষ্টি করে। ইমাম শাফেঈ বলেন: "কেননা বসে ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছন জমিনে লেগে থাকার ফলে তা থেকে কিছু বের হওয়ার সম্ভবনা থাকে না। বরং বের হওয়ার সময় তাকে তা সতর্ক করে দিতে পারে"। ইমাম শাওকানী (রাহি.) এ অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন।

আমার বক্তব্য: এ মতের অনুসারীরা আনাস (রাঃ) এর হাদীসটিকে সাহাবাদের বসে ঘুমানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেন। অথচ হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রাহি.) 'ফতহুল বারী' (১/২৫১) তে তা প্রত্যাখান করে বলেন: এ হাদীসের ব্যাপারে 'মুসনাদুল বাযযার' এ সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবাগণ তাদের পার্শ্ব রেখে কেউ কেউ ঘুমিয়ে যেতেন। অতঃপর উঠে সালাত আদায় করতেন।[৩৩২]

---

[৩৩১] যঈফ; সিলসিলাতুয যঈফাহ (৯৫৩)।

[৩৩২] এর সনদ সহীহ; ইমাম বাযযার ও তার মত অনেকেই এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এবং আবূ দাউদ তার মাসায়েলে আহমাদ (পৃ. ৩১৮), গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদ শাইখাইনের শর্তানুসারে সহীহ। যেমনটি এসেছে 'তামামুল মিন্না (পৃ. ১০০) গ্রন্থে।

www.waytojannah.com

বিশুদ্ধ অভিমতঃ

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ব্যক্তি, যে কোন কিছু বুঝতে পারে না, এমন কি তার পাশের ব্যক্তির কোন শব্দ শুনতে পায় না অথবা তার হাত থেকে কোন কিছু পড়ে গেলে তা বুঝতে পারে না কিংবা মুখ দিয়ে লালা বা এ জাতীয় কিছু নির্গত হলে তা টের পায় না, এমন ব্যক্তির ওযূ নষ্ট ইয়ে যাবে। কেননা তা হাদাসের ধারণা সৃষ্টি করে। চায় সে দাড়িয়ে, বসে, শুয়ে, রুকু কিংবা সিজদা যে কোন অবস্থায় থাক না কেন। এগুলোর কোনটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি ১ম মতের অনুসারীরা ঘুম দ্বারা এ প্রকারের ঘুম উদ্দেশ্য করে থাকেন, তাহলে আমরা তাদের মতকে সমর্থন করি। এছাড়া স্বল্পঘুম যাকে তন্দ্রা বলা হয়, যার কারণে মানুষ কিছু অনুধাবন করতে পারে না যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তার ফলে ওযূ নষ্ট হবে না, সে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন। কেননা সাহাবাদের ঘুমের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, 'তাদের মাথা ঢোলে পড়ত'। আবার আল্লাহর রাসূলের সাথে সালাত আদায়ের ব্যাপারে বর্ণিত ইবনে আব্বাসের হাদীসও এর প্রমাণ বহন করে। এভাবেই এ ব্যাপারে বর্ণিত সকল দলীলগুলোর মাঝে আমরা সমাধান দিতে পারি। ولله الحمد والمنة (সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই)।

প্রসঙ্গ কথাঃ

যেহেতু ঘুমের মাধ্যমে, ওযূ ওয়াজিব করে এমন হাদাসের ধারণা সৃষ্টি হয়, সেহেতু ওযূ ভঙ্গের বিধানটা ওযূকারীর ঘুমের অবস্থাভেদে তার উপর অর্পিত হবে এবং প্রবল ধারণাটাই বিবেচিত হবে। যদি সে সন্দেহ করে যে, ঘুমের কারণে তার ওযূ নষ্ট হয়েছে, না হয় নি? তাহলে স্পষ্ট কথা হলো, ওযূ ভঙ্গ না হওয়ার বিধানই কার্যকর হবে। কেননা পূর্বে থেকেই নিশ্চিতভাবে পবিত্রতা সাব্যস্ত আছে। সুতরাং তা সন্দেহ দ্বারা দূর হবে না। শাইখুল ইসলাম তার 'ফতওয়া' গ্রন্থে (২১/২৩০) এ অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন।

৪। **নেশাগ্রস্ত, জ্ঞানশূন্য কিংবা পাগল হওয়ার ফলে আকল নষ্ট হলেঃ** সর্বসম্মতিক্রমে ওযূ নষ্ট হবে।[৩৩৩] ওযূ ভঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে এ অবস্থাগুলোর কারণে স্মৃতি নষ্ট হওয়াটা, ঘুমের চাইতেও বেশি গুরুতর।

৫। কোন আবরণ ছাড়া লজ্জাস্থান স্পর্শ করা, চাই তা কাম প্রবৃত্তিসহ হোক বা না হোকঃ

বিদ্বানগণ ওযূর ক্ষেত্রে লজ্জাস্থান স্পর্শ করার ব্যাপারে চারটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ চারটি অভিমতের দু'টিকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, আর দু'টিকে সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১ম মতামতঃ সাধারণত লজ্জাস্থান স্পর্শের ফলে ওযূ নষ্ট হয় নাঃ

এটা ইমাম আবূ হানীফা (রাহি.) এর অভিমত। ইমাম মালিক (রাহি.) এর কয়েকটি রিওয়ায়াতের মধ্যে এটি একটি রিওয়ায়াত। সাহাবাদের একটি দলের পক্ষ থেকেও এ অভিমতটি বর্ণিত হয়েছে।[৩৩৪]

---

[৩৩৩] ইবনু মুনযির প্রণীত আল-আওসাত্ব (১/১৫৫)।

[৩৩৪] আল-বাদাঈ (১/৩০), শরহে ফাতহুল কাদীর (১/৩৭), আল মুদাও ওয়ানাহ (১/৮-৯), আল-ইস্তিযকার (১/৩০৮ থেকে পরবর্তী)।

www.waytojannah.com

Contents

নিম্নোক্তভাবে তারা দলীল দিয়ে থাকেন-

(ক) ত্বলাক বিন আলী থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি এমন অন্য এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে মহানাবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেন, যিনি ওযূ করার পর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: পুরুষাঙ্গ তো একটি গোশতের টুকরা অথবা গোশতের খণ্ড মাত্র।[৩৩৫]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) কে প্রশ্ন করে বললেন:

بينما أنا أصلي فذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري فقال النبي ﷺ إنما هو منك

অর্থাৎ: আমি যদি সালাতরত অবস্থায় রান চুলকানোর সময় লজ্জাস্থান স্পর্শ করে ফেলি, তাহলে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তখন তিনি বললেন: এটাতো তোমার দেহের অংশ মাত্র।[৩৩৬]

(খ) তারা বলেন যে, যদি লজ্জাস্থান রান বা উরুকে স্পর্শ করে, তাহলে ওযূ ওয়াজিব নয়। এ ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেন নি। আর হাত ও রানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সামনে আলোচিত বুসরাহ[৩৩৭] এর হাদীসে লজ্জাস্থান স্পর্শের ফলে ওযূ করার যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা তার সামলোচনা করেন।

২য় অভিমত: সাধারণত লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে:

এটা ইমাম মালিক (রাহি.) এর প্রসিদ্ধ অভিমত। ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও ইবনে হাযমও এ মতামত পেশ করেছেন। এটা অধিকাংশ সাহাবাদের পক্ষ থেকে বর্ণিত।[৩৩৮] **তাদের দলীল হলো:**

(ক) বুসরাহ বিনতে সাফওয়ান থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন: "من مس ذكره فليتوضأ" অর্থাৎ: যে ব্যক্তি তার লিঙ্গ স্পর্শ করবে, সে যেন ওযূ করে।[৩৩৯]

(খ) উম্মে হাবীবাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন: "من مس فرضه فليتوضأ" অর্থাৎ: যে তার গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করবে, সে যেন ওযূ করে।[৩৪০]

উপরোক্ত দু'জনের হাদীসের অনুরূপ আবূ হুরাইরাহ, আরওয়া বিনতে উনেইস, আয়িশা, জাবির, যায়িদ বিন খালিদ ও আব্দুল্লাহ বিন আমর এর পক্ষ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তারা বলেন: বুসরাহ এর হাদীস ত্বলাক এর হাদীসের উপর প্রাধান্য পাবে। তার কারণ হলো:

(১) ত্বলাক (ﷺ) বর্ণিত হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত। আবূ যুর'আ ও আবূ হাতেম হাদীসটি ত্রুটিপূর্ণ বলে অবহিত করেছেন। আর ইমাম নাববী (রাহি.) 'আল মাজমু' গ্রন্থে (২/৪২) হাদীসটি ত্রুটিপূর্ণ উল্লেখ করে বলেন: "হাদীস বিশারদগণ হাদীসটি যঈফ হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন"।

---

[৩৩৫] এর সনদ লাইয়্যিন; আবূ দাউদ (১৮২), তিরমিযী (৮৫), নাসাঈ (১/১০১)। এ হাদীসের সহীহ হওয়া নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে কায়েস বিন ত্বাল্ক এর কারেনে যঈফ হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। আলবানী এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

[৩৩৬] এর সনদ যঈফ; আবূ দাউদ (১৮৩), আহমাদ (৪/২৩), বাইহাক্বী (১/১৩৫), প্রভৃতি।

[৩৩৭] আল-আওসাত্ব (১/২০৩), শরহে মায়ানীল আসার (১/৭১-৭৯)।

[৩৩৮] আল-ইস্তিযকার (১/৩০৮), আল- মুদাও ওয়ানাহ (১/৮-৯) আল-উম্ম (১/১৯), আলমাজমু (১/২৪), আল-মুগনী (১/১৭৮) আল-ইনসাফ (১/২০২), আল-মুহাল্লা (১/২৩৫)।

[৩৩৯] সহীহ; আবূ দাউদ (১৮১), নাসাঈ (১/১০০), ইবনে হিব্বান (১১১২)।

[৩৪০] শাহেদ থাকার কারণে সহীহ; ইবনে মাজাহ (৪৮১), আবূ ইয়া'লা (৭১৪৪), বাইহাক্বী (১/১৩০), আল-ইরওয়া (১১৭)।

www.waytojannah.com

(২) আর যদি তা সহীহ হয়, তাহলে বুসরাহ এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) এর হাদীসটিই অগ্রগণ্য হবে। কেননা সাহাবারা মাসজিদে কুবা নির্মানের সময় ত্বলাক মদিনায় গিয়েছেন। আর আবূ হুরাইরাহ তার ছয় বছর পর খায়বারের বছর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) এর হাদীস ত্বলাক (رضي الله عنه) এর হাদীসকে মানসূখ বা রহিতকারী।[৩৪১]

(৩) ত্বলাকের হাদীসটি মূলের উপর অবশিষ্ট আছে। আর বুসরার হাদীসটি তার নাকেল (বর্ণনাকারী) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আর নাকেল সর্বদা অগ্রগণ্য। কেননা শরীয়াত প্রণেতার হুকুমগুলো পূর্বে যা ছিল তা থেকে নকলকারী।

(৪) লজ্জাস্থান স্পর্শের কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার বর্ণনাগুলোই অধিক এবং হাদীসগুলো বেশি প্রসিদ্ধ।

(৫) এটা অধিকাংশ সাহাবীর অভিমত।

(৬) ত্বলাক (رضي الله عنه) এর হাদীসটি রান চুলাকানোর সময় কাপড়ের উপর দিয়ে হাত লজ্জা স্থানে স্পর্শ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমনটি হাদীসটির বর্ণনা দ্বারাই বুঝা যাচ্ছে যে, প্রশ্নকারী সালাত রত অবস্থায় এরূপ করেছিলেন।

৩য় অভিমতঃ কাম প্রবৃত্তি সহ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হবে, আর কাম প্রবৃত্তি ছাড়া করলে ওযূ নষ্ট হবে নাঃ

এটা ইমাম মালিক (রাহি.) এর একটি বর্ণনা। আল্লামা আলবানী (রাহি.) তা পছন্দ করেছেন।[৩৪২] এ অভিমতকারীদের মতেঃ বুসরা (رضي الله عنه) এর হাদীস কাম প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ত্বলাক (رضي الله عنه) এর হাদীসটি কাম প্রবৃত্তি ছাড়া স্পর্শ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তারা বলেন, মহানাবী (ﷺ) এর বাণী "এটা তোমার শরীরের একটি অংশ" এর দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। কেননা যখন কাম প্রবৃত্তি ছাড়াই লিঙ্গস্পর্শ করা হবে, তখন তা সমস্ত অঙ্গ স্পর্শ করার মতই হবে।

৪র্থ মতামতঃ লিঙ্গ স্পর্শ করার কারণে সাধারণভাবে ওযূ করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়ঃ

এটা ইমাম আহমাদ (রাহি.) এর দু'টি বর্ণনার মধ্যে একটি বর্ণনা। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহও এ মতামত পেশ করেছেন। আল্লামা ইবনে উসাইমীন (রাহি.) এ মতের দিকেই ধাবিত হয়েছেন। তবে তিনি কাম প্রবৃত্তি ছাড়া লিঙ্গ স্পর্শ করার ক্ষেত্রে ওযূ করা মুস্তাহাব এবং কাম প্রবৃত্তিসহ স্পর্শ করলে দৃঢ়ভাবে ওযূ করা ওয়াজিব হবে বলেছেন । সতর্কতামূলক তিনি এ কথা বলেছেন।[৩৪৩] সুতরাং তারা বুসরাহ (رضي الله عنه) এর হাদীসকে মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন। আর ত্বলাকের হাদীসে যে প্রশ্নটা ছিল তা মূলতঃ ওযূ ওয়াজিব কিনা সে ব্যাপারে।

---

[৩৪১] যারা এটাকে মানসূখের কথা বলেছেন তারা হলেন, ত্বাবারনী তাঁর 'আল কাবীর' (৮/৪০২) গ্রন্থে, ইবনু হিব্বান (৩/৪০৫ -إحسان পর্যন্ত), ইবনু হাযম তার 'আল মুহাল্লা' (১/২৩৯), হাযেমী তাঁর 'আল-ইতেবার' (৭৭) ইবনুল আরাবী তাঁর 'আল-আরেযা' (১/১১৭), বাইহাক্বী তার আল খালাফিয়্যাত (২/২৮৯) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

[৩৪২] দেখুন! পূর্বোল্লেখিত মালিকী মাযহাবের উদ্বৃত গ্রন্থসহ 'তামামুল মিন্নাহ' (১০৩ পৃঃ), এখানে 'তামামুল মিন্নাহ' গ্রন্থকার বলেন, আমার যতটুকু স্মরণ হচ্ছে যে, এ অভিমতটি হবে ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) এর অভিমত। তবে লেখক বলেন, আমার মতে, বরং ইবনে তাইমিয়্যাহ এর অভিমত হবে ৪র্থটি, যেমন সামনে দেখবেন। সুতরাং যে ভুল করে না সে সম্মানিত।

[৩৪৩] মাজমু' আল ফাতওয়া (২১/২৪১), শারহুল মুমতি' (১/২৩৩)।

Contents

শেষোক্ত সমন্বয়কারী উভয়দল নিম্নোক্তভাবে দলীল দিয়ে থাকেন:

(১) ত্বলাক (ﷺ) পূর্বে ইসলাম গ্রহণ ও বুসরাহ (ﷺ) পরে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নাসখের যে দাবী করা হয়েছে তা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কেননা উসূল বিদগণের নিকট এটা নাসখ (রহিত) হওয়ার উপর দলীল নয়। কারণ হলো: অনেক সময় দেখা যায় যে, পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(২) ত্বলাক (ﷺ) এর হাদীসে এমন কারণ রয়েছে যা দূর করা সম্ভব নয়। আর তা হলো, 'লজ্জাস্থান শরীরেরই অংশ'। যখন কারণটি কোন হুকুমের সাথে জড়িত হয়ে যায়, যা দূর করা সম্ভব হয় না, তখন তার হুকুমও দূর করা সম্ভব নয়। সুতরাং তা মানসূখ (রহিত) করা সম্ভব নয়।

(৩) দু'টি হাদীসের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হলে, নাসখ (রহিত) করার বিধান কার্যকর হবে না। আর পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, এখানে নাসখের বিধান কার্যকর করা বিশুদ্ধ হবে না।

আমার বক্তব্য: ত্বলাক ইবনে আলী (ﷺ) এর হাদীসটি সহীহ হতো, তাহলে শেষোক্ত মতামতটিই শক্তিশালী স্থানে থাকত। কিন্তু ত্বলাক বিন আলী (ﷺ) এর হাদীসটি সহীহ হওয়ার মতামতটি সঠিক নয়। বরং যঈফ হওয়ার মতামতটিই যথোপযুক্ত। সুতরাং এ কথাটিই প্রতিভাত হচ্ছে যে, সাধারণভাবে লিঙ্গ স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। চাই তা কামোত্তেজনাসহ হোক কিংবা কামোত্তেজনা ছাড়া হোক। কেননা কামোত্তেজনার কোন সীমা নেই এবং এটা ধর্তব্য হওয়ার উপর কোন দলীল নেই। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

পূর্বের আলোচনার আলোকে কিছু প্রয়োজনীয় কথা

১। মহিলা যদি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তাহলে সে ওযূ করবে:

আমর বিন শু'আইব তার পিতা থেকে তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেন:

"من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرضها فلتتوضأ "

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি তার লিঙ্গ স্পর্শ করবে, সে যেন ওযূ করে এবং কোন মহিলা যদি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তাহলে সে যেন ওযূ করে।[৩৪৪]

আয়িশা (রা.) এর উক্তিও এ বিধানটিকে শক্তিশালী করে। " إذا مست المرأة فرضها فلتتوضأ অর্থাৎ: "মহিলা যদি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তাহলে সে ওযূ করবে"।[৩৪৫]

মূলতঃ মহিলারা শারঈ বিধান পালনের ক্ষেত্রে পুরুষের অনুরূপ। আর এটা হলো ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ (রাহি.) এর অভিমত। আবূ হানীফা ও মালিক (রাহি.) এর বিপরীত মত পেশ করেছেন।

---

[৩৪৪] সহীহ লিগায়রিহী; আহমাদ (২/২২৩), বাইহাক্বী (১/১৩২)।

[৩৪৫] এর সনদ সহীহ; শাফেঈ তাঁর 'আল-মুসনাদ' (৯০) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বাইহাক্বী (১/১৩৩) ইমাম হাকিম একে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন এবং এর উপরই অটল থেকেছেন। যেমন হাকিম (১/১৩৮)।

www.waytojannah.com

২। অন্যের লজ্জাস্থান স্পর্শ করাঃ

কোন পুরুষ তার স্ত্রীর লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অথবা কোন নারী স্বামীর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে, তাদের ওযূ নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল নেই। তবে এর ফলে মযি বা মনি নির্গত হলে, ওযূ নষ্ট হবে। শুধু স্পর্শ করার কারণে ওযূ নষ্ট হবে না।

ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রাহি.) এর মতে, এ ক্ষেত্রে ওযূ ওয়াজিব হবে।[৩৪৬] মূলতঃ তাদের মাযহাবের মূল কথা হলো, মহিলাদের স্পর্শ করলেই ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। সামনের আলোচনায় এর বিপরীত মতামতটিকেই প্রাধান্য দেয়া হবে।

অনুরূপভাবে যদি কোন নারী অথবা পুরুষ ছোট বাচ্চার লিঙ্গ স্পর্শ করে তাহলে ওযূ নষ্ট হবে না। ইমাম মালিক (রাহি.) এ মতকে সমর্থন করেছেন। এটা যুহরী ও আওয়ায়ী এর অভিমত।[৩৪৭]

৩। ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশত হোক, লজ্জাস্থান স্পর্শ করার বিধান সমানঃ[৩৪৮]

এটা আওযায়ী, শাফেঈ, ইসহাক ও আহমাদ (রাহি.) এর অভিমত। আর একদল বলেন, শুধু ইচ্ছাকৃত ভাবে বা স্বেচ্ছায় লিঙ্গ স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হবে। তারা হলেনঃ মাকহুল, জাবির বিন যায়িদ, সাঈদ বিন যুবাইর। এটা ইবনে হাযমের মাযহাব। এব্যাপারে দলীল হলোঃ আল্লাহর বাণী-

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

অর্থাৎঃ আর এ বিষয়ে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন পাপ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)।

প্রথমোক্ত মতামতটিই বিশুদ্ধ। ইবনে মুনযির বলেনঃ "লিঙ্গ স্পর্শ করার অর্থ যারা 'হাদাস' বলে থাকেন যা ওযূ ওয়াজিব করে, তারা স্পর্শ করাকে ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃত উভয়টি সমান ধর্তব্য মনে করেন"।

আমার বক্তব্যঃ ভুল-ত্রুটিগুলো শর্তসমূহ ও আরকানসমূহের সাথে সম্পৃক্ত, যার মাধ্যমে পাপের বিধান রহিত হয় কিন্তু হুকুম বহাল থাকে। আল্লাহই সর্বাধিক অবহিত।

৪। কাপড়ের উপর দিয়ে লিঙ্গ স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হবে নাঃ

কেননা এটা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, এভাবে স্পর্শ করলে তাকে হাদাসের স্পর্শ বলা যায় না। মারূফ সূত্রে আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) এর বর্ণিত হাদীসও এ বিধানটিকে শক্তিশালী করেঃ

" إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ "

অর্থাৎঃ যে ব্যক্তি তার লিঙ্গ স্পর্শ করবে, এমতাবস্থায় তার মাঝে ও লিঙ্গের মাঝে কোন পর্দা থাকে না, সে যেন ওযূ করে।[৩৪৯]

৫। নিতম্ব স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হয় নাঃ[৩৫০]

---

[৩৪৬] মাওয়াহিবুল জালীল (১/২৯৬), আল-উম্ম (১/২০)।

[৩৪৭] ইবনু আব্দিল বার প্রণীত আল-কাফী (১/১৪৯), আল-আওসাত্ব (১/২১০)।

[৩৪৮] আল-মুহাল্লা (১/২৪১), আল-আওসাত্ব (১/২০৫-২০৭)।

[৩৪৯] হাসান; দারাকুতনী (১/১৪৭), বাইহাক্বী (১/১৩৩) আস-সহীহাহ (১২৩৫)।

[৩৫০] আল-মুহাল্লা (১/২৩৮), আল-আউসাত্ব (১/২১২)।

Contents

কেননা নিতম্বকে লিঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয় না। লিঙ্গ ও নিতম্ব স্পর্শ করার ক্ষেত্রে সমতার কোন প্রমাণ না থাকায়, নিতম্বকে লিঙ্গের উপর কিয়াস করা যাবে না। যদি বলা হয় যে, উভয়টি নাপাক নির্গত হওয়ার স্থান? তাহলে বলা হবে যে, তা স্পর্শ করার ফলে ওযূ ভঙ্গের কোন কারণ পাওয়া যায় না। উপরন্তু, নাপাক স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হয় না, সুতরাং নাপাক বের হওয়ার স্থান স্পর্শ করলে কিভাবে ওযূ নষ্ট হবে?!! এটা ইমাম মালিক, সাওরী ও আসহাবে রা'য়ের অভিমত। ইমাম শাফেঈ এর বিরোধিতা করেছেন।

৬। উটের গোশত খাওয়ার ফলে ওযূ নষ্ট হওয়ার বিধান:

যে ব্যক্তি কাঁচা, পাকানো বা ভোনা করা উটের গোশত ভক্ষণ করবে, তার ওযূ করা ওযাজিব।

عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ»

অর্থাৎ: জাবির বিন সামুরাহ থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করল, আমি কি ছাগলের গোশত ভক্ষণ করলে ওযূ করব? রাসূল (ﷺ) জবাবে বললেন, চাইলে করতে পার অথবা না পার। আমি কি উটের গোশত ভক্ষণ করলে ওযূ করব? রাসূল (ﷺ) জবাবে বললেন, হ্যাঁ উটের গোশত খেলে ওযূ কর।[৩৫১]

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ

অর্থাৎ: বাররা বিন আযিব থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন, উটের গোশত খেলে ওযূ কর এবং ছাগলের গোশত খেলে ওযূ কর না।[৩৫২]

এটা ইমাম আহমাদ, ইসহাক, আবূ খাসসামাহ, ইবনুল মুনযির এবং ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এর দু'টি অভিমতের একটি অভিমত। শাইখুল ইসলাম এমতটিকে পছন্দ করেছেন। ইবনে উমার ও জাবির ইবনে সামুরাহ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অপর পক্ষে অধিকাংশ বিদ্বান তথা আবূ হানীফা, মালিক, শাফেঈ, সাওরী ও সালাফদের একটি দলের মতে, উটের গোশত খাওয়ার ফরে ওযূ ওয়াজিব হয় না। বরং এ ক্ষেত্রে ওযূ করা মুস্তাহাব।[৩৫৩]

কেননা জাবির বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে:

كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

অর্থাৎ: রাসূল (ﷺ) এর দু'টি কাজের সর্বশেষ কাজ ছিল যে, তিনি রান্না করা খাবারের পর ওযূ করতেন না।[৩৫৪] তারা বলেন, মহানাবী (ﷺ) এর সাধারণ বাণী- "مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" উটের গোশতকেও শামিল করে। আর 'উটের গোশত খেলে ওযূ করতে হবে' মর্মে বর্ণিত হাদীসটি মানসূখ (রহিত) হয়ে যাওয়ার প্রমাণ রয়েছে।

---

[৩৫১] সহীহ; মুসলিম (৩৬০), ইবনু মাজাহ (৪৯৫)।

[৩৫২] সহীহ; আবূ দাউদ (১৮৪), তিরমিযী (৮১), ইবনে মাজাহ (৪৯৪)।

[৩৫৩] আল-মাসবূত্ব (১/৮০), মাওয়াহিবুল জালীল (১/৩০২), আল-মাজমু' (১/৫৭), আল-মুগনী (১/১৩৮), আল-মুহাল্লা (১/২৪১), আল-আওসাত্ব (১/১৩৮)।

[৩৫৪] সহীহ; আবূ দাউদ (১৯২), তিরমিযী (৮), নাসাঈ (১/১০৮)।

www.waytojannah.com

দু' ভাবে এ কথার জবাব দেয়া যায়: [৩৫৫]

প্রথমত: জাবির বর্ণিত হাদীসটি আম বা সাধারণ। আর 'উটের গোশত ভক্ষণের ফলে ওযূ নষ্ট হবে' মর্মে বর্ণিত হাদীসটি খাস বা নির্দিষ্ট। আম হাদীস খাস হাদীসের উপর ব্যবহার করা হয়। ফলে খাস হওয়ার দলীল পাওয়ার কারণে আম হাদীস থেকে উক্ত বিধান বের হয়ে যাবে। সুতরাং উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হওয়ার কারণে 'উটের গোশত ভক্ষণের ফলে ওযূ নষ্ট হবে' মর্মে বর্ণিত হাদীসটিকে মানসূখ (রহিত) বলা যাবে না।

দ্বিতীয়ত: উটের গোশত খাওয়ার ফলে ওযূ করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা বিশেষ নির্দেশ। চাই তা আগুনে পাকানো হোক বা না হোক। শুধু আগুনে পাকানোর কথা বলা হয় নি। সুতরাং শুধু পাকানো উটের গোশত খেলেই যে ওযূ নষ্ট হবে , বিষয়টি এমন নয়। বরং উটের গোশতের বিধানটা আগুনে পাকানো খাবার খেলে ওযূ নষ্ট হবে অথবা হবে না এমন যে দু'টি বিধান রয়েছে, তা থেকে বহির্ভূত।

কেউ কেউ বলেন: হাদীসে উল্লেখিত ওযূ দ্বারা হাত ধোয়া উদ্দেশ্য। এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়।[৩৫৬] কেননা মহানাবী (ﷺ) এর বাণীতে যে ওযূর কথা বর্ণিত হয়েছে, তাতে শুধু সালাতের ওযূর কথাই বলা হয়েছে। আবার সহীহ মুসলিমে জাবির বিন সামুরাহ এর হাদীসে 'উটের গোশত খেলে ওযূ করতে হয়' বিধানটিকে 'উট বাঁধার স্থানে সালাত আদায় করতে হয়' এই বিধানের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে 'উট বাঁধার স্থানে সালাত আদায় করা' ও 'ছাগল বাঁধার স্থানে সালাত আদায় করার বিধানের মাঝে পার্থক্য হয়ে গেছে। সুতরাং এতে নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, এটা সালাতের ওযূ।

বিশুদ্ধ মতামত হলো:

উটের গোশত ভক্ষণ করলে সর্বাবস্থায় ওযূ ওয়াজিব। এজন্য ইমাম নাববী (রাহি.) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে (১/৩২৮ কল'আজী) বলেন: এই মতামতটিই দলীলের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী, যদিও অধিকাংশ বিদ্বান এর বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন।

২ টি সতর্কবাণী:

প্রথম: ইমাম নাববী (রাহি.) মুসলিমের শারহ (১/৩২) গ্রন্থে উটের গোশত খাওয়ার ফলে ওযূ না করার মাতামতটিকে চার খলীফা (রা.) এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। এ দাবীর পেছনে কোন দলীল নেই এবং এ ব্যাপারে তাদের পর্যন্ত কোন সনদ জানা যায় না । এ ভুল দাবীর ব্যাপারে সতর্ক করে ইবনে তাইমিয়াহ (রাহি.) বলেন: খোলাফায়ে রাশেদীনসহ অধিকাংশ সাহাবা উটের গোশত খাওয়ার পর ওযূ করতেন না বলে যারা বর্ণনা করেছেন তারা তাদের প্রতি ভুল দাবী উত্থাপন করেছেন। মূলতঃ 'আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে তারা ওযূ করতেন না' এ সাধারণ বর্ণনাকে কেন্দ্র করেই তারা এই ভুল ধারণা পোষণ করেছেন।[৩৫৭]

---

[৩৫৫] আল-মুহাল্লা (১/২৪৪), আল-মুমতি (১/২৪৯)।

[৩৫৬] মাজমু' আল-ফাতাওয়া (২১/২৬০-এবং তার পরবর্তী অংশ)।

[৩৫৭] আল-কাওয়ায়েদুল নাওরানিয়াহ (পৃ. ৯), থেকে গৃহীত; তামামুল মিন্নাহ (পৃ. ১০৫)।

Contents

দ্বিতীয়: একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা যার কোন ভিত্তি নেই:[৩৫৮]

সর্ব সাধারণের কাছে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে, যা জ্ঞান পিপাষু ছাত্রসমাজ শুনলে উটের গোশত খাওয়ার পর ওযূ করা আবশ্যক মনে করবে। ঘটনাটি হলো: একদা মহানাবী (ﷺ) এক দল সাহাবাদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর তাদের একজনের কাছ থেকে তিনি গন্ধ অনুভব করছিলেন, ফলে ব্যক্তিটি মানুষের মাঝে দাঁড়াতে লজ্জাবোধ করছিল। মূলতঃ ব্যক্তিটি উটের গোশত খেয়েছিল। ফলে মহানাবী (ﷺ) তাকে বললেন: যে ব্যক্তি উটের গোশত খাবে সে ওযূ করবে। অতঃপর উটের গোশত খেয়েছিল এমন একদল ব্যক্তিবর্গ দাঁড়িয়ে গেল এবং তারা সবাই ওযূ করল। এই ঘটনাটি সনদগতভাবে দুর্বল এবং মতনগত ভাবে মুনকার।

যে সকল কাজে ওযূ নষ্ট হয় না

এ কাজগুলো করলে ওযূ ভঙ্গ হবে কিনা এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। তবে বাস্তবে এ কাজগুলো করলে ওযূ নষ্ট হয় না। আর সে কাজগুলো হলো:

১। কোন পর্দা ছাড়া পুরুষ মহিলাকে স্পর্শ করলে এ মাসআলাটির ব্যাপারে তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়:

প্রথম : অভিমত:

সাধারণভাবে পুরুষ মহিলাকে স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হবে। এটা ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এর অভিমত। ইবনে হাযম এমতটি সমর্থন করেছেন। ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) ও ইবনে উমার (رضي الله عنه) এ মতেরই প্রবক্তা।[৩৫৯]

দ্বিতীয় :

সাধারণভাবে এ অবস্থায় ওযূ নষ্ট হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা। মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী (রাহি.) এর অভিমত। ইবনে আব্বাস, ত্বউস, হাসান ও আত্বাও এ মত পোষণ করেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ এই মতটি পছন্দ করেছেন।[৩৬০] এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।

তৃতীয়:

কাম প্রবৃত্তিসহ যদি মহিলাকে স্পর্শ করা হয়, তাহলে ওযূ নষ্ট হবে। এটা ইমাম মালিক এর মতামত। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইমাম আহমাদ (রাহি.) এ অভিমত পেশ করেছেন।[৩৬১]

আমার বক্তব্য: মূলতঃ মহিলাকে স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে মর্মে যারা মতামত দিয়েছেন, তাদের দলীল হলো: আল্লাহর বাণী:

﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾

তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ কর, তবে যদি পানি না পাও তাহলে তায়াম্মুম কর। *(সূরা : আন-নিসা-৪৩)*

---

[৩৫৮] আলবানী প্রণীত আয-যঈফা (১১৩২), মাশহুর হাসান প্রণীত 'আল কাসাসু লা তাসবুত' (পৃ. ৫৯)।

[৩৫৯] আল-উম্ম (১/১৫), আল-মাজমু' (২/২৩-এবং তার পরবর্তী অংশ) আল-মুহাল্লা (১/২৪৪)।

[৩৬০] আল-মাসবূত্ব (১/৬৮), আল-বাদাঈ (১/৩০), আল-আওসাত্ব (১/১২৬), মাজমু' আল-ফাতাওয়া (২১/৪১০)।

[৩৬১] আল-মুদও ওয়ানাহ (১/১৩), হাশিয়াতুদ দাসওয়াকী (১/১১৯) আল-মুগনী (১/১৯২), আল কাশশাফুল কান্না' (১/১৪৫)।

www.waytojannah.com

ইবনে মাসউদ (ﷺ)ও ইবনে উমার (ﷺ) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, "أن المس دون الجماع" অর্থাৎ: সহবাস ছাড়া শুধু স্পর্শ করাকেই مس বলা হয়।[৩৬২]

হিবরুল উম্মাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) তাদের মতের বিপক্ষে মত পেশ করে বলেন, مس, لمس ও مباشرة দ্বারা উদ্দেশ্য جماع বা সহবাস। মহান আল্লাহ এ শব্দগুলো ইঙ্গিতসূচক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[৩৬৩] আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, তার তাফসীরটা অন্যান্য মুফাসসিরদের উপর অগ্রগণ্য। উপরন্তু স্বয়ং আয়াত দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে।

আল্লাহর বাণী-﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ﴾ হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমরা ধৌত কর *(সূরা : মায়িদা -৬)*। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, ছোট নাপাকী হতে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা।

অতঃপর আল্লাহ বলেন,﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও *(সূরা : মায়িদা -৬)*। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, বড় নাপাকী হতে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা। এরপর আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾

আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর *(সূরা : মায়িদা -৬)*।

অত্র আয়াতে 'فَتَيَمَّمُوا' শব্দটি দু'প্রকার ত্বহারাত (ছোট ত্বহারাত ও বড় ত্বহারাত) এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত। সুতরাং আল্লাহর বাণী- أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ দ্বারা ছোট ত্বহারাতের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ দ্বারা বড় ত্বহারাতের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।[৩৬৪]

আর ইমাম শাফেঈ অত্র আয়াতে المس এর অর্থ স্পর্শ করা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, মূলতঃ তা তিনি অকাট্য ও সুদৃঢ়ভাবে এ অর্থ গ্রহণ করেন নি বরং বাহ্যিক ভাবে তার কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি সতর্কতা মূলক একথা বলেছেন।[৩৬৫] যেমন তিনি الأم নামক গ্রন্থে (১/১২) আয়াতটি উল্লেখ করার পর বলেন: পেশাব-পায়খানার কারণে ওযূ ওয়াজিব হওয়াটা সাদৃশ্য রাখে স্পর্শ করার কারণে ওযূ ওয়াজিব হওয়ার সাথে। কেননা الملامسة শব্দটি جنابة শব্দ উল্লেখ করার পর غائط শব্দের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং الملامسة শব্দটি সহবাস ছাড়া হাত দ্বারা স্পর্শ করা ও চুমু খাওয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ মতের সমর্থনে ইবনে আব্দুল বার ইমাম শাফেঈ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, ইমাম শাফেঈ বলেন: স্ত্রীকে চুমু খাওয়ার

---

[৩৬২] সহীহ; তাফসীরে আত-ত্বাবারী (১/২০৫), বিশুদ্ধ সনদে।

[৩৬৩] এর সনদ সহীহ; ত্বাবারী (৯৫৮১), ইবনু আবী শাইবা (১/১৬৬)।

[৩৬৪] আশ-শারহুল মুমতি' (১/২৩৯) এবং অনুরূপ বর্ণনা এসেছে আল-আওসাত্ব (১/১২৮) গ্রন্থে।

[৩৬৫] শাইখ মাশহুর (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) তার বিশ্লেষন গ্রন্থ 'খিলাফিয়্যাত' (২/২১৭) এ বর্ণনা করেছেন।

Contents

ব্যাপারে মা'বাদ বিন নাবাতহ থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে[৩৬৬], তিনি বলেন: চুমু খাওয়া ও স্ত্রী স্পর্শ করার কারণে ওযূ করতে হবে বলে আমি মনে করি না। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী তালখীস গ্রন্থে (পৃ: ৪৪) অনুরূপ হাদীস সংকলন করেছেন।

আমার বক্তব্য: স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হবে না। এর সমর্থনে নিম্নের দলীলগুলো পেশ করা যায়:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ....

(১) অর্থাৎ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বিছানায় পেলাম না। আমি তাকে খোঁজ করতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হাত তার পায়ের তালুতে গিয়ে ঠেকল। তিনি সিজদায় ছিলেন এবং তার পা দুটো দাঁড় করানো ছিল। এ অবস্থায় তিনি বলছেন : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই।[৩৬৭]

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ، فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا» ، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

(২) অর্থাৎ: 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সামনে ঘুমাতাম, আমার পা দু'খানা তাঁর কিবলার দিকে ছিল। তিনি সিজদায় গেলে আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন, তখন আমি পা দু'খানা সংকুচিত করতাম। আর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি পা দু'খানা সম্প্রসারিত করতাম। তিনি বলেন : সে সময় ঘরগুলোতে বাতি ছিল না।[৩৬৮]

অপর বর্ণনায় রয়েছে: حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ অর্থাৎ: এমনকি তিনি যখন সিজদা দিতেন, তখন আমাকে তার পা দ্বারা স্পর্শ করতেন।[৩৬৯]

(৩) মুসলমানরা সর্বদা তাদের স্ত্রীদের স্পর্শ করতেন। তাদের কেউ বর্ণনা করেন নি যে, এর কারণে মহানাবী (ﷺ) তাদের ওযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবাদের থেকে কেউ এ কথাও বর্ণনা করেন নি যে, মহানাবী (ﷺ) তাঁর জীবদ্দশায় এ কারণে ওযূ করেছেন। এমন কি রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকেও এরূপ বর্ণিত হয় নি যে, তিনি এ জন্য ওযূ করেছেন। বরং মহানাবী (ﷺ) এর পক্ষ থেকে এর বিপরীত টাই বর্ণিত হয়েছে যে, "তিনি তার কোন স্ত্রীকে চুম্বন করতেন। অথচ ওযূ করতেন না"।[৩৭০] এ হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কোন মতভেদ নেই যে, স্পর্শ করার ফলে ওযূ করতে হবে এমন বর্ণনা রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয় নি।[৩৭১] আর "কাম প্রবৃত্তির সাথে স্পর্শ

---

[৩৬৬] এটা আয়িশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস, যাতে রাসূল (ﷺ)কর্তৃক সালাতে বের হওয়ার পূর্বে তাঁর স্ত্রীদের চুম্বন করা প্রসঙ্গে বিবরণ এসেছে। এ সম্পর্কে সামনে আরও হাদীস আসবে।

[৩৬৭] সহীহ; মুসলিম (২২২), আবূ দাউদ, (৮৬৫), তিরমিযী (৩৮১৯)।

[৩৬৮] সহীহ; বুখারী (৩৮২), মুসলিম (২৭২) প্রভৃতি।

[৩৬৯] এর সনদ সহীহ; নাসাঈ (১/১০১)।

[৩৭০] ইমামগণ এর ত্রুটি বর্ণনা করেছেন; আবূ দাউদ (১৭৮) নাসাঈ (১/১০৪), পূর্ববর্তী আইম্মায়ে কেরামও এর ত্রুটি বর্ণনা করেছেন। যেমন এসেছে 'সুনানু আদ-দারাকুতনী (১/১৩৫-১৪২)।

[৩৭১] মাজমূ' আল-ফাতওয়া (২১/৪১০, ২০/২২২) এ ছাড়া আরও কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কিত আলোচনা এসেছে।

www.waytojannah.com

করলে ওযূ ভঙ্গ হবে এবং কাম প্রবৃত্তির ছাড়া স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হবে না" এমন মতামতের কোন দলীল নেই। তবে এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, যদি সহবাস ব্যতীত কাম প্রবৃত্তিসহ স্পর্শ করার ফলে ওযূ করা হয় তাহলে তা কামপ্রবৃত্তি মিটিয়ে দেয়ার জন্য উত্তম হবে। যেমনটি রাগ মিটানোর জন্য ওযূ করা উত্তম। তবে তা ওয়াজিব নয়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

২। অস্বাভাবিক রক্তপ্রবাহিত হওয়া, চাই তা যখমের কারণে হোক বা সিঙ্গা লাগানোর জন্যই হোক, কম হোক বা বেশি হোক:

বিদ্বানদের বিশুদ্ধ মতে, এ কারণে ওযূ নষ্ট হবে না। এটা ইমাম শাফেঈ, মালিক ও আবূ হানীফা (রাহি.) এর অভিমত। আর হাম্বালী মাযহাবের মতে, রক্ত যখন বেশি প্রবাহিত হবে তখন ওযূ নষ্ট হবে।[৩৭২] তবে প্রথম মতটি কয়েকটি কারণে বিশুদ্ধ:

(১) যে হাদীসগুলোতে এ কারণে ওযূ করাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে , তার কোনটিও সহীহ নয়।

(২) মূলতঃ ওযূকারীর ওযূ ঠিক থাকবে। শরীয়াতের দলীল অথবা ইজমা ছাড়া ওযূ ভঙ্গ হবে বলে দাবী করা ঠিক হবে না।

(৩) যাতুর রিকা যুদ্ধের ঘটনায় বর্ণিত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) এর হাদীসে বলা হয়েছে:

اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ، وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّ، وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ لِلْقَوْمِ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ، حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ، فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ، وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدَّمِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى، قَالَ: كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا

অর্থাৎ: মুহাজির সাহাবী বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়েন এবং আনসার সাহাবী সালাত রত হন। তখন শত্রু পক্ষের ব্যক্তি সেখানে আগমন করে এবং মুসলিম বাহিনীর একজন গোয়েন্দা মনে করে তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে এবং তা আনসার সাহাবীর শরীরে বিদ্ধ হয়। তিনি তা দেহ থেকে বের করে ফেলেন। মুশরিক ব্যক্তি এভাবে পরপর তিনটি তীর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি রুকু সিজদা করে (সালাত শেষ করার পর) তাঁর সাথীকে জাগ্রত করেন। অতঃপর সে ব্যক্তি সেখানে অনেক লোক আছে এবং তারা সতর্ক হয়ে গেছে মনে করে পালিয়ে যায়। পরে মুহাজির সাহাবী আনসার সাহাবীর রক্তাক্ত অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন: সুবহানাল্লাহ! শত্রু পক্ষের প্রথম তীর নিক্ষেপের সময় কেন আপনি আমাকে সতর্ক করেন নি? জবাবে তিনি বলেন: আমি সালাতের মধ্যে (তন্ময়তার সাথে) এমন একটি সূরা পাঠ করছিলাম যা শেষ না করে পরিত্যাগ করা পছন্দ করি নি।[৩৭৩]

অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মহানাবী (ﷺ) এ ব্যাপারে জানার পর এতো রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পরও সালাতে অবিচল থাকতে নিষেধ করেন নি। যদি রক্ত ওযূ ভঙ্গের কারণ হতো তাহলে মহানাবী (ﷺ)

---

[৩৭২] আল-উম্ম (১/১৮০), আল-মাজমু' (২/৫৫), আল-ইস্তিযকরে (২/২৬৯) আল-মাসবূত্ব (১/৭৪), আল-মুগনী (১/১৮৪)।

[৩৭৩] এর সনদ দুর্বল; ইমাম বুখারী (১/২৮০) মুয়াল্লাক্ব সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ (১৯৫) আহমাদ (৩/৩৪৩), ইবনে হিব্বান (১০৯৬), হাকিম (১/১৫৬) দারাকুতনী (১/২২৩) এর সনদে আক্বিল বিন যাবের আসার কারণে যঈফ। আলবানী তার সহীহ আবূ দাউদ (১৯৩) গ্রন্থে সহীহ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

Contents

সে ব্যক্তিকে বা সে যুদ্ধে যারা ছিল তাদের কাছে এ বিষয়টি বর্ণনা করতেন। আর প্রয়োজনীয় সময় ছাড়া পরে বর্ণনা করা বৈধ নয়।[৩৭৪]

(৪) সহীহ সূত্রে বর্ণিত যে, - أَن عُمَرَ بن الخطاب لما طعن صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا –অর্থাৎ: উমার ইবনুল খাত্তাব (ﷺ) যখন যখম প্রাপ্ত হন তখন তিনি সালাত আদায় করলেন অথচ তাঁর যখম হতে তখন রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।

(৫) মুতাওয়াতির পর্যায়ের অনেক হাদীস রয়েছে যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদগণ তাদের যখমের কারণে প্রবাহিত রক্ত বন্ধ করতে সক্ষম হতেন না। এর ফলে তাদের কাপড় নোংরা হয়ে যেত। অথচ তারা এমতাবস্থায় সালাত আদায় করতেন। রাসুল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে কেউ এ কথা বর্ণনা করেন নি যে, এমতাবস্থায় মহানাবী (ﷺ) তাদের সালাত বাতিল করতে বলেছেন বা তাদেরকে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। এ জন্য হাসান বসরী (রাহি.) বলেন: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ অর্থাৎ:"মুসলমানরা সবদাই তাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত বা যখম থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করতেন"।[৩৭৫]

৩। বমি বা অনুরূপ কিছু:

রক্ত প্রবাহিত হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণ যে মতামত পেশ করেছেন, বমির ব্যাপারেও একই মতামত পেশ করেছেন। তবে বিশুদ্ধ মত হলো বমির কারণে ওযূ ভঙ্গ হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে ওযূ করা ওয়াজিব বলে কোন সহীহ প্রমাণ নেই। সুতরাং তা মূলের উপর বহাল থাকবে।

আর আবূ দারদা থেকে মিদান বিন আবূ তালহা বর্ণিত হাদীস:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ، فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ

অর্থাৎ: রাসূল (ﷺ) বমি করলেন। অতঃপর ইফতার করে ওযূ করলেন।[৩৭৬]

এতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এর দ্বারা বমি হওয়ার ফলে ওযূ করা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা এটা শুধু মহানাবী (ﷺ) এর কর্ম। সুতরাং তা মুস্তাহাব হওয়ার উপর প্রমাণ করছে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

৪। সালাতে বা সালাতের বাইরে অট্ট হাসি হাসা:

বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সালাতের বাইরে হাসা-হাসি করলে পবিত্রতা নষ্ট হয় না এবং ওযূকে ওয়াজিব করে না। বিদ্বানগণ এ ব্যাপারেও একমত যে, সালাতের মাঝে হাসা-হাসি করলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তবে তার সালাতের মাঝে হাসা-হাসি করলে ওযূ ভঙ্গ হবে কিনা এ নিয়ে মতভেদ করেছেন। আবূ হানীফা, আসহাবে রা'য়, সাওরী, হাসান ও নাখঈ (রাহি.) এর মতে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তারা একটি মুনকাতি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন, যা দলীলের যোগ্য নয়।

---

[৩৭৪] আস-সায়লুল জার্‌রার (১/৯৯)।

[৩৭৫] বুখারী (১/২৮০) মুয়াল্লাক্ব সূত্রে। ইবনু আবী শায়বাহ এ হাদীসটি সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন। যেমনটি এসেছে-ফাতহুলবারী (১/২৮১)।

[৩৭৬] সহীহ; তিরমিযী (৮৭), আবূ দাউদ (২৩৮১), আল-ইরওয়া (১১১)।

www.waytojannah.com

আর তা হলো আবূল আলিয়ার হাদীস :

عن أبي العالية أن رجلا ضرير البصر دخل المسجد والنبي ﷺ يصلي وأصحابه فتردى في بئر فضحك بعض أصحابه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة

অর্থাৎ: আবূ আলিয়া থেকে বর্ণিত, মহানাবী (ﷺ) একদা সাহাবাদের নিয়ে সালাত আদায় করানো অবস্থায় এক অন্ধ ব্যক্তি এসে মাসজিদের এক গর্তে পড়ে গেলে কওমের একদল মানুষ হাসতে লাগল। ফলে রাসূল (ﷺ) তাদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, যে হেসেছে সে যেন পুনরায় ওযূ করে সালাত আদায় করে।[৩৭৭]

অপর পক্ষে, মারফূ সূত্রে জাবির (رضي الله عنه) বর্ণিত হাদীসে সাব্যস্ত আছে যে, একদা তাকে (জাবিরকে) জিজ্ঞেস করা হলো, যদি কোন ব্যক্তি সালাতে হাসে তাহলে তার বিধান কি হবে? তখন তিনি উত্তরে বললেন, يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء -অর্থাৎ: সে পুনরায় সালাত আদায় করবে। তবে পুনরায় ওযূ করবে না ।[৩৭৮]

অত্র হাদীসে উল্লেখিত মতামতটিই বিশুদ্ধ। এটা ইমাম শাফেঈ, মালিক, আহমাদ, ইসহাক ও আবূ ছাওর (রাহি.) এর অভিমত ।[৩৭৯]

৫। মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে এবং তাকে বহন করলে:

বিশুদ্ধ মতে, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে অথবা তাকে বহন করবে, তার ওযূ নষ্ট হবে না। তবে কতিপয় বিদ্বান বলেছেন মুস্তাহাব হলো যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে সে গোসল করবে, আর তাকে বহন করলে ওযূ করবে।

যেমন আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

অর্থাৎ: আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে সে গোসল করবে, আর তাকে বহন করলে ওযূ করবে।[৩৮০] যদি হাদীসটি সহীহ হয়।

৬। বায়ু নির্গত হওয়ার ব্যাপারে ওযূকারীর সন্দেহ:

যে ব্যক্তি সঠিকভাবে ওযূ করার পর মনে মনে সন্দেহ করে যে, তার কি বায়ু নির্গত হলো না হলো না? তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত বায়ু নির্গত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পবিত্রতার মৌলিকতার উপরই অটল থাকবে। অর্থাৎ তার ওযূ নষ্ট হবে না। আর যদি সালাতের মাঝে বায়ু নির্গত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে তাহলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত ছাড়বে না। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়িদ (رضي الله عنه) বলেন:

شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»

---

[৩৭৭] এর সনদ খুবই দুর্বল; দারাকুতনী (১/১৬২), ইবনু আদী (২/৭১৬)।

[৩৭৮] মাওকূফ সহীহ; বুখারী (১/২৮০) মুয়াল্লাক্ব সূত্রে, বাইহাকী (১/১৪৪) দারাকুতনী (১/১৭২)।

[৩৭৯] আল-মাজমূ' (২/৬১), আল-কাফী (১/১৫১), আল-মুগনী (১/১১৭) আল-আওসাত্ব (১/২২৭)।

[৩৮০] আবূ দাউদ (৩১৬২), তিরমিযী (৯৯৩), ইবনে মাজাহ (১৪৬৩), আহমাদ (২/৪৩৩), ইমাম তিরমিযী, ইবনে হাজার আসকালানী ও আলবানী এ হাদীসকে হাসান বলেছেন, আল-ইরওয়া (১/১৭৪)। তবে স্পষ্ট কথা হলো, এটি গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা এটাকে ত্রুটিযুক্ত বলা হয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

অর্থাৎ: এক ব্যক্তি নাবী করীম (ﷺ) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করেন যে, সে সালাতের মধ্যে অনুভব করে যে, তার পিছনের রাস্তা হতে বায়ু নির্গত হয়েছে। জবাবে তিনি বলেন : যে পর্যন্ত কেউ বায়ু নির্গমনের শব্দ বা দুর্গন্ধ না পাবে ততক্ষণ সালাত পরিত্যাগ করবে না।[৩৮১]

আল্লামা বাগাভী (রাহি.) "শারহুস সুন্নাহ" গ্রন্থে (১/৩৫৩পৃ;) বলেন, এর অর্থ হলো যতক্ষণ পর্যন্ত বায়ু নির্গত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে শব্দ শুনা ও বায়ুর অস্তিত্ব পাওয়া শর্ত।

সালাতের জন্যই শুধু ওযূ ওয়াজিব, অন্য কিছুর জন্য ওয়াজিব নয়:

যে ব্যক্তি অপবিত্র (ওযূ বিহীন) রয়েছে এবং সালাত আদায়ের ইচ্ছা করে তার জন্য ওযূ করা ওয়াজিব। চায় তা ফরয সালাত হোক বা নফল সালাত হোক কিংবা জানাযার সালাত হোক । মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমরা ধৌত কর। (*সূরা মায়িদা*-৬)

রাসূল (ﷺ) বলেন: « لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُور »

অর্থাৎ: পবিত্রতা ব্যতীত সালাত গৃহীত হবে না।[৩৮২]

সালাত ব্যতীত অন্যক্ষেত্রে ওযূ ওয়াজীব নয়। অপবিত্র ব্যক্তির উপর সালাত ব্যতীত অন্য কিছু হারাম নয়।

তবে নিম্নোক্ত কাজগুলোর ক্ষেত্রে ওযূ করা মুস্তাহাব।

কা'বা শরীফ ত্বওয়াফ করার সময়:

ত্বওয়াফকারীর জন্য ওযূ করা আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সহীহ দলীল আছে বলে আমাদের জানা নেই। অথচ অসংখ্য মুসলমান, যাদের সংখ্যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ নির্ণয় করতে পারবে না। তারা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর যুগে ত্বওয়াফ করতেন। কিন্তু তাদের কাউকেও তিনি ত্বওয়াফের জন্য ওযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে আমাদের কাছে বর্ণিত হয় নি। অথচ ত্বওয়াফ চলাকালীন সময় অনেকের ওযূ নষ্ট হত এবং অনেকেই ওযূ বিহীন ত্বওয়াফ করতেন। বিশেষ করে ঐ সমস্ত দিনগুলোতে যে দিন গুলোতে বেশি ভিড় হতো। যেমন; ত্বওফে কুদুম, ইফাযাহ ইত্যাদি। অতএব যখন ত্বওয়াফের ক্ষেত্রে ওযূ করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোন দলীল বর্ণিত হয় নি এবং এটা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের কোন ইজমা নেই। অথচ এ জন্য ইজমা বা দলীলের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তা ওয়াজিব না হওয়াই প্রমাণ করে।[৩৮৩]

কিছু বিদ্বান ত্বওয়াফের জন্য ওযূ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস বর্ণিত মারফূ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন:

الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام

---

[৩৮১] সহীহ; কিছু পূর্বেই এর তাখরীজ করা হয়েছে।

[৩৮২] সহীহ; মুসলিম (২২৪) প্রভৃতি।

[৩৮৩] জামি আহকামুন নিসা (২/৫১৫)।

www.waytojannah.com

অর্থাৎ: বাইতুল্লাহ ত্বওয়াফ করা এক প্রকার সালাত। তবে তাতে আল্লাহ কথা বলা বৈধ করেছেন।[৩৮৪]

তারা বলেন, ত্বওয়াফ যেহেতু সালাত, সুতরাং তাতে সালাতের মত ওযূ ওয়াজিব। কিন্তু দু'টি কারণে এমতামতটি গ্রহণযোগ্য নয়:

প্রথমত: এ হাদীসটি মারফূ সূত্রে বর্ণিত নয়। সঠিক কথা হলো এটি মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তি। যেমনটি ইমাম তিরমিযী, বাইহাক্বী, ইবনে তাইমিয়াহ ও ইবনে হাজার আসকালানী সহ আরও অনেকেই এ কথাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত: ধরে নেয়া হলো হাদীসটি সহীহ। তবুও ত্বওয়াফটা সকল ক্ষেত্রে সালাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এমনকি সালাতে যে শর্ত রয়েছে ত্বওয়াফে সে শর্ত নেই।[৩৮৫] উপরন্তু সালাত এমন একটি শারঈ ইবাদাত, যাতে ত্বহারাতসহ আরও অনেক কিছু শর্ত রয়েছে। যার তাকবীরের মাধ্যমে সকল কাজ হারাম হয় এবং সালামের মাধ্যমে সকল কাজ বৈধ হয়।

এজন্যই শাইখুল ইসলাম বলেছেন, "আমার কাছে একথা স্পষ্ট যে, নিঃসন্দেহে ত্বওয়াফের ক্ষেত্রে অপবিত্রতার কারণে ত্বহারাত বা পবিত্রতা শর্ত নয় এবং তা ওয়াজিবও নয় । তবে এ ক্ষেত্রে ছোট পবিত্রতা তথা ওযূ করা মুস্তাহাব। কেননা শারঈ দলীল এ ক্ষেত্রে ওযূ ওয়াজিব না হওয়ার উপরই প্রমাণ করে। আর ইসলামী শরীয়াতে এ ক্ষেত্রে ছোট পবিত্রতা ওয়াজিব হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই।[৩৮৬] আবূ মুহাম্মাদ ইবনে হাযম এ মতমকেই সমর্থন করেছেন।
আবূ মুহাম্মাদ ইবনে হাযম এ মতমকেই সমর্থন করেছেন।[৩৮৭]

মাসহাফ (কুরআন) স্পর্শ করা:
ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমাদ ও অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, ওযূ বিহীন অবস্থায় মাসহাফ স্পর্শ করা বৈধ নয়।[৩৮৮] এ ব্যাপারে তারা দু'টি দলীল পেশ করে থাকেন-
(ক) আল্লাহর বাণী- لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ -অর্থাৎ: পবিত্রগণ ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করবে না *(সূরা ওয়াক্বিয়াহ-৭৯)*।
(খ) আমর বিন হাযম এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানাবী (ﷺ) ইয়ামান বাসীর নিকট একটি চিঠি লিখে ছিলেন, সেখানে বলা হয়েছিল: "لا يمس القرآن إلا طاهرا"
অর্থাৎ: পবিত্রতা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না।[৩৮৯]

---

[৩৮৪] মাওকূফ; তিরমিযী, নাসাঈ, হাকিমসহ অনেকেই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মারফূ সূত্রে এ হাদীসটি সহীহ নয় এ হাদীসটি মাওকূফ হওয়াটাই অধিক বিশুদ্ধ। যেমনটি আমাদের শাঈখ উল্লেখ করেছেন তার জামি' আহকামুন নিসা (২/৫১৫-৫২১) গ্রন্থে। আলবানী এর বিরোধিতা করেছেন এবং একে মারফূ' আখ্যা দিয়েছেন। আল-ইরওয়া (১/১৫৬)।

[৩৮৫] মাজমু' আল ফাতাওয়া (২৬/১৯৮), জামি' আহকামুন নিসা (২/৫২২) এখানে সালাত ও ত্বওয়াফের মধ্যে ১১টি পার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩৮৬] মাজমু' আল-ফাতাওয়া (২৬/২৯৮)।

[৩৮৭] আল-মুহাল্লা (১/১৭৯)।

[৩৮৮] আল-মাজমূ (১/১৭), ইস্তিযকার (৮/১০), আল-মুগনী (১/১৪৭), আল-আওসাত্ব (২/১০২)।

[৩৮৯] যঈফ; এর অনেকগুলো যঈফ সনদ রয়েছে এবং সকল সনদ একত্রিত করে হাসান পর্যায়ে উন্নীত করার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ফলে আলবানী তার 'ইরওয়া' গ্রন্থে (১/১৫৮ পৃ:) একে সহীহ বলেছেন। তবে স্পষ্ট কথা হল এটা হাসান পর্যায়ে উন্নিত হবে না।

Contents

আমার বক্তব্য: নিম্নোক্ত ভাবে তাদের দলীলের জবাব দেয়া যায়:

(ক) আয়াতে বর্ণিত يَمَسُّهُ এর সর্বনামটি কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া অত্র আয়াত দ্বারা দলীল দেয়া সম্পূর্ণ হবে না। অথচ অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট এটা সুস্পষ্ট যে, সর্বনামটি 'সুরক্ষিত কিতাব' এর দিকে প্রত্যাবর্তন হয়েছে, যা আসমানে রয়েছে। তা হলো লাওহে মাহফূজ। আর الْمُطَهَّرُونَ বলতে ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য। নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা এটা বুঝা যায়-

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۞ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾

অর্থাৎ: নিশ্চয় এটি মহিমান্বিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, কেউ তা স্পর্শ করবে না পবিত্রগণ ছাড়া *(সূরা ওয়াক্বিয়াহ: ৮৮-৭৯)*।

এর সমর্থনে অন্য আয়াতও উল্লেখ করা যেতে পারে-

﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ۞ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾

অর্থাৎ: এটা আছে সম্মানিত সহীফাসমূহে। সমুন্নত, পবিত্র লেখকদের হাতে, যারা মহা সম্মানিত, অনুগত *(সূরা আবাসা: ১৩-১৬)*।

(খ) আর যে হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া হয়েছে তা যঈফ। এটা দলীলের যোগ্য নয়। কেননা সহীফাহ এর ব্যাপারে এরূপ কোন বাণী পাওয়া যায় না। এ হাদীসের সনদের রাবীদের ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য রয়েছে।

যদি ধরে নেয়া হয় যে, সর্বনামটি কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্ত্যন করেছে, তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বলব:

الطاهر শব্দটি মুশতারিক বা বহু অর্থবোধক শব্দসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তার অর্থটি মু'মিন ব্যক্তি, বড় পবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যক্তি, ছোট পবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যক্তি অথবা শরীরে কোন নাপাক নেই এমন ব্যক্তি উপর প্রযোজ্য হতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে মাসআলাটি উসূল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দিয়ে প্রত্যাবর্তিত হবে।

যারা মুশতারিক শব্দটিকে তার সমস্ত অর্থের উপর প্রযোজ্য হওয়া বৈধ মনে করেন, তারা এখানে সেটাই প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু যখন নাজাসাত বা নাপাক নামটি ওযূ বিহীন মু'মিন অথবা জুনুবী মু'মিনের উপর প্রয়োগ করা হবে তখন তা বিশুদ্ধ হবে না। চাই তা প্রকৃত অর্থে হোক, রূপক অর্থে হোক কিংবা আভিধানিক অর্থেই হোক। কেননা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর বাণী-

"المؤمن لا ينجس"

অর্থাৎ: "মু'মিন কখনও নাপাক হয় না"।[৩৯০] আর এ কথা প্রমাণিত যে, মু'মিন সর্বদা পবিত্র থাকে। কুরআন ও হাদীস দ্বারা মুমিন নাজাসাত হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে। সুতারাং শব্দটি প্রযোজ্য হবে এমন ব্যক্তির উপর যে মুশরিক নয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾

অর্থাৎ: মুশরিকগণ নাপাক *(সূরা তাওবা-২৮)*।

---

[৩৯০] সহীহ বুখারী (২৭৯), মুসলিম (৩৭১)।

www.waytojannah.com

আর হাদীসে শত্রুদের এলাকায় কুরআন নিয়ে ভ্রমণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা বলেন মুশতারিক শব্দটি এক্ষেত্রে মুজমাল বা সংক্ষিপ্তভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং তার অর্থ স্পষ্ট হওয়া ছাড়া তার উপর আমল করা যাবে না। তাহলে বলা হবে, কুরআন ও হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। এমন কি যদিও الطاهر নামটি ছোট নাপাক বা বড় নাপাক ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হয়।[৩৯১]

সুতরাং বুঝা গেল, মাসহাফ (কুরআন) স্পর্শ করার জন্য ওযূ করা ওয়াজিব নয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা, দাউদ ও ইবনে হাযম (রাহি.) এর মতামত। ইবনে আব্বাস ও সালফের একটি দলও এ মতামত পেশ করেছেন। ইবনে মুনযির এ মতটিকে পছন্দ করেছেন।[৩৯২] এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রসঙ্গ কথা:

বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমতে, যদি নাপাক অবস্থায় স্পর্শ ছাড়া শুধু কুরআন পাঠ করা হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই, চাই তা ছোট নাপাকী হোক কিংবা বড় নাপাকী হোক। এক্ষেত্রে মাসহাফ স্পর্শ করার বিধানের চেয়ে এ বিধানটি অনেক শিথিল। কারণ-

(১) এ ক্ষেত্রে কুরআন পাঠে নিষেধজ্ঞার ব্যাপারে কোন বিশুদ্ধ মারফূ হাদীস বর্ণিত হয় নি। এ ব্যাপারে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোই যঈফ। তা দলীলের যোগ্য নয়।
যেমন: আব্দুল্লাহ বিন আমর (ﷺ) থেকে মারফূ সূত্র বর্ণিত আছে যে:

" لا يقرأ الجنب ولاالحائض شيئاً من القرآن "

অর্থাৎ: জুনুবী ও হায়যওয়ালী কুরআন থেকে কিছু পাঠ করবে না।
ইবনে রওয়াহাহ এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ

অর্থাৎ: "রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন যে, আমাদের কেউ যেন জুনুবী অবস্থায় কুরআন পাঠ না করে"।
আব্দুল্লাহ বিন মালিক এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

« إِذَا تَوَضَّأْتُ وَأَنَا جُنُبٌ أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ ، وَلاَ أُصَلِّى وَلاَ أَقْرَأُ حَتَّى أَغْتَسِلَ »

অর্থাৎ: "আমি জুনুবী অবস্থায় যখন ওযূ করি, তখন খাই ও পান করি। কিন্তু গোসল না করা পর্যন্ত সালাত আদায় করি না ও কুরআন পাঠ করি না"। এ হাদীসগুলোর কোনটিই সহীহ নয়।[৩৯৩]

(২) আয়িশা (রা.) থেকে সাব্যস্ত আছে যে, মহানাবী (ﷺ) সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করতেন।[৩৯৪]

(৩) রাসূল (ﷺ) হায়যওয়ালী মহিলাদের ঈদগাহে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে বলেন:

---

[৩৯১] নাইলুল আওতার (১/২৬০-দারুল হাদীস)
[৩৯২] আল-বাদাঈ (১/৩৩), হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন (১/৭৩), আল-মুহাল্লা (১/১৮), আল-আওসাত্ব (২/১০৩)।
[৩৯৩] আলবানী প্রণীত আল-ইরওয়াহ (১৯২,৪৮৫), বাইহাক্বী প্রণীত 'খিলাফিয়্যাত' (২/১১) এ শাইখ মাশহুর এর বিশ্লেষণ।
[৩৯৪] সহীহ; মুসলিম (৩৭৩) , হাদীসের পূর্বে ইমাম বুখারী মুয়াল্লাক্ব সূত্রে বর্ণনা করেছেন (৬০৮)।

Contents

فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ

অর্থাৎ: তারা মানুষের পেছনে দাঁড়াবে তাদের তাকবীরে সাথে তাকবীর দিবে ও তাদের সাথে দু'আয় অংশ গ্রহণ করবে।[৩৯৫]

সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায়, হায়যওয়ালী মহিলা তাকবীর দিতে পারবে ও আল্লাহ তা'আলার যিকর করতে পারবে।

(৪) আয়িশা (রা.) যখন ঋতুবতী ছিলেন তখন মহানাবী (ﷺ) তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

«افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»

অর্থাৎ: "বাইতুল্লাহ ত্বওয়াফ ছাড়া তুমি হাজ্জের সকল কর্ম পালন কর"।[৩৯৬] এতে বুঝা গেল, হাজীগণ আল্লাহর যিকর করতে পারবে ও কুরআন পাঠ করতে পারবে।

উপরের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, নাপাক ব্যক্তির কুরআন পাঠ করতে বাধা নেই। শাইখুল ইসলাম বলেন, এটা ইমাম আবূ হানীফা (রাহি.) এর মাযহাব এবং ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ এর প্রসিদ্ধ মাযহাব।[৩৯৭]

যে সমস্ত কাজে ওযূ করা মুস্তাহাব:

১। আল্লাহ তা'আলার যিকর করার সময়:

এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে সাধারণ যিকর, কুরআন তিলাওয়াত, কাবা শরীফ ত্বওয়াফ ইত্যাদি। এসব কারণে ওযূ করা মুস্তাহাব।

عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ " إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ "

অর্থাৎ: আল-মুহাজির বিন কুনফুয হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, একদা তিনি নাবী করীম (ﷺ) এর খেদমতে এমতাবস্থায় পৌঁছলেন যখন তিনি (ﷺ) পেশাবরত ছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দেন। কিন্তু নাবী করীম (ﷺ) ওযূ না করা পর্যন্ত তার সালামের জবাব থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর তিনি তার নিকট ওযর পেশ করে বলেন: আমি পবিত্র হওয়া বা পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করা অপছন্দ করি।[৩৯৮]

যদিও এটি অবশ্যক নয়, কেননা সহীহ মুসলিমে (৪/৬৮) আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, "মহানাবী (ﷺ) সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করতেন"।

---

[৩৯৫] সহীহ; বুখারী (৯৭১), মুসলিম (৮৯০)।

[৩৯৬] সহীহ; বুখারী (১৬৫০) ।

[৩৯৭] মাজমূ আল-ফাতওয়া (২১/৪৫৯), আল-আওসাত্ব (২/৯৭)।

[৩৯৮] সহীহ; আবূ দাউদ (১৭), নাসাঈ (১/১৬), ইবনে মাজাহ (৩৫০), দারেমী (২/২৮৭),আহমাদ (৫/৮০) এটা সহীহ, যেমনটি "সিলসিলা সহীহা'-তে বর্ণিত হয়েছে (৮৩৪)।

www.waytojannah.com

২। ঘুমানোর সময়ঃ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ...

অর্থাৎ: বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন: যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করে নিবে। তারপর ডান পার্শে শুয়ে বলবে হে আল্লাহ! আমার জীবন আপনার কাছে সমর্পণ করলাম।[৩৯৯]

৩। জুনুবী ব্যক্তি যখন খাওয়া, পান করা, ঘুমানো কিংবা পুনরায় সহবাস করার ইচ্ছা করবেঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) যখন জুনুবী অবস্থায় খাওয়া বা ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন সালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন।[৪০০]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ»

অর্থাৎ: আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানাবী (ﷺ) তিনি বলেছেন: তোমাদের কেউ যদি স্ত্রী সহবাসের পর পুনরায় সহবাস করতে চায় তাহলে সে যেন সালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করে।[৪০১]

৪। গোসল করার পূর্বে ওযূ করাঃ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) যখন জানাবাতের গোসলের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে ঢালতেন এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নিতেন। অতঃপর সালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন।[৪০২]

৫। আগুনে স্পর্শ করা খাবার তথা পাকানো খাবার খেলে ওযূ করাঃ

মহানাবী (ﷺ) এর বাণী- «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»

অর্থাৎ: "তোমরা আগুনে পাকানো খাবার খেলে ওযূ কর"।[৪০৩] এখানে আদেশটি মুস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা আমর বিন উমাইয়্যাহ আযযমারী এর হাদীসে রয়েছে-

عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

---

[৩৯৯] সহীহ; বুখারী (২৪৭), মুসলিম (২৭১০) প্রভৃতি।
[৪০০] সহীহ; বুখারী (২৮৮), মুসলিম (৩০৫) শব্দ গুলো তার, আবূ দাউদ (২২২), তিরমিযী (১১৮), নাসাঈ (১/১৩৮) প্রভৃতি।
[৪০১] সহীহ; মুসলিম (৩/২১৭), আবূ দাউদ (২১৭), তিরমিযী (১৪১), নাসাঈ (১/৪২)।
[৪০২] সহীহ; বুখারী (২৪৮), মুসলিম (৩১৬) প্রভৃতি।
[৪০৩] সহীহ; মুসলিম (৩৫১), আবূ দাউদ (১৯২), তিরমিযী (৭৯), নাসাঈ (১/১০৫), ইবনে মাজাহ (৪৮৫)।

অর্থাৎ: আমর বিন উমাইয়্যাহ আযযমারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নাবী করীম (ﷺ) কে একটি বকরীর কাঁধের গোশত কেটে খেতে দেখলাম। এ সময় সালাতের জন্য ডাকা হলো, তখন তিনি ছুরি ফেলে দিয়ে সালাত আদায় করলেন; কিন্তু ওযূ করলেন না।[৪০৪]

৬। প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুনভাবে ওযূ করা:

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

অর্থাৎ: বুরাইদাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযূ করতেন। তবে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ওযূ করেছেন ও দু'মোজার উপর মাসাহ করেছেন এবং এক ওযূ দ্বারাই কয়েক ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছেন।[৪০৫]

৭। যে সমস্ত নাপাকীর কারণে ওযূ নষ্ট হয় তা সংঘটিত হওয়ার পর ওযূ করা:

যেমন: পূর্বোল্লেখিত বিলাল (رضي الله عنه) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানাবী (ﷺ) জান্নাতে (বেলালের) জুতার আওয়াজ শুনে বলেছিলেন, কি কারণে তুমি আমার অগ্রগামি হয়েছ? তখন বিলাল বললেন:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِهَذَا»

অর্থাৎ: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি যখনই আযান দিতাম তখনই দু'রাক'আত সালাত আদায় করতাম এবং যখনই আমার ওযূ ভঙ্গ হয়ে যেত, কখনই ওযূ করে নিতাম। তখন মহানাবী (ﷺ) বললেন, এ জন্যই।[৪০৬]

৭। বমি হওয়ার পর ওযূ করা:

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ، فَتَوَضَّأَ» ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ،:

অর্থাৎ: মি'দান বিন আবূ ত্বলহা আবূ দারদা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করে বলেন: রাসূল (ﷺ) বমি করলেন, ফলে তিনি ওযূ করলেন। মিদান বলেন, আমি দামেশকের মাসজিদে সাওবান (رضي الله عنه) এর সাথে দেখা করে **তাঁকে এ কথা বললাম।** তিনি বললেন, আবূ দারদা (رضي الله عنه) ঠিকই বলেছেন, এ সময় আমি তাঁর (রাসূল ﷺ) **এর ওযূর পানি ঢেলেছিলাম।**[৪০৭]

---

[৪০৪] **সহীহ: বুখারী (১/৫০), মুসলিম** (৪/৪৫, নাববী প্রণীত), ইবনে মাজাহ (৪৯০)।

[৪০৫] **সহীহ: মুসলিম** (২৭৭), আবূ দাউদ (১৭১), তিরমিযী (৬১), নাসাঈ (১/৮৯), ইবনে মাজাহ (৫১০)।

[৪০৬] **এর সনদ সহীহ,** তিরমিযী তার হাদীসে ওযূসহ উল্লেখ করেছেন (৩৬৮৯),আবূ দাউদ (৩০৫৫), আহমাদ (২১৯৬২) শব্দগুলো তার, **সহীহাইনে এটা বর্ণিত** হয়েছে শাহেদের অংশ ছাড়া।

[৪০৭] **সহীহ: তিরমিযী (৮৭),** আবূ দাউদ (২৩৮১), সনদ সহীহ।

আচ্ছাদন বা আবরণীর উপর মাসাহ

প্রথমত: দুই মোজার উপর মাসাহ করা:

خف এর সংজ্ঞা:

দুই টাখনুকে ঢেঁকে রাখে এমন চামড়ার জুতাকে خف বলা হয়।[৪০৮] পাঁয়ে বেড়ে থাকা দুই হাড্ডিকে কা'ব বলা হয়।

المسح এর আভিধানিক অর্থ:

مسح শব্দটি مسْحٌ মাসদার হতে গৃহীত। কোন বস্তুর উপর মৃদু হাত বুলানোকে মাসাহ বলা হয়।[৪০৯] আর মোজার উপর মাসাহ করা বলতে বুঝায়, ওযূতে দু'পা ধোয়ার বিকল্প হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট মোজার উপর ভিজা হাত বুলানো।[৪১০]

মোজার উপর মাসাহ করার ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান:

বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন করে মোজা পরিধান করার পর ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে সে মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করতে পারবে।[৪১১] ইবনুল মুবারাক বলেন: মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই, বরং তা বৈধ। এক্ষেত্রে রাসূল (ﷺ) এর সাহাবীদের পক্ষ থেকে মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করা মাকরূহ ও জায়েয উভয়টিই বর্ণিত আছে।[৪১২] তবে রাসূল (ﷺ) থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের সহীহ হাদীস দ্বারা এটা শরীয়াতসম্মত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে।

عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» . قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ، كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ»

অর্থাৎ: হাম্মাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: একদিন জারীর পেশাব করার পর ওযূ করলেন এবং মোজার ওপর শুধু মাসাহ করলেন। তাকে প্রশ্ন করা হলো (সম্ভবতঃ প্রশ্নকারী হাম্মাম নিজেই) আপনি এরূপ করছেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ! আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কে দেখেছি, তিনি পেশাব করার পর ওযূ করে মোজার ওপর মাসাহ করেছেন। ইবরাহীম বলেন, জারীরের এ কথাটি তাদের কাছে খুবই ভাল লেগেছে। কেননা, জারীর 'সূরা মায়িদা' নাযিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[৪১৩]

---

[৪০৮] নাইলুল আওতার (১/২৪১)।
[৪০৯] আল-কামুসুল মুহীত্ব, মাক্বায়িসুল লুগাহ্।
[৪১০] আদ-দুররুল মুখতার (১/১৭৪)।
[৪১১] আল-ইজমা' (২০) ইবনে মুনযির প্রণীত। আল-আওসাত্ব (১/৪৩৪)।
[৪১২] আল-আওসাত্ব (১/৪৩৪), সুনানুল বাইহাক্বী (১/২৭২), আল-ফাতহ (১/৩০৫)।
[৪১৩] সহীহ; বুখারী (৩৮৭), মুসলিম (১৫৬৮) তবে শব্দগুলো মুসলিমের।

Contents

মোজার উপর মাসাহ্ করার বিধানঃ

অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ্ করা বৈধ। তবে এর চেয়ে পা ধৌত করা উত্তম। আর হাম্বালী মাযহারের মতে, এ ব্যাপারে অবকাশ থাকার কারণে মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ্ করা উত্তম।[৪১৪]

বিশুদ্ধ অভিমতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির পায়ের অবস্থা অনুযায়ী উত্তম হওয়ার বিষয়টি বিবেচিত হবে। সুতরাং যে মোজা পরিধান করবে সে তার উপর মাসাহ্ করবে এবং মোজা খুলবে না। এতে মহানাবী (ﷺ) ও সাহাবাদের অনুসরণ করা হবে। আর যে ব্যক্তির পা খোলা থাকবে তার জন্য পা ধৌত করা উত্তম। আর পা খোলা থাকলে তাতে মোজা পরিধান করে তার উপর মাসাহ্ করার প্রয়াস চালাবে না[৪১৫] এবং মোজা পরে থাকলে সময়ের মধ্যে তা খুলে পা ধৌত করারও প্রয়াস চালাবে না। আল্লাহ ভাল জানেন।

মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ্ করার সময়সীমাঃ

ইসলামী শরীয়াত মুসাফিরের (ভ্রমণকারী) জন্য তিনদিন তিন রাত ও মুকীমের (বাড়িতে অবস্থানকারী) জন্য একদিন একরাত মোজার উপর মাসাহ্ করার সময় সীমা নির্ধারণ করেছে। এটা অধিকাংশ বিদ্বান তথা হানাফী, হাম্বালী মাযহাবের অভিমত। নতুন অভিমত অনুযায়ী এটা ইমাম শাফেঈ এর প্রকাশ্য অভিমত। জাহেরী মাযহাবও এ অভিমত পেশ করেছেন।[৪১৬]

এর প্রমাণ নিম্নরূপঃ

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ – يَعْنِي فِي الْمَسْحِ

(১) আলী (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) মুসাফিরের জন্য তিন দিন-তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত মোজার উপর মাসাহ্ করার অনুমতি দিয়েছেন।[৪১৭]

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ "

(২) আওফ বিন মালিক আল আশজায়ী (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) তাবুক যুদ্ধের দিন মুসাফিরের জন্য তিন দিন-তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত মোজার উপর মাসাহ্ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৪১৮]

(৩) সফওয়ান বিন আস্সাল (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

«كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ»

---

[৪১৪] ফাতহুল কাদীর (১/১২৬), শারহুস সগীর (১/২২৭), আল-মাজমূ' (১/৫০২) মুনতাহাল ইরাদাত (১/২৩)।

[৪১৫] এটা শাইখুল ইসলামের মতামত, যা এসেছে আল-ইখতিয়ারাত গ্রন্থে (১৩ পৃ.)।

[৪১৬] আল-মাসবূত্ব (১/৯৮), আল-উম্ম (১/৩৪), আল-মুগনী (১/২০৯), আল-মুহাল্লা (২/৮০)।

[৪১৭] সহীহ; মুসলিম (২৭৬), নাসাঈ (১/৮৪)।

[৪১৮] সহীহ; আহমাদ (৬/২৭), সহীহ সনদে, আবু বাকরাহর হাদীসটি এর শাহেদ, ইবনে মাজাহ (৫৫৬), প্রভৃতি।

www.waytojannah.com

অর্থাৎ: আমরা যখন সফরে থাকতাম, তখন রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে জানাবাতের অপবিত্রতা ছাড়া তিনদিন ও তিন রাত আমাদের মোজা না খুলতে নির্দেশ দিতেন। কিন্তু পেশাব-পায়খানা ও ঘুমের কারণে কোন সমস্যা হতো না।[৪১৯]

এ ক্ষেত্রে ইমাম মালিক (রাহি.) বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। আর এটা ইমাম শাফেঈর (রাহি.) পুরাতন অভিমত। তাদের মতে মোজার উপর মাসাহ করার কোন সময়সীমা নেই। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা খোলা না হবে ও জুনুবী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মোজার উপর মাসাহ করা যাবে। এটা লাইস (রাহি.) এরও অভিমত।[৪২০] তারা কিছু যঈফ হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন, তন্মধ্যে-

عَنْ أُبَيٍّ بْنِ عِمَارَةَ، قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقِبْلَتَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: «يَوْمًا» ، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «وَيَوْمَيْنِ» ، قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ وَمَا شِئْتَ»

(১) অর্থাৎ: উবাই ইব্ন ইমারাহ হতে বর্ণিত। ইয়াহ্ইয়া ইবন আইউব বলেন: তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে উভয় কিবলার দিকে মুখ করে সালাত পড়েছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমি কি মোজার উপর মাসাহ করব? তিনি বলেন: হ্যাঁ। রাবী তাকে এক, দুই ও তিন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে- তিনি বলেন: তুমি যত দিনের জন্য ইচ্ছা কর। অপর এক বর্ণনায় আছে: তিনি প্রশ্ন করতে করতে সাত দিন পর্যন্ত পৌঁছান। জবাবে রাসূল (ﷺ) বলেন, হ্যাঁ যত দিন তুমি প্রয়োজন বোধ কর।[৪২১]

(২) খুযাইমা ইবন সাবিত (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি (ﷺ) বলেন: মোজার উপর মাসাহ করার নির্ধারিত সময়সীমা হলো তিন দিন। আমরা যদি তাঁর নিকট অধিক সময়সীমা প্রার্থনা করতাম, তবে তিনি আমাদের জন্য অধিক সময় অনুমোদন করতেন।[৪২২] অর্থাৎ: এর দ্বারা মুসাফিরের জন্য দু'মোজার উপর মাসাহ করা বুঝানো হয়েছে। এ হাদীসটি যদি সহীহ হত তবুও এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। কেননা এটা সাহাবীর একটি ধারণা মাত্র। এর দ্বারা ইবাদাত করা যেতে পারে না।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :« إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ لاَ يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ».

(৩) আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন: তোমাদের কেউ যদি ওযূ করে মোজা পরিধান করে অতঃপর তা পরিধান করে সালাত আদায় করে, তাহলে পরে যদি সে চায় তবে মোজা না খুলে মোজার উপর মাসাহ করলেই চলবে। তবে জানাবাতের নাপাকীর কারণে মাসাহ বৈধ হবে না।[৪২৩] উল্লেখিত সব হাদীসগুলোই যঈফ। এগুলো দলীলের যোগ্য নয়।

---

[৪১৯] হাসান; কিছু পূর্বে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।
[৪২০] আল- মুদাওা ওয়ানাহ (১/৪১), বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/২৪)।
[৪২১] যঈফ; আবূ দাউদ (১৫৮) ইবনু আব্দিল বার বলেন, এ হাদীসটি প্রমাণিত নয় এবং এর নির্ভরযোগ্য সূত্রও নেই।
[৪২২] যঈফ; আবূ দাউদ (১৫৭), তিরমিযী, ইবনে মাজাহ (৫৫৩)।
[৪২৩] যঈফ, বাইহাক্বী (১/২৮০)।

Contents

(৪) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي : مَتَى أَوْلَجْتَ خُفَّيْكَ فِي رِجْلَيْكَ؟ قُلْتُ : يَوْمَ الْجُمُعَةِ. قَالَ : فَهَلْ نَزَعْتَهُمَا؟ قُلْتُ : لاَ. قَالَ : أَصَبْتَ السُّنَّةَ.

(৪) আলকামা বিন আমের আল জুহানী এর আসারে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: একদা আমি শাম থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমি শাম থেকে বের হয়ে ছিলাম জুম'আর দিন এবং মদিনায় পৌঁছেছিলাম তার পরবর্তী জুম'আর দিন। অতঃপর আমি উমার বিন খাত্তাবের কাছে গেলে তিনি আমাকে বলেন, তুমি কখন তোমার পায়ে মোজা পরিধান করেছ? তখন আমি উত্তরে বললাম, জুম'আর দিন। তখন তিনি বললেন তুমি কি মোজাদ্বয়কে আর খুলেছিলে? আমি বলালম না, তখন তিনি বললেন তুমি ঠিক করেছ।[৪২৪] অনুরূপভাবে এ বর্ণনাটিও যঈফ।

বাইহাক্বী বলেন, আমাদের কাছে উমার (রাঃ) থেকে সময়-সীমার কথা বর্ণিত হয়েছে। হয়ত তিনি রাসূল (ﷺ) থেকে হাদীস পাওয়ার কারণে এ মতের (সময়-সীমার) দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন অথবা তার মতামতটি প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস অনুযায়ী হওয়াটাই উত্তম।

এজন্য ইবনে হাযম (রাহি.) ''মুহাল্লা'' গ্রন্থে (২/৯৩) বলেন, "শুধু ইবনে উমার ছাড়া সাহাবাদের পক্ষ থেকে আর কেউ সময় নির্ধারণের ব্যাপারে কোন মতানৈক্য করেন নি"।

মোজার উপর মাসাহ করার সময় সীমার সূচনা:

শরীয়াত কর্তৃক এটা নির্ধারিত যে, মুকীম হলে তার মাসাহ করার সময়সীমা একদিন একরাত এবং মুসাফির হলে তিনদিন তিনরাত। কিন্তু কখন থেকে এ সময়ের গণনা শুরু হবে? বিদ্বানদের মাঝে এ ব্যাপারে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়-

প্রথম: মোজা পরিধানের পর প্রথম হাদস (ওযূ ভঙ্গ) থেকে এ সময়ের সূচনা হবে:

এটা সুফয়ান সাওরী, শাফেঈ, আবূ হানীফা ও তার অনুসারী এবং হাম্বালী মাযহারের প্রকাশ্য অভিমত।[৪২৫] তারা বলেন, কেননা মাসাহ এর ক্ষেত্রে যেমন দূরত্ব নির্ধরণ করা হয় তেমনি প্রথম হাদাসের পরের সময় থেকেই মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ হয়।

দ্বিতীয়: মোজা পরিধান করার পর থেকেই এ সময়ের সূচনা হবে: এটা হাসান বাসরী (রাহি.) এর অভিমত।[৪২৬]

তৃতীয়: মুকীম হলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সমপরিমাণ মাসাহ করবে। আর মুসাফির হলে ১৫ ওয়াক্ত সালাত সমপরিমাণ সময় মাসাহ করবে। এর বেশি সময় মাসাহ করবে না: এটা ইমাম শাফেঈ, ইসহাক ও আবূ সাওরসহ অন্যান্যদের অভিমত।[৪২৭]

---

[৪২৪] যঈফ, বাইহাক্বী (১/২৮০), ত্বাহাবী (১/৪৮), আদ-দারাকুতনী (৭২)।
[৪২৫] আল-মাসবূত্ব (১/৯৯), আল-মাজমু (১/৪৭০), আল-মুগনী (১/২৯১) আল-আওসাত্ব (১/৪৪৩)।
[৪২৬] 'আল-ইকলিল শারহু মানারিস সাবিল', শাইখ ওয়াহিদ আবদুস সালাম প্রণীত (১/১৩৬) আল্লাহ তাঁকে এর দ্বারা উপকৃত করুন।
[৪২৭] আল-মুগনী (১/২৯১), আল-মাজমু (১/৪৪৬), আল-আওসাত্ব (১/৪৪৪)।

www.waytojannah.com

চতুর্থ: হাদাসের (ওযূ ভঙ্গের) পরেই যখন তার জন্য মাসাহ করা বৈধ হবে তখন থেকেই এ সময় সূচনা হবে। চাই সে মাসাহ করুক বা ওযূ ও মাসাহ না করুক: এমনকি যদি মাসাহ বৈধ হওয়ার পর কিছু সময় অতিক্রম করার পর মাসাহ করে, তাহলে শুধু বাকি সময় মাসাহ করতে পারবে। এটা ইবনে হাযম (রাহি.) এর অভিমত। তিনি অনেক মাযহাবের কথা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সেখানে দেখে নিন![৪২৮]

পঞ্চম: হাদাসের (ওযূ ভঙ্গের) পরে যখন প্রথম মাসাহ করা হবে তখন থেকে এ সময়ের সূচনা হবে:[৪২৯] এটা আহমাদ ইবনে হাম্বাল ও আওযায়ী (রাহি.) এর অভিমত। ইমাম নাববী, ইবনে মুনযির ও ইবনে উসাইমীন (রাহি.) এ অভিমতকে পছন্দ করেছেন। এটাই প্রাধান্য প্রাপ্ত অভিমত। যেহেতু মহানাবী (ﷺ) প্রকাশ্য ভাবেই বলে দিয়েছেন- "মুসাফির মাসাহ করবে" ও "মুকীম মাসাহ করবে"। আর মাসাহ করা কার্যটি সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত কাউকে মাসাহকারী বলা সম্ভব নয়। সুতরাং দলীল ছাড়া প্রকাশ্য অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করা বৈধ হবে না। আল্লাহ ভাল জানেন।

এর উপর ভিত্তি করে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি যদি যূহরের সালাতের সময় ওযূ করে এবং ১২ টার সময় মোজা পরিধান করে আসরের সময় তথা ৩টা পর্যন্ত পবিত্র অবস্থায় থাকে। এরপর ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং আসরের পর বিকাল ৪ টার সময় ওযূ করে মোজার উপর মাসাহ করে। তাহলে সে যদি মুকীম হয়, তবে পরবর্তী দিন আসরের সময় বিকাল ৪টা পর্যন্ত মাসাহ করতে পারবে। আর মুসাফির হলে ৪র্থ দিন ঐ সময় পর্যন্ত মাসাহ করতে পারবে।

যদি মুকীম ব্যক্তি মোজায় মাসাহ করার পর সফর করে তাহলে তার বিধান:

যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় মোজার উপর মাসাহ করে একদিন ও এক রাতের কম সময় অবস্থান করার পর সফরে বের হয়, তাহলে এ মাস'আলাটির ক্ষেত্রে বিদ্বানদের দু'টি অভিমত পরিলক্ষিত হয়-

১ম: মুকীম অবস্থায় যে পরিমাণ সময় মাসাহ করেছে তা সহ বাকি তিন দিন তিন রাত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সে মোজায় মাসাহ করতে পারবে: এটা সাওরী, আবূ হানীফা ও তার অনুসারীদের অভিমত। একটি বর্ণনা মতে, ইমাম আহমাদও এ মত পোষণ করেছেন। ইমাম ইবনে হাযমও এ মতের প্রবক্তা।[৪৩০]

২য়: সে একদিন এক রাত পূর্ণ করা পর্যন্ত মাসাহ করতে পারবে। এরপর তার জন্য ওযূ করার সময় দু'পা ধৌত করা আবশ্যক হবে: এটা ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক (রাহি.) এর অভিমত।[৪৩১]

বিশুদ্ধ অভিমত হলো: তিন দিন তিন রাত পরিপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সে মাসাহ করতে পারবে। কেননা এই ব্যক্তিটি যখন মুসাফির অবস্থায় একদিন একরাত অতিবাহিত করবে, তখন সে মুসাফিরের মুদ্দাত বা সময় পূরণ করতে পারবে, কারণ হাদীসে স্পষ্টই বলা হয়েছে– "মুসাফির তিনদিন-তিনরাত মাসাহ করবে"। আল্লাহই ভাল জানেন।

---

[৪২৮] আল-মুহাল্লা (২/৯৫-পরবর্তী অংশ), ইবনু হাযম প্রণীত।
[৪২৯] মাসাইলু আহমাদ (১০) আবূ দাউদ প্রণীত। আল-মুহাল্লা (২/৯৫)।
[৪৩০] 'ইখতিলাফুল উলামা' (পৃ.৩১) আল-মারওয়াযী প্রণীত। আল-মুগনী (১/২৯৯), আল-মুহাল্লা (২/১০৯)।
[৪৩১] আল-উম্ম (১/৩৫), ইখতিলাফুল উলামা (পৃ.৩১), আল-আওসাত্ব (১/৪৪৬)।

Contents

যদি কেউ মুসাফির অবস্থায় মোজার উপর মাসাহ করে বাড়িতে ফিরে আসে তাহলে তার বিধানঃ

যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় একদিন একরাত কিংবা তার চেয়ে বেশি সময় মোজার উপর মাসাহ করে, অতঃপর বাড়িতে ফিরে আসে, তার জন্য ওযূ করার সময় মোজা খুলে দু'পা ধৌত করা আবশ্যক। এরপর মুকীম ব্যক্তির জন্য যা কর্তব্য তা পালন করবে। আর যদি মুসাফির অবস্থায় একদিন এক রাতের কম সময় মাসাহ করে তাহলে বাড়ি ফিরার পর দিন ও রাতের বাকি অংশ মাসাহ করে মুদ্দাত পূর্ণ করা তার জন্য বৈধ। এরপর খুলে ফেলা আবশ্যক। ইবনে মুনযির বর্ণনা করেন- বিদ্বানগণের মাঝে যারা মাসাহ এর সময়সীমা নির্ধারণ করার কথা বলেছেন তাদের সকলেই এই মতের উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[৪৩২]

চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করার শর্তসমূহঃ

মোজার উপর মাসাহ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করতে হবে। মুগীরা ইবনে শোবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي: «أَمَعَكَ مَاءٌ» قُلْتُ: نَعَمْ «فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ» فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا»

কোনো এক সফরে (শেষে) রাতের বেলা আমি নাবী (ﷺ) এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কাছে কি পানি আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তখন তিনি সওয়ারী থেকে নেমে চলতে থাকলেন এবং (কিছুক্ষণের মধ্যে) রাতের অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরে আসলে আমি পাত্র থেকে তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি মুখমণ্ডল ধুলেন। তখন তাঁর গায়ে ছিলো একটি পশমের জুববা। তিনি তা থেকে হাত দু'খানা (বের করার চেষ্টা করেও) বের করতে পারলেন না। অবশেষে জুববার নীচ দিয়ে বাহু দু'খানা বের করে নিয়ে ধুলেন এবং মাথা মাসাহ করলেন। এরপর আমি তার মোজা খুলতে উদ্যত হলে, তিনি বললেন: রাখো। আমি পবিত্র অবস্থায় এ দুটি পরিধান করেছিলাম। এ বলে তিনি মোজার উপরে মাসাহ করলেন।[৪৩৩]

অত্র হাদীসে মাসাহ বৈধ হওয়ার জন্য পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করাকে শর্ত করা হয়েছে। আর শর্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সে বিষয়ের শর্তের অস্তিত্ব ছাড়া বিশুদ্ধ হয় না। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, পবিত্রতা বলতে শারঈ পন্থায় ওযূ করে পবিত্রতা অর্জন করাকে বুঝায়।[৪৩৪]

---

[৪৩২] আল-আওসাত্ব (১/৪৪৬)।
[৪৩৩] সহীহ, বুখারী (২০৬), মুসলিম (২৩২)।
[৪৩৪] ফাতহুল বারী (১/৩৭০)।

www.waytojannah.com

প্রয়োজনীয় কথা:

যে ব্যক্তি এক পা ধৌত করার পর তাতে মোজা পরিধান করালো অতঃপর অন্য পা ধুয়ে তাতে মোজা প্রবেশ করালো, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমাদ (রাহি.) বলেন[৪৩৫], তাহলে তার জন্য ওযূ ভঙ্গের পর মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করা বৈধ হবে না। কেননা সে ত্বহারাত পূর্ণ করার পূর্বেই পায়ে মোজা প্রবেশ করিয়েছে। তবে যদি সে প্রথমটি খুলে আবার পরিধান করে তাহলে তাদের নিকট মাসাহ বৈধ বলে গণ্য হবে।

অপর পক্ষে ইমাম আবূ হানীফা, আহমাদের দু'টি অভিমতের একটিতে ও ইবনে হাযমের মতে, উভয় মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ। কেননা সে উভয় মোজাকে দু'পা পবিত্র করেই প্রবেশ করিয়েছে। ইবনে মুনযির ও শাইখুল ইসলাম এ মতকে পছন্দ করেছেন।[৪৩৬]

আমার বক্তব্য: বৈধ হওয়ার অভিমতটি যুক্তিযুক্ত। এ ক্ষেত্রে গোঁড়ামী করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। যতক্ষণ পর্যন্ত "কিছু অংশ পবিত্র করার কারণে তা নিষিদ্ধ হবে" এরূপ কোন দলীল না পাওয়া যায়। তবে প্রত্যেকটির উপর আমল করা যায়। আর সতর্কতার কথা বিবেচনা করলে ওযূ সম্পূর্ণ করার পরই দু'পা মোজায় প্রবেশ করানো দরকার। আল্লাহ ভাল জানেন।

ছেঁড়া মোজার উপর কি মাসাহ করা যাবে?

অধিকাংশ ফক্বীহ মোজা মাসাহ বৈধ হওয়ার জন্য ওযূর সময় ধৌত করতে হয় এমন ফরযকৃত স্থানকে ঢাকা শর্ত করেছেন। ফলে তারা ছেঁড়া মোজার উপর মাসাহ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এতে ওযূর অঙ্গ দেখা যায়, যা ধৌত করা ফরয। আর ধৌত ও মাসাহ কখনও একত্রিত হয় না। এমন হলে ধৌত করার হুকুমটিই প্রধান্য পেয়ে যাবে। এটা ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ (রাহি.) এর অভিমত।[৪৩৭]

অন্যদিকে ইমাম মালিক ও আবূ হানীফা (রাহি.) বলেন: ছেঁড়া মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ, যতক্ষণ পর্যন্ত তা পরিধান করে চলাফেরা করা সম্ভব হবে ও তার নাম অবশিষ্ট থাকবে। এটা সাওরী, ইসহাক, আবূ সাওর ও ইবনে হাযমের অভিমত। ইবনে মুনযির ও ইবনে তাইমিয়াহ এই অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন।[৪৩৮] এ অভিমতটিই বিশুদ্ধ। কেননা মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতিটা সাধারণভাবে দেয়া হয়েছে। প্রকাশ্য খবর অনুযায়ী মোজা নামে অবহিত এমন প্রত্যেক মোজা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং দলীল ব্যতীত মোজার মধ্যে কিছু মোজাকে বাদ দেয়া যাবে না। যদি ছেঁড়া মোজার উপর মাসাহ করা নিষেধ হত, তাহলে এ ব্যাপারে মহানাবী (ﷺ) বর্ণনা করতেন। বিশেষ করে, মহানাবী (ﷺ) জামানায় অনেক গরীব সাহাবা ছিলেন তাদের অধিকাংশরাই ছিঁড়া মোজা পরিধান করতেন।

---

[৪৩৫] আল-মুওয়াত্ত্বা (১/৪৬), আল-উম্ম (১/৩৩), আল-মুগনী (১/২৮২)।

[৪৩৬] আল-মাসবূত্ব (১/৯৯), আল-আওসাত্ব (১/৪৪২), মাজমূ' আল-ফাতাওয়া (২১/২০৯), আল-মুহাল্লা (২/১০০)।

[৪৩৭] আল-উম্ম (১/২৮), মাসায়িলু আহমাদ (১/১৮) ইবনু হানী প্রণীত, আল-মুগনী (১/২৮৭)।

[৪৩৮] আল- মুদাও ওয়ানাহ (১/৪৪), আল-মাসবূত্ব (১/১০০), আল-আওসাত্ব (১/৪৪৯), আল-মুহাল্লা (২/১০০), মাজমূ' আল-ফাতাওয়া (২১/১৭৩)।

Contents

মাসাহ করার স্থান ও তার নিয়মঃ

শরীয়াতে মোজার উপর মাসাহ করার নিয়ম হলো, একবার মোজাদ্বয়ের উপর অংশে মাসাহ করতে হবে। নিচের অংশে নয়।

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ»

অর্থাৎ: আলী (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ধর্মের মাপকাঠি যদি রায়ের (বিবেক-বিবেচনা) উপর নির্ভরশীল হতো, তবে মোজার উপরের অংশে মাসাহ না করে নিম্নাংশে মাসাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। আলী (ﷺ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে তাঁর মোজার উপরের অংশে মাসাহ করতে দেখেছি।[৪৩৯]

এটা সাওরী, আওযায়ী, আহমাদ, আবূ হানীফা ও তার অনুসারীদের অভিমত।[৪৪০] এই অভিমতটিই বিশুদ্ধ।

আর মালিক ও শাফেঈ (রাহি.) এর মতে[৪৪১], মোজাদ্বয়ের উপরে ও নিচে উভয় অংশেই মাসাহ করতে হবে। তবে যদি শুধু উপর অংশে মাসাহ করে তাহলে যথেষ্ট হবে। তারা মুগীরাহ বিন শুবা এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ দিয়ে থাকেন-

عَنِ الْمُغِيرَةِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ أَسْفَلَ الْخُفِّ وَأَعْلَاهُ»

অর্থাৎ: "মুগিরাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) একদা ওযূ করলেন। অতঃপর মোজার উপর ও নিচ অংশে মাসাহ করলেন"।[৪৪২] এ হাদীসটি যঈফ। বরং মুগীরাহ থেকে বর্ণিত আছে:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ»

অর্থাৎ: রাসূল (ﷺ) মোজার উপর অংশে মাসাহ করেছেন।[৪৪৩]

সুতরাং শুধু মোজার উপর অংশ ছাড়া মাসাহ করা যাবে না। আর যদি উপর অংশ ছাড়া শুধু নিচের অংশে মাসাহ করা হয় তাহলে মাসাহ বৈধ হবে না। আল্লাহ ভাল জানেন।

যে কারণে মোজার উপর মাসাহ করার বিধান বাতিল হবে:

সফওয়ান বিন আসসাল (ﷺ)এর হাদীসে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে-

«كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ»

অর্থাৎ: "আমরা যখন সফরে থাকতাম, তখন রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে জানাবাতের অপবিত্রতা ছাড়া তিন দিন ও তিন রাত আমাদের মোজা না খুলতে নির্দেশ দিতেন। তবে পেশাব-পায়খানা ও ঘুমের

---

[৪৩৯] সহীহ; আবূ দাউদ (১৬২), আদ-দারাকুতনী (৭৩), আল-বাইহাক্বী (২/১১১), আল-ইরওয়া (১০৩)।

[৪৪০] ইখতিলাফুল উলামা (পৃ.৩০), মাসায়িলু আহমাদ (১/২১) ইবনু হানী প্রণীত আল-আওসাত্ব (১/৪৫৩), আল-মুহাল্লা (২/১১১)।

[৪৪১] নিহায়াতুল মুহতাজ (১/১৯১), আল- মুদাও ওয়ানাহ (১/৩৯), আল-খারাশী (১/১৭৭)।

[৪৪২] যঈফ; আবূ দাউদ (১৬৫), তিরমিযী (৯৭), ইবনে মাজাহ (৫৫০) আহমাদ (৪/২৫১)। ইমাম আহমাদ, বুখারী, আবু হাতিম, দারাকুতনী, ইবনে হাজার প্রমুখ বিদ্বানগণ এ হাদীসের ত্রুটি বর্ণনা করেছেন।

[৪৪৩] হাসান; আবূ দাউদ (১৬১), তিরমিযী (৯৮) প্রভৃতি।

www.waytojannah.com

কারণে কোন সমস্যা হতো না"। সুতরাং বুঝা গেল, নিম্নের কারণগুলো সংঘটিত হলে মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ হবে না-

১। জানাবাত ও এ জাতীয় বিষয় যা গোসল ওয়াজিব করে। যেমন হায়য ও নিফাস থেকে পবিত্রতা অর্জন।

২। মাসাহ এর সময়সীমা শেষ হলে।

৩। মোজা খুলে ফেললে এবং মোজা পরিধানের পূর্বেই পবিত্রতা নষ্ট হলেঃ

যদি কেউ মোজা খুলে ফেলে, যদিও তা সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে হয় অতঃপর পবিত্রতা নষ্ট হয়, তাহলে তার জন্য তা পরিধান করা বৈধ হবে না ও তা উপর মাসাহ করা বৈধ হবে না। কেননা এ সময় সে পবিত্র অবস্থায় পায়ে মোজা পরিধান করে নি। উল্লেখিত ৩টি বিষয়ের যে কোন একটি সংঘটিত হলে মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ হবে না। বরং যখন পবিত্রতা নষ্ট হবে তখন তার জন্য ওযূ করে পা ধৌত করা আবশ্যক। তারপর পূর্বোল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী মোজা পরিধান করে তার উপর মাসাহ করবে।

সতর্কবাণীঃ মাসাহ এর বিধান বাতিল হলে ওযূ নষ্ট হয় নাঃ

যে ব্যক্তি মোজার উপর মাসাহ করার পর তা খুলে ফেলল। কিন্তু সে অপবিত্র হলো না, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে তার বিধানের ব্যাপারে বিদ্বানদের মাঝে ৪টি অভিমত পরিলক্ষিত হয়।

১মঃ এ অবস্থায় তাকে পুনরায় ওযূ করতে হবেঃ এটি নাখঈ, আওযায়ী, আহমাদ ও ইসহাক (রাহি.) এর অভিমত।[৪৪৪] পুরাতন একটি মত অনুযায়ী ইমাম শাফেঈও এ মত প্রকাশ করেছেন। **তারা বলেনঃ** মাসাহ হলো ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং যখন মাসাহকে দূর করা হবে তখন দু'পায়ের পবিত্রতা বাতিল হয়ে যাবে। এ দ্বারা সমস্ত পবিত্রতা বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এর ফলে পবিত্রতা যথেষ্ট হয় না।

২য়ঃ তার জন্য শুধু দু'পা ধৌত করা আবশ্যকঃ এটা সাওরী, আবূ হানীফা ও তার অনুসারী এবং আবূ সাওর এর অভিমত। নতুন মত অনুযায়ী ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এ মত পেশ করেছেন।[৪৪৫]

৩য়ঃ তার জন্য মোজা খোলার পর দ্রুত দু'পা ধৌত করা আবশ্যক। যদি দেরী হয়ে যায় তাহলে তাকে পুনরায় ওযূ করতে হবেঃ এটা ইমাম মালিক ও লাইস এর অভিমত।[৪৪৬]

৪র্থঃ তাকে ওযূ করতে হবে না এবং দু'পাও ধৌত করতে হবে নাঃ
এটা নাখঈ এর একটি বর্ণনা। হাসান বসরী, আত্বা ও ইবনে হাযম (রাহি.) এ মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম নাববী, ইবনে মুনযির ও ইবনে তাইমিয়াহ এ মতটিকে পছন্দ করেছেন।[৪৪৭] এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

---

[৪৪৪] ইখতিলাফুল উলামা (পৃ.৩১), মাসায়িলু আহমাদ (১/১৯) ইবনুহানী প্রণীত, আল-মাজমূ' (১/৫৫৭)।
[৪৪৫] 'ইখতিলাফুল উলামা' (পৃ.৩১) আল-আওসাত্ব (১/৪৫৮)।
[৪৪৬] আল- মুদাও ওয়ানাহ (১/৪১)।
[৪৪৭] আল-মুহাল্লা (২/১০৫), আল-আওসাত্ব, (১/৪৬০), আল-মাজমূ' (১/৫৫৮) আল-ইখতিয়ারাত (পৃ.১৫)।

www.waytojannah.com

Contents

কেননা মোজা পরিহিত পা পবিত্র এবং তা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ দ্বারা পরিপূর্ণ পবিত্রতার আওতাধীন। সুতরাং সুন্নাহ ও ইজমার প্রমাণ ছাড়া "মোজা খুললেই ওযূ নষ্ট হবে" এমনটি বলা বৈধ নয়। যারা পুনরায় ওযূ করতে বলেন অথবা দু'পা ধৌত করতে বলেন তাদের কোন প্রমাণ নেই। বরং এর সমর্থনে আবূ যিবইয়ান এর হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য-

عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ، ثم دعا بماء ، فتوضأ ومسح على نعليه ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه ، ثم صلى

আবূ জিবয়্যান হতে বর্ণিত, তিনি আলী (ﷺ) কে দেখলেন যে, তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন ও পানি নিয়ে ডাকলেন, অতঃপর তিনি ওযূ করলেন ও দুই জুতার উপর মাসাহ করলেন, এরপর মাসজিদে প্রবেশ করে জুতা খুলে সালাত আদায় করলেন।[৪৪৮]

আবার কিয়াস করে বলা যেতে পারে যে, যে ব্যক্তি চুল মাসাহ করে মাথা মুন্ডন করল, এ ক্ষেত্রে তারা তো পুনরায় মাথা মাসাহ করতে অথবা পুনরায় ওযূ করতে বলেন না! এ মাসআলটির ক্ষেত্রে এ যুক্তিটি খুবই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং যদি মোজা খোলার পর অপবিত্র না হয় তাহলে ওযূ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যত ইচ্ছা সালাত আদায় করা যাবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

দ্বিতীয়তঃ জাওরাব ও জুতার উপর মাসাহ প্রসঙ্গে

(ক) জাওরাবের উপর মাসাহঃ

جورب **(জাওরাব)ঃ** পশমী সুতা, শণের তৈরি এক ধরনের মোজা বিশেষ যা মানুষ তাদের দু'পায়ে পরিধান করে। এ সংজ্ঞাটিকে মদ্য পানীয় এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। {শারাব বা পানীয় যেমন বিভিন্ন বস্তু থেকে তৈরি করা হয়, জাওরাবও তেমনি বিভিন্ন উপাদান হতে তৈরি হতে পারে *(অনুবাদক)*}।

জাওরাবের উপর মাসাহ এর হুকুম নিয়ে উলামাদের মাঝে তিন ধরনের বক্তব্য রয়েছে।

প্রথমঃ জাওরাবের উপর মাসাহ বৈধ নয়, তবে তার উপর চামড়ার জুতা থাকলে বৈধঃ এটা আবূ হানীফা (অবশ্য তিনি পরবর্তীতে এ মত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন), মালিক ও শাফেঈর মাযহাব।[৪৪৯] তারা বলেনঃ যেহেতু জাওরার কে جورب বা মোজা নামে নামকরণ করা যায় না, সেহেতু তাতে মোজার হুকুম চলবে না। আর জাওরাবের উপর মাসাহ প্রসঙ্গে কোন হাদীসও বর্ণিত হয় নি (!!)।

দ্বিতীয়ঃ পুরু ও ওযূতে পায়ের যে অংশ ধৌত করা ফরয সে অংশ আচ্ছাদনকারী হলে জাওরাবের উপর মাসাহ বৈধঃ এটা হাসান, ইবনুল মুসাইয়্যিব, আহমাদ, ও হানাফী, শাফেঈ, হাম্বালী প্রমুখ বিদ্বানগণের অভিমত।[৪৫০]

---

[৪৪৮] এ হাদীসের সনদ সহীহ; বাইহাক্বী (১/২৮৮), ত্বাহাবী (১/৫৮), তামামুল মিন্না (পৃ.১১৫)।

[৪৪৯] আল-মাসবূত্ব (১/১০২), আল- মুদাও ওয়ানাহ (১/৪০), আল-উম্ম (১/৩৩), আল-আওসাত্ব (১/৪৬৫)।

[৪৫০] মাসায়িলু আহমাদ (১/২১) ইবনু হানী প্রণীত, আল আওসাত্ব (১/৪৬৪), 'আল-মাজমূ' (১/৫৪০), ফাতহুল ক্বাদীর (১/১৫৭)।

www.waytojannah.com

তৃতীয়: সাধারণভাবে সকল ধরনের জাওরাবের উপর মাসাহ বৈধ, এমনকি যদি তা খুব পাতলা হয় তবুও:

এটাই ইবনু হাযম ও ইবনু তাইমিয়ার স্পষ্ট মাযহাব। আর এ মতকেই ইবনু উসাইমীন ও আল্লামা শানক্বীতী পছন্দ করেছেন।[৪৫১] এটাই অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

এখানে জাওরাবের উপর মাসাহ বৈধ মর্মে বর্ণিত শেষ দুটি অভিমতের প্রবক্তাগণ নিম্নোক্ত দলীলগুলোকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। যথা:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ»

(১) মুগীরা বিন শোবা (رضي الله عنه) বর্ণিত হাদীস: 'নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) একবার ওযূ করলেন এবং জাওরাব ও দু জুতার উপর মাসাহ করলেন।[৪৫২]

عَنِ الأزرق بن قيس قال : « رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ، ومسح على جوربين من صوف فقلت : أتمسح عليهما ؟ فقال : إنهما خفان ولكنهما من صوف »

(২) আয়রাক্ব ইবনে কায়েস থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) কে লক্ষ করেছি, তিনি বায়ু নিঃসরণ হলে তার চেহারা ও দু'হাত ধৌত করতেন এবং পশমের তৈরি জাওরাবের উপর মাসাহ করতেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জাওরাবের উপর মাসাহ করলেন? তিনি বললেন, এ দু'টি মোজা যা পশমের তৈরি।[৪৫৩]

এখানে আনাস (رضي الله عنه) খাফ বা মোজা চামড়ার তৈরি হওয়ার ব্যাপারে আম (ব্যাপক) অর্থ গ্রহণ করেছেন, সে কথাই স্পষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তিনি আরবী ভাষাবিদদের অন্যতম একজন সাহাবী ছিলেন।

(৩) জাওরাবের উপর মাসাহ করার হাদীস ১১ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। যাদের মধ্যে উমার ও তার ছেলে আব্দুল্লাহ বিন উমার, আলী, ইবনে মাসউদ, আনাস প্রমুখ সাহাবী অন্যতম। তাদের সমসাময়িক কোন সাহাবী তাদের বিরোধিতা করেন নি। বরং সকলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। পরবর্তীতে অধিকাংশ উলামা পাতলা জাওরাবের উপর মাসাহ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তা দ্বারা ফরযের স্থান আচ্ছাদিত হয় না। অথচ এটা মাসাহ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত নয় যা ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

যেহেতু বর্তমানকালে আনুপাতিক হারে পাতলা জাওরাবের প্রচলন বেশি। সেহেতু এই শর্ত সংকীর্ণতা ও জটিলতা সৃষ্টির কারণে শরীয়াত দাতার প্রশস্ততার ইচ্ছার বিপরীত। (আল্লাহই অধিক অবগত আছেন)।

---

[৪৫১] আল-মুহাল্লা (২/৮৬), আল-মাসায়িলুল মারদিনিয়্যাহ (পৃ.৫৮), মাজমূ' আল-ফাতাওয়া (২১/১৮৪), আল-মুমতি' (১/১৯০), আযওয়াউল বায়ান (২/১৮, ১৯), এখানে এ বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা রয়েছে।

[৪৫২] এ হাদীসকে আলবানী সহীহ বলেছেন, আবূ দাউদ (১৫৯), তিরমিযী (৯৯), আহমাদ (৪/২৫২), এ ব্যাপারে বিস্তারিত 'আল-ইরওয়া (১০১)-দ্রষ্টব্য।

[৪৫৩] এ হাদীসকে আহমাদ শাকির সহীহ বলেছেন; আল-কুনা (১/১৮১) দাওলাবী প্রণীত।

www.waytojannah.com

Contents

উপকারিতা:

জাওরাব এর অর্থের মধ্যে ঐ সকল পট্টি অন্তর্ভুক্ত হবে যা কোন বিশেষ ওজরে দু'পায়ে পরিধান করা হয়। এ বিধানটি মুলতঃ কষ্ট দূর করার জন্য। এ জন্যে তার উপর মাসাহ বৈধ। যেমনটি শাইখুল ইসলাম পছন্দ করেছেন। আর জাওরাবের উপর মাসাহ করার হুকুম খাফ এর উপর মাসাহ করার হুকুমের মতই।

যখন একটা জাওরাবের উপর আরেকটি জাওরাব পরিধান করা হবে, তখন তার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে:

(১) যখন ওযূ করার পর একটি জাওরবের উপর আরেকটি জাওরাব পরিধান করা হবে, এ ক্ষেত্রে ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে উপরের জাওরাবের উপর মাসাহ করলেই চলবে। এটা আবূ হানীফার মাযহাব এবং হাম্বালী ও মালিকীদের কাছে অধিক প্রাধান্যযুক্ত মত। আর শাফেঈদের এটা পুরাতন মত, নতুন মত এর বিপরীত।[৪৫৪]

(২) ওযূ করার পর দু'টি জাওরাব পরিধান করবে অতঃপর উভয়টির উপর মাসাহ করবে। আর যদি মাসাহ করার পর উপরের জাওরাবটি খুলে ফেলে, সে ক্ষেত্রে নিচের জাওরাবের উপর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাসাহ জায়েয। কেননা সে পবিত্র অবস্থায় দু পায়ে জাওরাব পরিধান করেছে।

(৩) ওযূ করার পর একটি জাওরাব পরিধান করবে এবং ওযূ ভঙ্গের পূর্বেই তার উপর আরেকটি জাওরাব পরিধান করবে। তখন দু'টির যে কোন একটির উপর মাসাহ করার ইখতিয়ার (ঐচ্ছিকতা) রয়েছে।[৪৫৫]

(৪) ওযূ করার পর একটি জাওরাব পরিধান করবে এবং তার উপর মাসাহ করার পর আরেকটি জাওরাব পরিধান করবে, সেক্ষেত্রে যদি সে পবিত্র অবস্থায় পরের জাওরাবটি পরিধান করে থাকে তাহলে উপরেরটির উপর মাসাহ বৈধ। কেননা সে পবিত্র অবস্থায় দু'পা প্রবেশ করিয়েছে।[৪৫৬] কিন্তু যদি ওযূ ভঙ্গের পর পরবর্তী জাওরাব পরিধান করে থাকে তাহলে, উপরের জাওরাবের উপর মাসাহ বৈধ হবে না বরং নিচেরটার উপর মাসাহ বৈধ হবে।

(খ) জুতার উপর মাসাহ:

এ মর্মে মুগীরা বিন শু'বার (ﷺ) হাদীস গত হয়ে গেছে যে,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ»

---

[৪৫৪] হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন (১/১৭৯), জাওয়াহিরুল ইকলিল (১/২৪) রওযাতুত ত্বলিবীন (১/১২৭), এখানে তাদের বক্তব্য خف বা চামড়ার মোজার মত। এ ক্ষেত্রে উভয়ের একই হুকুম।

[৪৫৫] হাম্বলীগণ এ বিষয়টিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন, 'কাশশাফুল কান্না' (১/১১৭-১১৮)।

[৪৫৬] এ বিষয়টিকে 'কাশশাফুল কান্না' গ্রন্থে (১/১১৭-১১৮) এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তাতে (উপরটির উপর) মাসাহ করা যাবে না। কেননা নিচের যে মোজাটির উপর মাসাহ করা হয়েছে তা ধৌতের বিকল্প স্বরূপ। আর একটি বিকল্প আরেকটি বিকল্পের জন্য জায়েয নয়। বরং নিচেরটির উপর মাসাহ করতে হবে। কেননা সংশ্লিষ্ট বিষয়টির সাথেই শুধু ছাড় রয়েছে। আমার মতে, এ ব্যাখ্যাটির ব্যাপারে কিছু কথা থেকে যায়। কেননা মাসআলাটির ক্ষেত্রে শুধু একটিই মূলনীতি ধর্তব্য, তা হল, দু'পায়ে পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করা। আর তা তো অর্জিত হয়ে গেছে, যদিও উপরেরটি পরার পূর্বেই নিচেরটির উপর মাসাহ করা হয়। আর এর দ্বারা সালাত বৈধ হবে।

www.waytojannah.com

'নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) একদা ওযূ করলেন এবং জাওরাব ও দু'জুতার উপর মাসাহ করলেন।[৪৫৭]

সঠিকভাবে বিবেচনা করলে এ হাদীসটি নিম্নোক্ত দুটি অবস্থার সম্ভাবনা রাখে। যথা-

১। জাওরাবের উপর জুতা পরিধান করবে এবং তার উপর মাসাহ করবে, তখন উভয়টির হুকুম একই হবে। যেমন একটি জাওরাব আরেকটি জাওরাবের উপর একটি খাফ আরেকটি খাফের উপর পরিধান করার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

২। হয়ত মুগীরা (رضي الله عنه) একবার জাওরাবের উপর আরেকবার জুতার উপর রাসূল (ﷺ) কে মাসাহ করতে দেখেছিলেন। তখন এটা জুতার উপর মাসাহ বৈধ হওয়ার দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হবে যদিও তা জাওরাব বিহীন হয়। কিছু কারণে এ দলীল গ্রহণ করা যদিও দূরবর্তী ব্যাপার, তারপরও এর দ্বারা জায়েয হওয়ার দলীল গ্রহণ করা যায় ইতিপূর্বে উল্লেখিত আবূ যিবয়্যান এর হাদীস দ্বারা,

عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ، ثم دعا بماء ، فتوضأ ومسح على نعليه ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه ، ثم صلى

অর্থাৎ: আবূ যিবয়্যান হতে বর্ণিত, তিনি আলী (رضي الله عنه) কে দেখলেন যে, তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন ও পানি নিয়ে ডাকলেন, অতঃপর তিনি ওযূ করলেন ও দুই জুতার উপর মাসাহ করলেন, এরপর মাসজিদে প্রবেশ করে জুতা খুলে সালাত আদায় করলেন।[৪৫৮] এ হাদীসের মধ্যে জাওরাবের কথা উল্লেখ নেই।
অনুরূপভাবে জুতার উপর মাসাহ করার সমর্থনে আরও বলা যেতে পারে যে, বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মাসাহকৃত বস্তু দ্বারা ফরযের স্থানটি আবৃত করা শর্ত নয়।

তৃতীয়: মাথার আচ্ছাদন বা আবরণীর উপর মাসাহ

১। ওযূর সময় পাগড়ীর উপর মাসাহ:

সাধারণভাবে ওযূতে মাথার পরিবর্তে পাগড়ীর উপর মাসাহ বৈধ। এটা আহমাদ, ইসহাক্ব, আবূ সাওর, আওযায়ী, ইবনু হাযম, ইবনে তাইমিয়াহ এবং সাহাবীদের মধ্য হতে আবূ বকর, উমার, আনাস প্রমুখ এর অভিমত।[৪৫৯] এটা রাসূল (ﷺ) থেকে সাব্যস্ত।
যেমন আমর ইবনে উমাইয়া আয-যামেরী বলেন, «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ» "আমি রাসূল (ﷺ) কে চামড়ার মোজা ও পাগড়ীর উপর মাসাহ করতে দেখেছি"।[৪৬০]

---

[৪৫৭] কিছু পূর্বে হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে।
[৪৫৮] কিছু পূর্বে হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে।
[৪৫৯] মাসায়িলু আবী দাউদ (৮), আল-মুগনী (১/৩০০), আল-মাজমু' (১/৪০৬), আল-আওসাত্ব (১/৪৬৮), আল-মুহাল্লা (২/৫৮), মাজমূ'আল ফাতাওয়া (২১/১৮৪)।
[৪৬০] সহীহ; বুখারী (২০৫)।

Contents

অনুরূপ মুগীরা বিন শু'বা থেকেও বর্ণিত হয়েছে।[৪৬১] বিলাল (ﷺ) বলেন:

عَنْ بِلَالٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ»

"রাসূল (ﷺ) চামড়ার মোজা ও (মাথার) আবরণীর উপর মাসাহ করতেন"।[৪৬২] এখানে الْخِمَار হলো, মাথার আচ্ছাদন যা দ্বারা পাগড়ী উদ্দেশ্য।

অপর দিকে আবূ হানীফা ও তার মতাবলম্বী বিদ্বানগণ, মালিক ও শাফেঈ (রাহি.) এর মতে,[৪৬৩] শুধু পাগড়ীর উপর মাসাহ বৈধ নয়। বরং নাসিয়াহ তথা মাথার অগ্রভাগসহ মাসাহ বৈধ। এ ক্ষেত্রে মাথার অগ্রভাগ মাসাহ ফরয এবং পাগড়ীর উপর মাসাহ অতিরিক্ত। যেহেতু তারা মাথার কিছু অংশ মাসাহ করা বৈধ মনে করেন!! কিন্তু ইমাম শাফেঈ বলেন, "যদি পাগড়ীর উপর মাসাহ করার হাদীসটি সহীহ হয় তাহলে আমার মতে, শুধু পাগড়ীর উপর মাসাহ করা বৈধ"। যেহেতু পাগড়ীর উপর মাসাহ করার হাদীসটি সহীহ, সুতরাং শুধু পাগড়ীর উপর মাসাহ করা বৈধ হওয়াটা তারই অভিমত।

যারা পাগড়ীর উপর মাসাহ করার বিরোধী তারা যাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করে থাকেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে মাথা থেকে পাগড়ী খুলে নাসিয়াহ বা মাথার অগ্রভাগ পরিমাণ মাসাহ করতে দেখেছি"।[৪৬৪] আমি (লেখক) এ হাদীসটির সনদ কোন হাদীস গ্রন্থে খুঁজে পাইনি"!!

মুগিরাহ বিন শু'বা থেকে বর্ণিত-أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ:تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ রাসূল (ﷺ) একদা ওযূ করলেন, অতঃপর মোজার উপর, মাথার অগ্রভাগে এবং পাগড়ির উপর মাসাহ করলেন।[৪৬৫]

আমার বক্তব্য: অধিক যুক্তিযুক্ত মত হলো, নাবী কারীম (ﷺ) এবং তারপর দু'জন বিশিষ্ট খলীফা থেকে স্পষ্ট হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণে সাধারণভাবে পাগড়ীর উপর মাসাহ বৈধ। আর এর বিরোধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন দলীল বিদ্যমান নেই।[৪৬৬] অবশ্য দ্বন্ধ নিরসনের ক্ষেত্রে বলা যায়, মাথার অগ্রভাগসহ পাগড়ীর উপর মাসাহ উত্তম। আল্লাহই অধিক অবগত আছেন।

২। মহিলাদের ঘোমটার উপর মাসাহ:

শাইখুল ইসলাম বলেন: মহিলারা যদি ঠাণ্ডা বা অনুরূপ কিছুর ভয় করে তাহলে ঘোমটার উপর মাসাহ করবে। কেননা উম্মে সালমা (রা.) তার ঘোমটার উপর মাসাহ করতেন। তবে মাথার কিছু চুলসহ মাসাহ করতে হবে। আর যদি এরূপ প্রয়োজন না দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে মাসাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে উলামাদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান।[৪৬৭]

---

[৪৬১] সহীহ; মুসলিম (২৭৫)।

[৪৬২] সহীহ; মুসলিম (২৮৫)।

[৪৬৩] ইবনু আবেদীন এর হাশিয়া (১/১৮১), আল্লামা দাসূকীর হাশিয়া (১/১৬৪), আল-মাজমূ' (১/৪০৭)।

[৪৬৪] আমার নিকট যত হাদীস গ্রন্থ তার কোনটিতেও এর কোন সূত্র পাই নি; তবে ইবনে মুনযির (১/৪৬৯) সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন।

[৪৬৫] সহীহ এ হাদীস ওযূর অধ্যায়ে চলে গেছে।

[৪৬৬] আল-মুহাল্লা (২/৬১)-গ্রন্থে তাদের দলীল এবং এর প্রত্যাখ্যান দেখুন!

[৪৬৭] মাজমূ' আল-ফাতাওয়া (২১/২১৮)।

www.waytojannah.com

আমার বক্তব্যঃ একটা বর্ণনানুযায়ী আবূ হানীফা, মালিক, শাফেঈ ও হাম্বালী মতাবালম্বীদের মতে,[৪৬৮] ঘোমটার উপর মাসাহ বৈধ নয়। যেমনটি আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে, তিনি ঘোমটার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে তাতে মাসাহ করতেন এবং তিনি বলতেন, এভাবেই রাসূল ﷺ আমাকে আদেশ করেছেন"।[৪৬৯]

তারা বলেনঃ যেহেতু ঘোমটা মহিলাদের মাথার একটি পরিধেয় বস্ত্র এবং তা সরিয়ে মাথা মাসাহ করা কঠিন নয়। সুতরাং তার উপর মাসাহ বৈধ হবে না।

অপর পক্ষে হাসান বসরী ঘোমটার উপর মাসাহ বৈধ মনে করেন। এটা হাম্বালী মাযহাবের অভিমত। তবে তারা শর্তারোপ করেন যে, মহিলাদের ঘোমটাটা গলা পর্যন্ত হতে হবে (!!) পাগড়ীর উপর কিয়াস করে, যেহেতু ঘোমটা নিত্য অভ্যাসগত পরিধেয় পোষাক।

আমার বক্তব্যঃ যদি আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ হতো, তাহলে ঘোমটার উপর মাসাহ নাজায়েয হওয়ার জন্যে এটাই যথেষ্ট হতো। আর পাগড়ীর উপর কিয়াস করাটা অগ্রহণযোগ্য। তবে সতর্কতা মূলক খিমারসহ মাথার অগ্রভাগ মাসাহ করা ভাল। আল্লাহই ভাল জানেন।

৩। ওযূতে টুপির উপর মাসাহঃ

অধিকাংশ আলিমের মতেঃ ওযূতে মাথার পরিবর্তে টুপির উপর মাসাহ বৈধ নয়। কেননা মাথা মাসাহ ফরয। মূলতঃ অধিকাংশের নিকট পাগড়ীর উপর মাসাহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে, তা খোলা কষ্টকর হওয়ার কারণে। আর আহমাদের নিকট দলীলের ভিত্তিতে এ হুকুম দেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে ইবনু হাযম, ইবনু তাইমিয়া[৪৭০] ও মুহাক্কিক একদল বিদ্বানের মতে, টুপির উপর মাসাহ জায়েয। যেহেতু রাসূল (ﷺ) পাগড়ী বা অনুরূপ পোষাক বিশেষের উপর মাসাহ করেছেন। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে,, সরাসরি মাথায় পানি স্পর্শ করানো ফরয নয়। যে কোন বস্তু বিশেষ মাথায় পরিধান করা হলে তার উপর মাসাহ বৈধ। যদিও তা ফরযের স্থানকে আচ্ছাদনকারী নাও হয় এবং তা খোলে ফেলাও কষ্টকর না হয়। আর এটাই অধিক বিশুদ্ধ মত। (আল্লাহই অধিক অবগত আছেন)।

উপকারিতাঃ মাসাহ জায়েয হওয়ার জন্য মাথার আচ্ছাদন পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা শর্ত নয়। এ ক্ষেত্রে মোজার উপর কিয়াস করা যাবে না। যেহেতু এ দু'টির মাঝে একত্রিত হওয়ার কোন কারণ নেই। রাসুল (ﷺ) মোজা পরিধানের ব্যাপারে পবিত্রতাকে শর্ত করেছেন। যা পাগড়ী পরিধানের ব্যাপারে করেন নি। যদি তা আবশ্যক হতো অবশ্যই বর্ণনা করতেন।[৪৭১]

আমার বক্তব্যঃ এখানে মোজা পরিধানের স্থানটি ধৌত করা ফরয আর মাথাতে ফরয হলো মাসাহ করা। মাথার ব্যাপারে এমন কোন বিষয় নেই যার দ্বারা এর উপর মোজার হুকুমের ন্যায় হুকুম আরোপ করা যায়। বরং এটা আলাদা বিষয়। আল্লাহই অধিক অবগত আছেন।

---

[৪৬৮] আল- মুদাওা ওয়ানাহ (১/৪২), আল-উম্ম (১/২৬), আল-বাদাঈ (১/৫), আল-মুগনী (১/৩০৫)।

[৪৬৯] আমি এ সম্পর্কে অবগত হতে পারি নি; এ হাদীসটি আল্লামা কাসানী তাঁর আল-বাদাঈ (১/৫) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অথচ হাদীসের কোন কিতাবেই এ হাদীসটি আমি অবগত হতে পারি নি (!!)।

[৪৭০] আল-মুহাল্লা (২/৫৮), মাজমূ' আল ফাতাওয়া (২১/১৮৪-১৮৭, ২১৪)।

[৪৭১] আল-মুহাল্লা (২/৬৪)।

Contents

মাথার আবরণের উপর মাসাহ করার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা বা সীমারেখা নেই:

কারণ মোজার উপর মাসাহ এর কিয়াস বিশুদ্ধ নয়। অথচ রাসূল (ﷺ) পাগড়ীর উপর মাসাহ করেছেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোন সময়সীমা বেঁধে দেন নি। এটা উমার বিন খাত্তাব থেকে বর্ণিত হয়েছে।[৪৭২]

৪। ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ:

جبيرة (জাবীরাহ) হলো, কাষ্টফলক দ্বারা ভাঙ্গা হাড়কে জোড়া লাগানোর জন্য ব্যান্ডেজ করা এবং সুস্থ্য হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় ব্যান্ডেজ রাখা।

অধিকাংশ আলিম, চার ইমামসহ অনেকের মতে, ওযূর অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গর মধ্যে হাতের কব্জি, পা প্রভৃতিতে যে কাঠের ফলক ব্যবহার করা হয়, এর উপর মাসাহ করা জায়েয।[৪৭৩]

তাদের দলীলগুলো নিম্নরূপ:

(১) জনৈক ব্যক্তির শরীরে আঘাত লাগা মর্মে বর্ণিত জাবিরের হাদীস। তার ব্যাপারে রাসূলের উক্তি:

« إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا»

অর্থাৎ: "তার জন্যে যখমের উপর ব্যান্ডেজ ব্যবহার করাই যথেষ্ট হতো এবং সে তার উপর মাসাহ করলেই চলতো"।[৪৭৪] এ হাদীসটি যঈফ।

(২) ইবনু উমারের উক্তি: من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب "যে ব্যক্তির ব্যান্ডেজযুক্ত যখম থাকবে, সে ওযূর সময়ে যখমের উপর শুধু মাসাহ করবে এবং ব্যান্ডেজের আশেপাশের জায়গা ধৌত করবে"।[৪৭৫] এ ক্ষেত্রে সাহাবাদের কেউ ইবনে উমারের বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায় না।

(৩) মোজার মাসাহ এর উপর কিয়াস বা অনুমান করেও এর দলীল দেয়া যায়। যেহেতু কোন প্রয়োজন ছাড়াই মোজার উপর মাসাহ জায়েয, অতএব প্রয়োজনের তাগিদে কাষ্ট ফলকের উপর মাসাহ জায়েয হওয়া আরও অধিক যুক্তিযুক্ত।

তবে হাযমের মতে, কাষ্ট ফলকের উপর মাসাহ করার কোন প্রয়োজন নেই। বরং এ স্থানের হুকুম অতীত হয়ে গেছে।[৪৭৬]

আমার বক্তব্য: যেহেতু ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে যঈফ আখ্যা দেয়া হয়েছে, সেহেতু কিয়াসকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানোর কোন সুযোগ নেই (!!) এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যখন তার রুকন ও শর্তগুলো ঠিক থাকবে তখন কিয়াসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মূল থেকে শাখার হুকুমটি ভিন্ন হওয়ার কারণে কিয়াস বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।

---

[৪৭২] আল-মুহাল্লা (২/৬৫)।
[৪৭৩] শারহু ফাতহুল ক্বাদীর (১/১৪০), আল মুদাওা ওয়ানাহ (১/২৩), আল-মুগনী (১/২০৩), আল-মাজমূ' (২/৩২৭)।
[৪৭৪] যঈফ; আবূ দাউদ (২৩৬), প্রভৃতি। ইরওয়াউল গালীল (১০৫)।
[৪৭৫] এ হাদীসের সনদ সহীহ; ইবনু আবী শাইবাহ (১/১২৬), বায়হাকী (১/২২৮)।
[৪৭৬] আল-মুহাল্লা (২/৭৪)।

www.waytojannah.com

এটা (অধিকাংশের নিকট কাষ্ট ফলকের উপর মাসাহ করা) ওয়াজিবকে (মোজার উপর মাসাহ করা) বৈধ এর উপর কিয়াস করা হচ্ছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ইবনু হাযমের মতটিই প্রাধান্য পাবে।।

উপকারিতাঃ

১। জাবীরা বা ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ করা ওযূ ও গোসল উভয় অবস্থায় বৈধঃ

কেননা ব্যান্ডেজ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। ছোট বা বড় নাপাকী কোন অবস্থায় খোলার প্রয়োজন নেই। যা মোজা মাসাহ এর হুকুম থেকে আলাদা। এটা এক ধরনের ছাড়।

২। ব্যান্ডেজের ক্ষেত্রে পবিত্র অবস্থা ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যবহারের কোন শর্ত আরোপ করা যাবে নাঃ

পবিত্রতাবস্থায় ব্যান্ডেজ পরিধান করতে হবে এমন কোন শর্ত আরোপ করা যাবে না। কেননা শরীয়াত প্রণেতা মাসাহ বৈধ করার মাধ্যমে ক্ষতি ও কষ্ট লাঘবের যে উদ্দেশ্য করেছেন এটা তার বিপরীত। এছাড়া ব্যান্ডেজের বিষয়টি বাধ্যতামূলক যা আকস্মিক চাপিয়ে দেয়া হয়, যা মোজার বিপরীত। উপরন্তু কুরআন-হাদীস ও ইজমা থেকে এর কোন দলীলও নেই। অনুরূপভাবে ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ এর কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। বরং যখন তা খুলে ফেলা হবে অথবা আক্রান্ত অংশ আরোগ্য পাবে তখন মাসাহ বৈধ হবে না।

৩।ওযূর অঙ্গে যদি চিকিৎসার দরূণ কোন ব্যান্ডেজ করা হয়, তাহলে তার হুকুম জাবীরার হুকুমের ন্যায়। যেমনটি শাইখুল ইসলাম বলেছেন।[৪৭৭]

গোসল (الغُسْل)

গোসলের পরিচয়ঃ

গোসল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ধৌতকার্য সম্পন্ন করা। আভিধানিক অর্থে গোসল হলো, কোন বস্তুর উপর পানি প্রবাহিত করা।

আর পরিভাষায়ঃ নির্দিষ্ট কোন কারণে সমস্ত শরীরে পবিত্র পানি প্রবাহিত করাকে গোসল বলা হয়।[৪৭৮]

যে সব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়ঃ

এমন কতিপয় কারণ রয়েছে, যার ফলে শারঈ নির্দেশের জন্য গোসল করা ওয়াজিব হয়। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১। সুস্থ অবস্থায় ঘুমন্ত বা জাগ্রত থাকা কালীন সময়ে বীর্য নির্গত হলে গোসল ওয়াজিব হয়ঃ

আল্লাহ বলেন :

﴿وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾

অর্থাৎঃ যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও। *(সূরা মায়িদা-৬)*।

---

[৪৭৭] মাজমূ' আল-ফাতাওয়া (২১/১৮৫)।

[৪৭৮] কাশশাফুল কান্না (১/১৮৫)।

Contents

আল্লাহ আরও বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾

অর্থাৎ : হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী (মুসাফির) হও। *(সূরা নিসা-৪৩)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

অর্থাৎ: আবূ সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করে বলেন: পানি পানিকে আবশ্যক করে।[৪৭৯]

এ হাদীসের অর্থ হলো- পানি তথা বীর্য স্খলনের কারণে পবিত্র পানি দ্বারা গোসল করতে হবে।

মহানাবী (ﷺ) আলীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

«فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ»

অর্থাৎ: উত্তেজনা বশতঃ বীর্য নির্গত হলে গোসল কর।[৪৮০] অন্য বর্ণনায়, إِذَا فَضَخْتَ এর পরিবর্তে إذا حذفت এসেছে। উত্তেজনা সহকারে বীর্য নির্গত হলেই শুধু এ বিধান কার্যকর হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

﴿خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾

অর্থাৎ : তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি হতে *(সূরা তারিক-৬)*।

উম্মে সালমা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আবূ তালহার স্ত্রী উম্মে সুলাইম রাসূল (ﷺ) এর কাছে এসে বললেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ

অর্থাৎ: ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আল্লাহ তা'আলা হক্বের ব্যাপারে লজ্জা করেন না । স্ত্রীলোকের ইহতিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে কি গোসল ফরয হবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: হ্যাঁ, যদি তারা বীর্য দেখে।[৪৮১]

এ হাদীস প্রমাণ করছে যে, স্বপ্নদোষের কারণে গোসল করার জন্য উত্তেজনাসহ ও প্রচণ্ড বেগে বীর্যপাত হওয়া শর্ত নয়। বরং তার কাপড়ে বীর্য দেখলেই গোসল ওয়াজিব হবে। আর বীর্য না দেখলে গোসল ওয়াজিব হবে না যদিও তার স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ থাকে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا. قَالَ: «يَغْتَسِلُ» ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ. قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ»

অর্থাৎ: আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, সে স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ করতে পারছে না- অথচ তার কাপড় (বীর্যপাতের কারণে) ভেজা মনে হয়। জবাবে তিনি বলেন, তাকে গোসল করতে হবে। অতঃপর তাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা

---

[৪৭৯] সহীহ; মুসলিম (৩৪৩), আবূ দাউদ (২১৪)।

[৪৮০] সহীহ; আবূ দাউদ (২০৬), নাসাঈ (১৯৩), আহমাদ (১/২৪৭), এ হাদীসের মূল সহীহাইনে বিদ্যমান।

[৪৮১] সহীহ; বুখারী (২৮২), মুসলিম (৩১৩)।

www.waytojannah.com

হয় যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু সে তার কাপড়ে কোন চিহ্ন দেখতে পায় না। জবাবে তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির গোসল করার প্রয়োজন নেই।[৪৮২]

দুটি সতর্কবাণী:

(ক) উল্লেখিত বিধানগুলোর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান।

(খ) কোন কামোত্তজনা ছাড়া রোগ বা ঠাণ্ডাজনিত কারণে বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব হয় না। এটিই বিদ্বানদের বিশুদ্ধ মতামত এবং অধিকাংশের মাযহাব। তবে ইমাম শাফেঈ ও ইবনে হাযম এর বিপরীত মত পেশ করেছেন।

আর বিদ্বানগণের সর্বসম্মতিক্রমে,[৪৮৩] জাগ্রত অবস্থায় উত্তেজনাসহ বীর্য নির্গত হলে এবং স্বপ্নদোষের ফলে বীর্য নির্গত হলে গোসল করা ওয়াজিব। তবে ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মহিলাদের স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে গোসল করা ওয়াজিব মনে করতেন না। ইমাম শাওকানী (রাহি.) বলেন, "এ বর্ণনাটি তার পক্ষ থেকে হওয়াটাকে আমি বিশুদ্ধ মনে করি না। যদি এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হয় তাহলে তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মুসলমানের ইজমার বিপরীত মত পেশ করেছেন।

২। দুই যৌনাঙ্গের মিলন হলে, যদিও বীর্যপাত না হয়:

পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যোনিতে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গেলে উভয়ের উপর গোসল ওয়াজিব হবে, তাদের বীর্যপাত হোক বা না হোক।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ» وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

অর্থাৎ: আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন, কেউ যদি স্ত্রীর চার অঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে বসে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর গোসল ফরয হয়ে যায়। যদি বীর্যপাত নাও হয়ে থাকে তবুও গোসল ফরয হবে।[৪৮৪]

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ، أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ»

অর্থাৎ: নাবী (ﷺ) এর স্ত্রী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলো, কেউ যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে বীর্যপাত না ঘটায় তাহলে এ অবস্থায়ও কি তাদেরকে গোসল করতে হবে? (লোকটি যখন এই প্রশ্ন করছিলো) আয়িশা তখন নাবী (ﷺ) এর কাছে বসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আয়িশার দিকে ইংগিত করে দেখিয়ে বললেন, আমি এবং এই স্ত্রীলোকটি এরূপ করে থাকি এবং পরে গোসল করি।[৪৮৫]

---

[৪৮২] সহীহ; তিরমিযী (১১৩), আবূ দাউদ (২৩৩)।

[৪৮৩] আল-মাজমূ' (১/১৩৯), বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/৫৮), আস-সায়লুল জার্‌রার (১/১০৪)।

[৪৮৪] সহীহ; বুখারী (২৯১), মুসলিম (৩৪৮) তবে মুসলিমে কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে।

[৪৮৫] সহীহ; মুসলিম (৩৪৯)।

Contents

ইমাম নাববী বলেন উল্লেখিত বিধানটির ব্যাপারে বর্তমানে কোন মতভেদ নেই। যদিও কতিপয় সাহাবা ও তাদের পরবর্তী বিদ্বানগণ এ ক্ষেত্রে মতভেদ করেছিলেন। বর্তমানে বিধানটির ব্যাপারে ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে।

আমার বক্তব্য: এ মাসআলাটির ক্ষেত্রে সাহাবীদের মাঝে যে হাদীসগুলির কারণে মতানৈক্য রয়েছে তার মধ্যে যায়িদ ইবনে খালিদ এর হাদীসটি উল্লেখযোগ্য-

أَنَّهُ، سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ: عُثْمَانُ: «يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ» قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.

অর্থাৎ: তিনি 'উসমান ইবন আফফান (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেন: স্বামী-স্ত্রী সংগত হলে যদি মনি বের না হয় (তখন কি করবে)? উসমান (রা.) বললেন: সালাতের উযূর মত ওযূ করবে এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। উসমান (ﷺ) বলেন: আমি এটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শুনেছি। এরপর আলী ইবন আবূ তালিব, যুবায়র ইবনুল আওয়াম, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ ও উবাই ইবন কা'ব (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাঁরা সবাই ঐ একই জবাব দিয়েছেন।[৪৮৬]

ইমাম দাউদ যুহরী (রাহি.) এমতাবস্থায় বীর্যপাত না হলে গোসল ওয়াজিব হবে না বলে মতামত দিয়েছেন। কেননা বলা হয়েছে:

«إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» অর্থাৎ: "পানি পানিকে আবশ্যক করে"।[৪৮৭]

আবূ সাঈদের (ﷺ) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানাবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে বললেন:

«إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الوُضُوءُ»

অর্থাৎ: যখন তাড়াতাড়ির কারণে মনি বের না হয় অথবা বললেন: মনির অভাব জনিত কারণে তা বের না হয়, তবে তোমার উপর কেবল ওযূ করা জরুরী।[৪৮৮]

অতঃপর যে সকল সাহাবী গোসল ওয়াজিব হবে না বলে মতামত দিয়েছিলেন, তারা তাদের উক্ত মতামত **থেকে ফিরে এসেছেন।**[৪৮৯] আর অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈদের মধ্যে ফক্বীহগণ ও তার পরবর্তীগণ ইমাম দাউদ (রাহি.) এর মতামতের বিরোধিতা করেছেন । তারা মনে করেন «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» হাদীসটি এবং এ জাতীয় হাদীসগুলোর বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে কার্যকর ছিল। পরে তা মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। ইমাম তিরমিযী (রাহি.) (১/১৮৫) বলেন, এ মানসূখ হওয়ার কথা মহানাবী (ﷺ) এর

---

[৪৮৬] সহীহ; বুখারী (২৯২), মুসলিম (৩৪৭)।

[৪৮৭] মুসলিম (৩৪৩) এ হাদীসটি পূর্বেও চলে গেছে।

[৪৮৮] সহীহ; বুখারী (১৮০), মুসলিম (৩৪৫)।

[৪৮৯] তাদের পক্ষ থেকে বর্ণিত আসার, দেখুন! আমাদের শাইখ প্রণীত (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) 'জামি' আহকামিন নিসা' (১/৮৯, ৯০)।

www.waytojannah.com

একাধিক সাহাবীর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে উবাই ইবনে কাব[৪৯০] ও রা'ফে বিন খদিজ অন্যতম। আর এর উপরই অধিকাংশ বিদ্বান আমল করে থাকেন। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যখন কোন পুরুষ স্ত্রীর যোনিতে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করিয়ে সহবাস করে তখন তাদের উভয়ের উপর গোসল ওয়াজিব হবে; যদিও বীর্যপাত না হয়।

কিছু উপকারী কথা: [৪৯১]

(১) যদি পুরুষাঙ্গ স্ত্রীর যোনিতে প্রবেশ ছাড়াই শুধু স্পর্শ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের উপর গোসল ওয়াজিব হবে না।[৪৯২]

عن إبراهيم في الرجل يجامع امرأته في غير الفرج فيزل الماء قال يغتسل هو ولا تغتسل هي ولكن تغسل ما أصاب منها

অর্থাৎ: ইব্রাহীম আন নাখঈ থেকে বর্ণিত, একদা তাকে প্রশ্ন করা হলো, যদি কেউ তার স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্য স্থানে সঙ্গম করার ফলে বীর্যপাত ঘটায়, তাহলে এর বিধান কি? তিনি বললেন, স্বামী গোসল করবে এবং স্ত্রী গোসল করবে না। তবে স্ত্রী তার যে অঙ্গে বীর্য লেগেছে তা ধুয়ে ফেলবে।[৪৯৩]

(২) যদি স্বামী স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ সম্পূর্ণ প্রবেশ না করিয়ে কিছু অংশ প্রবেশ করিয়ে স্ত্রীর যোনিতে বীর্যপাত ঘটায়, আর স্ত্রীর বীর্যপাত হয় না তাহলে স্ত্রীর উপর গোসল আবশ্যক হবে না।

ইমাম নাববী বলেন: যদি স্ত্রীর যোনিতে অথবা গুহ্যদ্বারে বীর্য প্রবেশ করে, অতঃপর সেখান থেকে তা বের হয়ে যায়, তবে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না। এটাই অধিকাংশের বিশুদ্ধ মতামত।[৪৯৪]

(৩) স্বামী-স্ত্রী মিলন করে স্ত্রী গোসল করার পর যদি তার যোনি থেকে স্বামীর বীর্য বের হতে দেখে, তাহলে তার উপর পুনরায় গোসল ওয়াজিব নয়। তবে এ ক্ষেত্রে কি তার উপর ওযূ আবশ্যক হবে? অধিকাংশের মতে তার উপর ওযূ আবশ্যক হবে,[৪৯৫] কেননা তা দু'রাস্তার একটি দিয়ে নির্গত হয়েছে, যদিও তা পবিত্র হয়।

ইবনে হাযম বলেন[৪৯৬], নিজের পক্ষ থেকে অপবিত্র বস্তু নির্গত হলে ওযূ ওয়াজিব হবে। অন্যের অপবিত্র বস্তু নির্গত হলে নয়। তার যোনি থেকে পুরুষের বীর্য নির্গত হওয়াটা তার পক্ষ থেকে নয় এবং এটা তার পক্ষ থেকে নির্গত কোন অপবিত্র বস্তু নয়। সুতরাং তার উপর ওযূ ও গোসল কোনটিই ওয়াজিব নয়।

---

[৪৯০] উবাই বর্ণিত হাদীসটির কয়েকটি সূত্র থাকার কারণে সহীহ যেমনটি আমাদের শাইখ আবু উমায়ের আল-আসারী উল্লেখ করেছেন তার 'শিফাউল আইয়ে বি তাহক্বীকে মুসনাদিস শাফেঈ' (১০০) গ্রন্থে।

[৪৯১] আমার লিখা বই 'ফিকহুস সুন্নাহ লিন নিসা' (পৃ.৪৬) থেকে গৃহিত।

[৪৯২] ইবনু কুদামাহ প্রণীত 'আল-মুগনী' (১/২০৪)।

[৪৯৩] এ হাদীসের সনদ সহীহ; মুসনাদে আবদুর রাযযাক (৯৭১) কতিপয় সালফে সালেহীন থেকে অনুরূপ আসার বর্ণিত হয়েছে, 'জামি' আহকামুন নিসা' (১/৯৫)।

[৪৯৪] আল-মাজমূ (২/১৫১), আল-মুহাল্লা (২/৭)।

[৪৯৫] আল-মাজমূ' (২/১৫১)।

[৪৯৬] আল মুহাল্লা (২/৬)।

www.waytojannah.com

Contents

আমার বক্তব্য: দুই রাস্তা দিয়ে কোন কিছু নির্গত হলেই ওযূ করতে হবে বলে যে কায়দাটি রয়েছে তা সঠিক নয়, যেমনটি উল্লেখ করা হলো। কেননা স্ত্রীর যোনি থেকে বীর্য প্রবাহিত হওয়াটা পেশাব প্রবাহিত হওয়ার মত নয়। অতএব বলা যায়, এ ক্ষেত্রে ইবনে হাযম (রাহি.) এর মতামতটিই যুক্তিযুক্ত। তবে এ মনি (বীর্য) স্ত্রীর মযি (তরল পদার্থ) এর সাথে মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সতর্কতামূলক ওযূ করা ভাল। এ ব্যাপারে আল্লাহই সাবাধিক জ্ঞাত।

(৪) কেউ যদি হায়য হয় নি এমন মহিলার সাথে সহবাস করে অথবা মহিলার সাথে সহবাসকৃত পুরুষ এত ছোট যে, সে বালেগে উপনিত হয় নি, তাহলে সহবাসের ফলে উভয় ক্ষেত্রে উভয়ের উপর গোসল আবশ্যক হবে। যেমনটি ইমাম আহমাদ বলেন- আয়িশা (রা.) কে দেখা যেত, যখন রাসূল (ﷺ) তাঁর সাথে সহবাস করতেন, তখন তিনি গোসল করতেন না?!![৪৯৭]

(৫) যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাসের জন্য ডাকে, তবে গোসল করার পানি না থাকার অজুহাতে তাকে সহবাসে বাধা দিবে না। শাইখুল ইসলাম "ফাতওয়া" গ্রন্থে (১২/৪৫৪ পৃ.) বলেন, "স্ত্রী স্বামীকে সহবাসে বাধা দিবে না। বরং সহবাস করবে, এরপর যদি সে গোসল করতে সক্ষম হয় তাহলে গোসল করবে, নচেৎ তায়াম্মুম করবে এবং সালাত আদায় করবে"।

৩। হায়য ও
৪। নিফাস:

এ দু'টি এমন কারণ যার ফলে গোসল ওয়াজিব হয়। তবে হায়য ও নিফাস বন্ধের পরও শুধু গোসল ওয়াজিব হয়। আয়িশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ফাতিমা বিনতে হুবাইশকে বললেন:

«فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»

অর্থাৎ: তোমার যখন হায়য আসবে তখন সালাত ছেড়ে দিও। আর যখন তা বন্ধ হয়ে যাবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর সালাত আদায় করবে।[৪৯৮]

সকল আলিমের ঐক্যমতে নিফাস হায়যের মতই। নিফাসকে হায়যের অর্থে এবং হায়যকে নিফাসের অর্থে তা'বীর (প্রয়োগ) করার বিধান রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে সাব্যস্ত আছে।

হায়য ও নিফাস সংক্রান্ত বিধানাবলী যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ইনশা-আল্লাহ।

৫। কোন কাফির যখন ইসলাম গ্রহণ করে:

কাফির ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার গোসলের বিধানের ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়:

প্রথম অভিমত:

সাধারণভাবে কাফির ব্যক্তি মুসলমান হলে গোসল করা ওয়াজিব। এটা ইমাম মালিক, আহমাদ, আবূ সাওর ও ইবনে হিব্বানের অভিমত। ইবনে মুনযির ও ইমাম খত্তাবী এমতটিকে পছন্দ করেছেন।[৪৯৯]

---

[৪৯৭] আল-মুগনী (১/২০৬)।

[৪৯৮] সহীহ; এ হাদীসের তাখরিজ সামনে 'হায়য' এর আলোচনায় আসবে।

[৪৯৯] মাওয়াহিবুল জালীল (১/৩১১), আল-মুগনী (১/১৫২), আল-মাজমূ (২/১৭৫), আল মুহাল্লা (২/৪)।

www.waytojannah.com

তাদের দলীল নিম্নরূপ:

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»

(১) কায়িস বিন আসিম এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য রাসূল (ﷺ) এর কাছে এসেছিলাম তখন তিনি আমাকে কুলের পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৫০০] মূলতঃ হাদীসে নির্দেশটা ওয়াজিব অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

(২) সামামাহ বিন আসসাল এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) এর হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল (ﷺ) বললেন: اذهبوا به إلى حائط بنى فلان فمروه أن يغتسل -অর্থাৎ: তোমরা তাকে অমুক গোত্রের দেয়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে গোসল করার নির্দেশ দাও।[৫০১]

(৩) উসাঈদ বিন হুজাইর এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা, সেখানে বলা হয়েছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের সময় মা'সাব বিন উমাইর ও আসআদ বিন যুরারাহকে প্রশ্ন করলেন:

كَيْفَ تَصْنَعُونَ إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا فِي هَذَا الدِّينِ ؟ قَالَا لَهُ: تَغْتَسِلُ فَتُطَهِّرُ وَتُطَهِّرُ ثَوْبَيْكَ، ثُمَّ تَشْهَدُ شَهَادَةَ الْحَقِّ، ثُمَّ تُصَلِّي.

অর্থাৎ: তোমরা এ দীনে প্রবেশ করার সময় কি কর? তারা উভয়ে বললেন, গোসল করে পবিত্র হও এবং তোমার পোশাক পবিত্র কর, অতঃপর সত্যের সাক্ষ্য দাও ও সালাত আদায় কর।[৫০২]

দ্বিতীয় অভিমত:

কাফির ব্যক্তিকে এমতাবস্থায় গোসল করা মুস্তাহাব। তবে যদি সে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জুনুবী (অপবিত্র) থাকে তাহলে গোসল ওয়াজিব। এটা ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এর মাযহাব এবং ইমাম আবূ হানীফার একটি উক্তি।[৫০৩]

তৃতীয় অভিমত:

সাধারণভাবে, তার প্রতি গোসল করা ওয়াজিব নয়। এটা ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব।[৫০৪] উপরোক্ত দু'টি দলের অভিমতের দলীল নিম্নরূপ:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾

(১) অর্থাৎ: যারা কুফরী করেছে তুমি তাদেরকে বল, যদি তারা বিরত হয় তাহলে অতীতে যা হয়েছে তাদেরকে তা ক্ষমা করা হবে *(সূরা আনফাল:৩৮)*।

---

[৫০০] সহীহ, আবূ দাউদ (৩৫৫), তিরমিযী (৬০৫), নাসাঈ (১/১০৯) মিশকাত (৫৪৩) দ্রষ্টব্য।

[৫০১] সহীহ; আহমাদ (২/৩০৪), ইবনে খুযায়মাহ (২৫২), এ হাদীসের মূল সহীহাইনে 'গোসলের নির্দেশ' ছাড়া এসেছে। বিস্তারিত আল-ইরওয়া (১২৮) দ্রষ্টব্য।

[৫০২] এ হাদীসের সনদ সহীহ; ইমাম ত্বাবারী তার আত-তারীখ (১/৫৬০), ইবনু হিশাম তার আস-সিরাত (২/২৮৫) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

[৫০৩] আল-মাজমূ (১/১৭৪), আল-উম্ম (১/৩৮), ইবনু আবেদীন (১/১৬৭)।

[৫০৪] আল মাসবূত্ব' ও শরহে ফাতহুল ক্বাদীর (১/৫৯)।

Contents

(২) মারফূ সূত্রে বর্ণিত, আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত:

الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

অর্থাৎ: ইসলাম গ্রহণ করলে অতীতের সমস্ত অপরাধ ধ্বংস হয়ে যায়।[৫০৫]

উল্লেখিত কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখিত কুরআন ও হাদীস দ্বারা পাপ মোচন করার কথা বুঝানো হয়েছে। আর এ ব্যাপারে সবাই ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, এমবস্থায় তার উপর যদি কোন ঋণ কিংবা কিসাসের বিধান থাকে, তাহলে ইসলাম গ্রহণের ফলে সে বিধান বাতিল হবে না। কুফরী অবস্থায় তার উপর যে গোসল ওয়াজিব ছিল, তার জন্য তাকে এখন আর পাকড়াও করা হবে না এবং তাকে এর কারণে কষ্টও দেয়া হবে না। মূলতঃ ওয়াজিব গোসলের কারণ হলো, এটা ইসলাম গ্রহণের পর অপবিত্র হলে সালাত আদায়ের শর্ত সমূহের অন্যতম একটি শর্ত। আর জুনুবী বা নাপাকীর কারণে সালাত বিশুদ্ধ হয় না এবং জুনুবী হওয়ার কারণে তাকে ইসলাম থেকে বের করেও দেয় না।[৫০৬]

(৩) তারা বলেন: তৎকালীন সময়ে অসংখ্য ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যাদের স্ত্রী ও সন্তানাদী ছিল। অথচ মহানাবী (ﷺ) তাদের সকলের জন্য গোসল করা ওয়াজিব বলে নির্দেশ দেন নি। যদি গোসল ওয়াজিব হত, তাহলে মহানাবী (ﷺ) তাদের অবশ্যই এর আদেশ দিতেন। তাদের এ যুক্তি সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। মূলতঃ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কথা হলো গোসল ওয়াজিব। কেননা কতিপয়কে আদেশ করাটাই সকলের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট, আর অন্যদের আদেশ না দেয়ার যে দাবী করা হচ্ছে তাও সঠিক নয়। কেননা এ ব্যাপারে যদি কিছুই জ্ঞান না থাকত তাহলে তা ভিন্ন ব্যাপার ছিল।[৫০৭] সুতরাং প্রণিধানযোগ্য কথা এটাই যে, এমতাবস্থায় কাফেরের উপর গোসল করা ওয়াজিব। চাই সে প্রকৃত কাফির হোক কিংবা মুরতাদ হোক। যখন সে ইসলাম গ্রহণ করবে সাধারণভাবে সে গোসল করবে। আর যতটুকু অনুধাবন করা যায়, তা হলো ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করাটা সাহাবাদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল।

যেমন: আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) এর মায়ের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী। "তিনি গোসল করেছিলেন এবং চাদর পরিধান করেছিলেন"[৫০৮] এবং উসাইদ ইবনে হুযাইরের ইসলাম গ্রহণের উল্লেখিত কাহিনী দ্বারাও তা বুঝা যায়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

৬। জুম'আর সালাতের জন্য গোসল:

জুম'আর সালাতের জন্য গোসল করা ওয়াজিব। বিদ্বানদের বিশুদ্ধ মতে জুম'আর সালাতের গোসল পরিত্যাগকারী পাপী হবে। এটা আবূ হুরাইরাহ, আম্মার ইবনে ইয়াসার, আবূ সাঈদ খুদরী ও হাসান (রা.) এর অভিমত। ইমাম মালিক ও আহমাদ (রাহি.) দু'টি রিওয়ায়াতের একটিতে এ অভিমত পোষণ করেছেন। আর এটিই ইবনে হাযমের মাযহাব।[৫০৯]

---

[৫০৫] সহীহ; মুসলিম (১২১) যা আমর বিন আস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত।
[৫০৬] আল মাজমূ' (২/১৭৪)।
[৫০৭] নাইলুল আওতার (১/২৮১)।
[৫০৮] সহীহ; মুসলিম (২৪৯১), আহমাদ (৭৯১১)।
[৫০৯] আল মুহাল্লা (২/১২), আল আওসাত্ব (৪/৪৩)।

www.waytojannah.com

তাদের দলীল নিম্নরূপ:

«عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

(১) আবূ সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: প্রত্যেক বালেগের উপর জুম'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব।[৫১০]

(২) ইবনে উমার (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ»

অর্থাৎ: তোমাদের কেউ যখন জুম'আর সালাত আদায় করতে যাবে তখন সে যেন, গোসল করে।[৫১১]

(৩) আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন:

«حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»

অর্থাৎ: প্রত্যেক মুসলমানের উপর সপ্তাহে একদিন গোসল করা ওয়াজিব। গোসলের সময় সে তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে।[৫১২]

(৪) সাওবান থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন:

«الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَوْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ»

অর্থাৎ: প্রত্যেক মুসলমানের উপর মিসওয়াক করা, জুম'আর দিন গোসল করা এবং তার পরিবারের যদি সুগন্ধি থাকে তাহলে তা ব্যবহার করা আবশ্যক।[৫১৩]

«عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحٌ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ»

(৫) হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য জুম'আর সালাত আদায় করা একান্ত কর্তব্য এবং যে ব্যক্তি জুম'আর সালাতের জন্য গমন করবে তার জন্য গোসল আবশ্যক।[৫১৪]

عن ابن عمر قال : « أمرنا بالاغتسال يوم الجمعة ، وأن لا نتوضأ من موطأ »

(৬) ইবনে উমার (رضي الله عنهما) বলেন: আমাদেরকে জুম'আর দিন গোসল করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং আমরা যেন জুম'আর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার পর আর ওযূ না করি।[৫১৫]

মহানাবী (ﷺ) যে বিষয়টি প্রত্যেক মুসলমানদের উপর আল্লাহর হক্ব বলে বর্ণনা করেছেন এবং যেটাকে প্রত্যেক বালেগের উপর ওয়াজিব বলে আখ্যা দিয়েছেন, তা নিম্নের এসব দলীল দ্বারা ওয়াজিব এবং হক্ব না বলাটা এমন বিষয় যা থেকে শরীরের চামড়ার শিহরণ জাগে!![৫১৬]

---

[৫১০] সহীহ; বুখারী (৮৭৯), মুসলিম (৮৪৬)।
[৫১১] সহীহ; বুখারী (২/৬), মুসলিম (৮৪৪)।
[৫১২] সহীহ; বুখারী (২/৩১৮), মুসলিম (৮৪৯)।
[৫১৩] সহীহ; আহমাদ (৪/৩৪), আস-সাহীহা (১৭৯৬)।
[৫১৪] সহীহ; আবূ দাউদ (৩৩৮), নাসাঈ (৩/৮৯), আহমাদ (৩/৬৫)।
[৫১৫] এ হাদীসের সনদ হাসান; আবু বাকার আল-মারুযী তাঁর 'আল-জুমআতু ওয়া ফাযালিহা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।
[৫১৬] অনুরূপ এসেছে 'আল মুহাল্লা' (২/১২)।

Contents

অপরদিকে ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) ও ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) সহ অধিকংশ বিদ্বানদের মতে, জুম'আর দিন গোসল করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। তাদের দলীল নিম্নরূপ:

(১) সামুরাহ বিন জুনদুব থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত:

«مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ»

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি জুম'আর দিন ওযূ করবে, সে যেন সুন্নাতের উপর আমল করল এবং উত্তম কাজ করল। আর যে ব্যক্তি গোসল করবে তার জন্য তা সর্বোত্তম হবে।[৫১৭]

তাদের এ দলীলের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে বটে। কিন্তু বিশুদ্ধ মতে, হাদীসটি যঈফ।

(২) আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত:

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে জুম'আর সালাত আদায় করার জন্য আসবে অতঃপর চুপ করে খুৎবা শ্রবণ করবে, সে ব্যক্তির এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আর মধ্যে সংঘটিত পাপ মোচন করা হবে। এছাড়াও অতিরিক্ত আরও তিন দিনের পাপ মোচন করা হবে।[৫১৮]

তারা বলেন, যদি জুম'আর জন্য গোসল করা ওয়াজিব হতো, তাহলে কেন রাসূল (ﷺ) শুধু ওযূ করার কথা উল্লেখ করে সংক্ষেপ করলেন।

হাফিজ "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (২/৪২২) এর উত্তর দিয়ে বলেন: এর মাধ্যমে গোসল বাতিল হয় না। এরূপ হাদীস অন্যভাবে বিশুদ্ধ সনদে ' مَنِ اغْتَسَلَ ' শব্দে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসে সম্ভাবনা রাখছে যে, এখানে শুধু ওযূর কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে, পূর্বেই গোসল সেরে সালাতের জন্য গমন করেছে। এখন শুধু তাকে ওযূ করতে হবে।

আমার বক্তব্য: এ ব্যাপারে তাদের আরও একটি দলীল রয়েছে, যা আমি "اللمعة في آداب وأحكام الجمعة" গ্রন্থে দলীল আকারে পেশ করেছি। এ মাসআলাটির ব্যাপারে সারকথা হলো, যারা গোসল করা ওয়াজিব মনে করেন তাদের দলীলগুলো সনদগতভাবে অধিক বিশুদ্ধ, মজবুত ও আমলগতভাবে খুব সতর্কতার দাবীদার। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

৭। মৃত্যু:

এটি গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ। তবে মাইয়্যেতের উপর নিজে গোসল ওয়াজিব নয়। বরং মুসলমানদের মধ্যে যারা মাইয়্যেতের কাছে থাকবে তাদের উপর তাকে গোসল করিয়ে দেয়া ওয়াজিব। "কিতাবুল জানায়েয" এ এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হবে। ইনশা-আল্লাহ।

---

[৫১৭] যঈফ; আবূ দাউদ (৩৫৪), নাসাঈ (৩/৯৪), তিরমিযী (৪৯৭), প্রভৃতি। এ হাদীসের আরও কয়েকটি সূত্র রয়েছে যা বিস্তারিত ভাবে 'আল-লুমআতু ফি আদাবিন ওয়া আহকামিল জুমআ' তে আলোচনা করেছি। আলবানী এ হাদীসকে হাসান বলেছেন।

[৫১৮] এর সনদ সহীহ; মুসলিম (৮৫৭), তিরমিযী (৪৯৮) প্রভৃতি।

www.waytojannah.com

মুস্তাহাব গোসল

১। দু'ঈদে গোসল করা:

ফাকিহ বিন সা'দ থেকে বর্ণিত:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ

অর্থাৎ: রাসূল (ﷺ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন গোসল করতেন।[৫১৯] কিন্তু হাদীসটি যঈফ। তবে আলী বিন আবূ তালিব (رضي الله عنه) ও ইবনে উমার (رضي الله عنه) থেকে কিছু উক্তি সাব্যস্ত থাকার ফলে এ গোসলটি মুস্তাহাব হওয়ার দাবী রাখে।

عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْغُسْلِ، قَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ؟ قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ

অর্থাৎ: যাদান থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আলী (رضي الله عنه) কে গোসলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল, অতঃপর তিনি বললেন: তুমি চাইলে প্রত্যেক দিন গোসল করতে পার। ব্যক্তিটি বললেন, আমি এ গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি নি। বরং প্রকৃত পক্ষে যাকে গোসল বলা হয়, সে গোসল প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি জুম'আর দিন, আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতর এর দিন গোসল করবে।[৫২০]

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى

নাফি থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন উমার (رضي الله عنه) ঈদুল ফিতরের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন।[৫২১]

২। অজ্ঞান থেকে জ্ঞান ফিরার পর গোসল:

কেননা মহানাবী (ﷺ) অজ্ঞান থেকে জ্ঞান ফিরার পর গোসল করেছেন।[৫২২] এটা রাসূল (ﷺ) এর মৃত্যুকালীন অসুস্থতার ঘটনা। এ গোসলটি মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। আর বিদ্বানগণ পাগল থেকে জ্ঞান ফিরাকে অজ্ঞানের কিয়াস করেছেন।

৩। হাজ্জ অথবা উমরার ইহরাম বাঁধার সময় গোসল:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ»

অর্থাৎ: যায়িদ বিন সাবিত (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি মহানাবী (ﷺ) কে ইহরামের উদ্দেশ্যে (সেলাই করা) পোশাক খুলতে ও গোসল করতে দেখেছেন।[৫২৩]

---

[৫১৯] খুবই দুর্বল; ইবনু মাজাহ (১৩১৬)।

[৫২০] এর সনদ সহীহ; ইমাম শাফেঈ তার 'মুসনাদ' (১১৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বাইহাক্বী (৩/২৭৮)।

[৫২১] এর সনদ সহীহ; মালিক (৪২৬), এবং তার থেকে ইমাম শাফেঈ তার আল-উম্ম (১/২৩১) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

[৫২২] সহীহ; বুখারী (৬৮৭), মুসলিম (৪১৮) আয়িশার সূত্রে একটি দীর্ঘ হাদীসে।

[৫২৩] হাসান; তিরমিযী (৮৩১), আল-ইরওয়া (১৪৯)।

Contents

হায়িয-নিফাসওয়ালী মহিলারা ইহরাম বাঁধার সময় গোসল করবে। কেননা মহানাবী (ﷺ) আসমা বিনতে উমাইসকে হাজ্জের সময় সন্তান প্রসব করলে তাকে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৫২৪] 'হাজ্জ' অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৪। মক্কায় প্রবেশের সময় গোসলঃ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى، حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ»

অর্থাৎ: ইবনে উমার (رضي الله عنه) "যীতুওয়ায়" রাত না কাটিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন না। অতঃপর তিনি গোসল করতেন এবং দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করতেন, আর তিনি নাবী (ﷺ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, "তিনিও এটা করেছেন"।[৫২৫]

৫। একাধিকবার স্ত্রী সহবাসের মাঝে গোসলঃ

عَنْ أَبِي رَافِعٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ» ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا، قَالَ: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ»

অর্থাৎ: আবূ রাফে হতে বর্ণিত। একদা নাবী (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেন। এক স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর অপর স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তিনি গোসল করেন। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলাম- আপনি কেন একবার গোসল করলেন না (সবশেষে একবার গোসল করলেই তো হত- কেন আপনি বারবার গোসল করলেন)? তিনি (ﷺ) বলেন, এরূপ করা অধিকতর পবিত্র, উত্তম ও উৎকৃষ্ট।[৫২৬]

৬। মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পরে গোসলঃ (যদি হাদীসটি সহীহ হয়)

আবূ হুরাইরাহ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ অর্থাৎ: যদি কেউ মৃতকে গোসল করায় তাহলে সে গোসল করবে।[৫২৭]

৭। মুস্তাহাযাহ মহিলার জন্য প্রত্যেক সালাতের সময় গোসলঃ

প্রত্যেক সালাতের সময় মুস্তাহাযাহ মহিলাকে গোসলের নির্দেশ দিয়ে বর্ণিত হাদীসের সবগুলোই যঈফ।[৫২৮]

---

[৫২৪] সহীহ; এ সম্পর্কে তাখরিজ 'হাজ্জ' অধ্যায়ে আসবে।

[৫২৫] সহীহ; বুখারী (১৫৭৩), মুসলিম (১২৫৯)।

[৫২৬] হাসান; আবূ দাউদ (২১৬), ইবনু মাজাহ (৫৬০)।

[৫২৭] আবূ দাউদ (৩১৬২), তিরমিযী (৯৯৩), ইবনু মাজাহ (১৪৬১) এ হাদীসকে তিরমিযী, ইবনে হাজার ও আলবানী হাসান বলেছেন। আল-ইরওয়া (১/১৭৪), এ হাদীসটির উপর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে; কারণ হাদীসটিকে ত্রুটিযুক্ত বলা হয়েছে।

[৫২৮] এ হাদীস সম্পর্কে জানতে দেখুন 'জামি' আহকামিন নিসা' (১/২৩০-২৩৭)।

www.waytojannah.com

তবে আয়িশা (রা.) থেকে সাব্যস্ত আছে যে,

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: «هَذَا عِرْقٌ» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

অর্থাৎ: নাবী পত্নী 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উম্মে হাবীবা (রা.) সাত বছর পর্যন্ত ইস্তিহাযাগ্রস্তা ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাঁকে গোসলের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন: ইহা শিরা নির্গত রক্ত। এরপর উম্মে হাবীবা (রা.) প্রতি সালাতের জন্য গোসল করতেন।[৫২৯]

ইমাম শাফেঈ (রাহি.) বলেন, অত্র হাদীসে মহানাবী (ﷺ) উম্মে হাবীবাকে শুধু গোসল করা ও সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৩০] নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, তিনি এখানে প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করার নির্দেশ দেন নি। তবে আল্লাহ ইচ্ছে করলে প্রত্যেক সালাতের জন্য তার গোসল করাটা নফল গোসলের অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা নির্দেশিত গোসলের অন্তর্ভুক্ত হবে না। মূলতঃ এটা তার জন্য ইচ্ছাধীন একটি আমল ছিল।[৫৩১]

আমার বক্তব্য: পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত এটাই যে, মুস্তাহাযাহ মহিলাদের উপর প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল ওয়াজিব নয়।

গোসল সিদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত:

কেননা গোসল হলো একটি ইবাদাত। এটা শরীয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং গোসলের মধ্যে নিয়ত শর্ত। আর নিয়ত হলো, আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গোসল করার জন্য অন্তরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। আর ইখলাস হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের সংকল্প করা এবং মুমিন বান্দার উপর যা ফরয হয়েছে তা আদায়ের জন্য ইচ্ছা পোষণ করা। মহানাবী (ﷺ) বলেন, প্রত্যেকটি আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।[৫৩২] আর গোসলও এই আমলের অন্তর্ভুক্ত।[৫৩৩]

গোসলের রুকুন:

গোসলের রুকন হলো: পানি দ্বারা সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে গোসল হলো, সম্পূর্ণ শরীরে পানি প্রবাহিত করা এবং প্রত্যেকটি চুলে ও ত্বকে পানি পৌছানো। মহানাবী (ﷺ) এর গোসলের বিবরণ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ দ্বারা এটা প্রমাণিত। এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো একটু পরেই উল্লেখ করা হবে। তন্মধ্যে আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি হলো- ثم يفيض على جسده كله " " অর্থাৎ: "অতঃপর

---

[৫২৯] সহীহ; বুখারী (৩২৮), মুসলিম (৩৩৪)।

[৫৩০] এখানে সাধারণ ভাবে গোসল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা বার বার গোসল করার উপর প্রমাণ করে না। সম্ভবত উম্মে হাবীবাহ কোন ইঙ্গিতে বুঝেছিলেন যে, রাসূল (ﷺ) তার কাছ থেকে গোসল করা চাচ্ছিলেন, ফলে তিনি প্রত্যেক সালাতে এভাবে গোসল করেছেন (ফাতহুল বারী ১/৫০৯)।

[৫৩১] সুনানু বাইহাক্বী (১/৩৪৯)।

[৫৩২] সহীহ; পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

[৫৩৩] অত্র কিতাবের "النية شرط صحة الوضوء" (ওযূ বিশুদ্ধতার জন্য নিয়ত শর্ত)-এর আলোচনা দেখুন।

www.waytojannah.com

Contents

মহানাবী (ﷺ) তাঁর সর্বাঙ্গে পানি প্রবাহিত করলেন"।[৫৩৪] হাফেজ "ফাতহ" নামক গ্রন্থে (১/৩৬১) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন- এটা তাকীদমূলক। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গোসলের সময় সর্বাঙ্গই ধৌত করতে হবে।

جبير بن مطعم قال النبي ﷺ: أما أنا فأخذ ملء كفي ثلاثا فاصب على رأسي ثم أفيضه بعد على سائر جسدي

অর্থাৎ: জুবাইর বিন মুতয়িম এর হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেন: আমি গোসল করার সময় তিন অঞ্জলি পানি তিনবার নিয়ে আমার মাথায় ঢালি। তারপর আমার সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করি।[৫৩৫]

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, পানি দ্বারা সর্বাঙ্গ ধৌত করা গোসলের ফরয। এছাড়া অন্য কিছু নয়।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»

অর্থাৎ: উম্মে সালামাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি তো মাথার চুলের বেনী গেঁথে থাকি। সুতরাং জানাবাতের গোসলের সময় কি আমি তা খুলবো? তিনি বললেন, না। বরং তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার উপর তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢেলে পবিত্রতা অর্জন করবে।[৫৩৬]

আর গোসলের সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কচ্‌লানো, কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী মুস্তাহাব। এর বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হবে। আর এটা অধিকাংশের মাযহাব।

গোসলের মুস্তাহাবসমূহ (পূর্ণাঙ্গ গোসলের বিবরণ)

এ অধ্যায়ের সারকথায় দু'টি হাদীস বর্ণনা করা যেতে পারে-

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ "

(১) অর্থাৎ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (ﷺ) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তার হাত দুটো ধুয়ে নিতেন। তারপর সালাতের ওযূর মত ওযূ করতেন। তারপর তার আঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। তারপর তার উভয় হাতের তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢালতেন। তারপর তার সারা দেহের উপর পানি পৌঁছিয়ে দিতেন। অপর বর্ণনায় রয়েছে:

حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ

অর্থাৎ: চামড়া ভিজেছে বলে যখন তিনি নিশ্চিত হতেন, তখন মাথায় পানি ঢালতেন।[৫৩৭]

---

[৫৩৪] সহীহ; এ হাদীসের মূল ইবারত ও তাখরিজ অচিরেই আসবে।

[৫৩৫] সহীহ; এ শব্দে ইমাম আহমাদ (৪/৮১) তে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস এসেছে বুখারী (২৫৪), মুসলিম (৩২৭) এ সংক্ষিপ্ত ভাবে।

[৫৩৬] সহীহ; মুসলিম (৩৩০), আবূ দাউদ (২৫১), নাসাঈ (১/১৩১) তিরমিযী (১০৫), ইবনু মাজাহ (৬০৩)।

[৫৩৭] সহীহ; বুখারী (২৪৮), মুসলিম (৩১৬)।

www.waytojannah.com

عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، قَالَتْ: «وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلًا وَسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ» – قَالَ: سُلَيْمَانُ لاَ أَدْرِي، أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لاَ؟ – ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ بِالحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَمْ يُرِدْهَا "

(২) অর্থাৎ: মাইমূনাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল (ﷺ) এর গোসলের পানি রেখে পর্দা করে দিলাম, তিনি পানি দিয়ে দু'বার কিংবা তিন বার হাত ধুলেন। সুলায়মান বলেন, তৃতীয়বারের কথা বলেছেন কিনা আমার মনে পড়ে না। তখন তিনি ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে ঢাললেন এবং ধুয়ে নিলেন। তারপর তার হাত মাটিতে বা দেয়ালে ঘষলেন। পরে তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তার চেহারা ও দু'হাত ধুলেন এবং মাথা ধুয়ে ফেললেন। তারপর তার শরীরে পানি ঢেলে দিলেন। পরে সেখান থেকে সরে গিয়ে তার দু'পা ধুলেন। অবশেষে আমি তাকে একখণ্ড কাপড় দিলাম; কিন্তু তিনি হাতের ইশারায় নিষেধ করলেন এবং তা নিলেন না।[৫৩৮]

আমার বক্তব্য: উল্লেখিত দু'টি হাদীস ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা একনিষ্ঠচিত্তে আমরা একথা বলতে পারি যে, গোসলের মুস্তাহাবগুলো (পূর্ণাঙ্গ নিয়ম) নিম্নবর্ণিত জানাবাতের গোসলের নিয়মের মতই। (বড় নাপাকী দূর করার নিয়ত করার পর)।

১। পাত্রে হাত প্রবেশের পূর্বেই বা গোসল শুরু করার পূর্বেই দু'হাত ৩ বার ধৌত করা:

আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, "মহানাবী (ﷺ) গোসল শুরু করার সময় দু'হাত ধৌত করেন"। আর মুসলিম শরীফে মাইমূনাহ (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, "অতঃপর মহানাবী (ﷺ) দু'হাতের কব্জি দু'বার অথবা ৩ বার ধৌত করলেন"। এরপর পাত্রে হাত প্রবেশ করালেন।

হাফেজ "ফাতহ" (১/৪২৯) এ বলেন- সম্ভবত মহানাবী দু'হাত ধৌত করেছেন তা অপরিষ্কার থেকে পরিচ্ছন্নতা দানের জন্য অথবা ঘুম থেকে উঠার পর শরীয়াত নির্দেশিত পন্থায় যে হাত ধোয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সেটাও হতে পারে।

২। বাম হাত দ্বারা গুপ্তাঙ্গ এবং তাতে যে ময়লা লেগে আছে তা ধৌত করবে:

মাইমূনাহ (রা.) বর্ণিত হাদীসে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে। আর ডান হাতে গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা এটা মাকরূহ। রাসূল (ﷺ) বলেন:

«إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ»

অর্থাৎ: তোমাদের কেউ যখন পেশাব করবে তখন সে যেন ডান হাত দ্বারা তার লিঙ্গ স্পর্শ না করে। ডান হাত দ্বারা যেন ইসতিনজা না করে এবং পাত্রে যেন নিঃশ্বাস না ফেলে।[৫৩৯]

---

[৫৩৮] সহীহ; বুখারী (২৬৬), মুসলিম (৩১৭)।
[৫৩৯] সহীহ; বুখারী (১৫৪), মুসলিম (২৬৭)।

Contents

৩। গুপ্তাঙ্গ ধৌত করার পর সাবান বা এ জাতীয় কিছু , যেমন মাটি ইত্যাদি দ্বারা হাত পরিষ্কার করবেঃ

মাইমূনাহ (রা.) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

«ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا»

অর্থাৎঃ এরপর তিনি মাটিতে হাত ঘুষে তা ধুয়ে ফেললেন। অপর বর্ণনায় এসেছেঃ

«ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا»

অর্থাৎঃ অতঃপর তার বাম হাত জমিনে মেরে ভালভাবে ঘর্ষণ করলেন।[৫৪০]

ইমাম নাববী "মুসলিমের শারাহ" তে (৩/২৩১) বলেন- পানি দ্বারা ইসতিনজাকারীর জন্য মুস্তাহাব হলো- যখন ইসতিনজা শেষ করবে তখন মাটি বা সাবান জাতীয় কিছু দ্বারা হাত ধৌত করবে। অথবা মাটি বা দেয়ালে হাত ঘর্ষণ করবে, যাতে ময়লা দূর হয়ে যায়।

৪। সালাতের ওযূর ন্যায় পূর্ণাঙ্গ ভাবে ওযূ করবেঃ

এটা আয়িশা ও মাইমূনাহ (রা.) এর হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। হাফেজ তার "ফাতহ" গ্রন্থে (১/৪২৯) হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ হতে পারে গোসলের পূর্বে ওযূ করা আলাদা একটি সুন্নাত। তবে গোসলের সময়েও অন্যান্য অঙ্গগুলোর সাথে ওযূর অঙ্গগুলো পুনরায় ধুয়া ওয়াজিব। অথবা এর দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, ওযূর অঙ্গগুলো গোসলের সময় পুনরায় ধুয়ার চাইতে প্রথমে ওযূর সময় ধুলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথমে ওযূর অঙ্গগুলো ধোয়ার সময় জানাবাতের গোসলের নিয়ত করা প্রয়োজন।

মূলতঃ সম্মানার্থে ওযূর অঙ্গগুলো প্রথমে ধোয়া হয়। এর ফলে দু'ধরণের ত্বহারাত (পবিত্রতা) অর্জিত হয়। ১. ছোট ত্বহারাত, ২. বড় ত্বহারাত।

আমার বক্তব্যঃ গোসলের পূর্বে ওযূ করা অধিকাংশ বিদ্বানের মতে সুন্নাত। তবে আবূ সাওর ও দাউদ যাহেরী এর বিপরীত মত দিয়েছেন।[৫৪১]

দু'টি প্রয়োজনীয় কথা

১মঃ গোসলের সময় কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার হুকুমঃ

ইতিপূর্বে ওযূ সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওযূ ও গোসলের ক্ষেত্রে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া হুকুমের ব্যাপারে বিদ্বানগণের চারটি অভিমত পাওয়া যায়।

ওযূর ক্ষেত্রে আমরা সেখানে প্রাধান্য দিয়েছি যে, ওযূতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব। আর গোসলের ক্ষেত্রে ইমাম সাওরী, আবূ হানীফা ও তার অনুসারী এবং আহমাদ, আত্বা ও ইবনুল মুবারাক (রাহি.) এর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া গোসলের ওয়াজিব।[৫৪২]

---

[৫৪০] এ গুলো মুসলিমের শব্দ (৩১৭)।

[৫৪১] ফাতহুল বারী (১/৪২৬), আল মাজমূ' (২/১৮৬), আল-ইস্তিযকার (৩/৫৯)।

[৫৪২] 'আরকানুল ওযূ' এর মাসআলার তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য।

www.waytojannah.com

তাদের দলীলঃ

(১) মারফূ সূত্রে বর্ণিত আছে

الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ لِلْجُنُبِ ثَلاَثًا فَرِيضَةٌ

অর্থাৎ: জুনুবীর জন্য কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ফরয।[৫৪৩]

(২) মারফূ সূত্রে বর্ণিত আছেঃ

«مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ»

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি অপবিত্রতার গোসলের সময় একটি পশম পরিমাণ স্থান ধৌত করা পরিত্যাগ করে তার উক্ত স্থান জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে।[৫৪৪]

(৩) মারফূ সূত্রে বর্ণিত আছে

وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ، قَالَ: «غُسْلُ الْجَنَابَةِ، فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً»

অর্থাৎ: আমানত আদায় করা হলো জানাবাতের গোসল করা। আর প্রত্যেক পশমের গোড়ায় অপবিত্রতা রয়েছে।[৫৪৫]

উল্লেখিত সবগুলো হাদীসই যঈফ। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

(৪) মাইমূনাহ বর্ণিত হাদীসে মহানাবী (ﷺ) এর কর্ম (যা সুস্পষ্ট প্রমাণ করছে) ও ওযূ সংক্রান্ত আয়িশা বর্ণিত হাদীস, উভয়টিই আল্লাহর বাণী - وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا অর্থাৎ: যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও। *(সূরা মায়িদা-৬)*- এর ব্যাখ্যা স্বরূপ।

(৫) সর্বাঙ্গ ধৌত করা ওয়াজিব। আর মুখমণ্ডল শরীরেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কুলি করা ও নাকে পানি দেয়াও ওয়াজিব। কেননা এ দু'টি মুখমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি আমরা ওযূর অধ্যায়ে আলোচনা করে এসেছি।

অপরদিকে ইমাম মালিক, শাফেঈ, লাইস, আওযায়ী ও অধিকাংশের মতে, এ দু'টি গোসলের সুন্নাত।

তাদের দলীল নিম্নরূপঃ

(১) গোসলের জন্য ওযূ ওয়াজিব নয়। (যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)। আর কুলি করা ও মুখে পানি দেয়াতো ওযূর আওতাধীন। সুতরাং যখন ওযূই বাতিল হয়ে যায় তখন তো এর অনুগামী বিষয়গুলো বাকী থাকার প্রশ্নই আসে না।[৫৪৬]

(২) গোসলের ক্ষেত্রে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার জন্য শুধু রাসূল (ﷺ) এর কাজ দ্বারা তা ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ করে না। বরং তা মানদুব (বৈধ) এবং মুস্তাহাব প্রমাণ করে। মূলতঃ রাসূল (ﷺ)

---

[৫৪৩] হাদীসটি জাল; দারাকুতনী (১/১১৫), তিনি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, নাসবুর রায়া (১/৭৮)।

[৫৪৪] যঈফ; আবূ দাউদ (২৪৯), ইবনু মাজাহ (৫৯৯), আহমাদ (১/৯৪) দেখুন, আয-যঈফাহ (৯৩০)।

[৫৪৫] যঈফ; ইবনু মাজাহ (৫৯৮), দুর্বল সনদে। দেখুন, আত-তালখীস, তবে বিশুদ্ধ মত হল হাদীসটি আবু আইউব পর্যন্ত মাওকূফ (অর্থাৎ, মারফূ নয়)। আল্লাহই ভাল জানেন। (১/১৪২)।

[৫৪৬] ফাতহুল বারী (১/৪৪৩)।

Contents

এর কাজটি যখন এমন কোন অস্পষ্ট বিষয়ের বর্ণনা করে যার সাথে ওয়াজিবের সম্পর্ক রয়েছে, তখনই শুধু তা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে। আর এখানে তো বিষয়টা এরূপ নয়।[৫৪৭]

(৩) আবূ যার (রা.) জানাবাতের কারণে পানি না পেয়ে রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন:

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ

অর্থাৎ: পবিত্র মাটি মুসলমানদের জন্য পবিত্রতা দানকারী, যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়। আর যখন সে পানি পাবে তখন সে যেন তার শরীরে পানি পৌঁছায় (গোসল করে)।[৫৪৮]

তারা বলেন, البشرة বা ত্বক হলো চামড়ার উপরের অংশ। সুতরাং কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

(৪) جبير بن مطعم قال تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي ﷺ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أما أنا فأخذ ملء كفي ثلاثا فاصب على رأسي ثم أفيضه بعد على سائر جسدي

(৪) অর্থাৎ: জুবাইর বিন মুতয়িম বলেন, আমরা রাসূল (ﷺ) এর কাছে জানাবাতের গোসলের কথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আমি গোসল করার সময় তিন অঞ্জলি পানি তিনবার নিয়ে আমার মাথায় ঢালি। এরপর আমার সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করি।[৫৪৯]

অপর বর্ণনায় আছে,

" أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت"

অর্থাৎ: আমি গোসল করার সময় তিন অঞ্জলি পানি তিনবার নিয়ে আমার মাথায় ঢালি। এভাবেই আমি পবিত্রতা অর্জন করি।[৫৫০] এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়।

(৫) রাসূল (ﷺ) উম্মে সালামাকে বলেন:

« إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»

অর্থাৎ: তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার ওপর তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢেলে পবিত্রতা অর্জন করবে।[৫৫১]

আমার বক্তব্য: যদি শেষে উল্লেখিত উম্মে সালমা (রা.) এর হাদীসটি না থাকত তাহলে, কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব হওয়ার দিকটাই শক্তিশালী হতো। কিন্তু উম্মে সালমার হাদীসটি দৃঢ়ভাবে প্রমাণ

---

[৫৪৭] ফাতহুল বারী (১/৪৩২)।

[৫৪৮] যঈফ; তিরমিযী (১২৪), আবূ দাউদ (২৩৩), নাসাঈ (১/১৭১) প্রভৃতি। এর মধ্যে প্রাধান্য যুক্ত সূত্রটি হল, আবূ ক্বিলাবা, আমর বিন বুজদান হতে, তিনি আবূ যার হতে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যেমন এসেছে ইমাম দারাকুতনী প্রণীত আল-ইলাল (১১১৩) গ্রন্থে। ইবনু আবি হাতিম (১/১১) এখানে আমর এর পরিচয় পাওয়া যায় নি। তবে আবূ হুরাইরা থেকে এ হাদীসের একটি শাহেদ রয়েছে যার হাসান হওয়া নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আলবানী একে সহীহ বলেছেন। দেখুন, আল-ইরওয়া (১৫৩)।

[৫৪৯] সহীহ; কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

[৫৫০] ইমাম শাওকানী ইহা হাফেয ইবনে হাজার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: তার উক্তি "فإذا أنا قد طهرت" এ অংশটুকু সহীহ বা যঈফ কোন হাদীসের অংশ নয়।

[৫৫১] সহীহ; কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে ।

www.waytojannah.com

করছে যে, হাদীসে উল্লেখিত কাজগুলোই গোসলের জন্য যথেষ্ট। আর হাদীসে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার কথা উল্লেখ হয় নি। আবার এটাও বলা যায় না যে, এ অঙ্গ দু'টি মহানাবীর বাণী " ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ " এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা পানি প্রবাহিত করার অর্থে এ দু'টি অঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করে না। আর এ বিষয়টি প্রকাশ্যই বুঝা যাচ্ছে। সুতরাং আমার কাছে অধিকাংশের মাযহাবটাই পছন্দনীয়। অর্থাৎ কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া গোসলের মুস্তাহাব। ওয়াজিব নয়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

২য়ঃ দুই পা কখন ধৌত করবে?

মাইমূনাহ (রা.) এর হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূল (ﷺ) দু'পা গোসল সম্পন্ন করার পর ধৌত করেছেন। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে (২৬০)- فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
অর্থাৎ: "যখন তিনি গোসল সমাপ্ত করলেন তখন দু'পা ধৌত করলেন।"
আর আয়িশা (রা.) এর হাদীসে এমনটি বলা হয় নি।[৫৫২] শুধু বলা হয়েছে 'তিনি গোসলের পূর্বে ওযূ করেছেন'। সুতরাং উল্লেখিত দু'টি হাদীসের কারণে চারটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়।[৫৫৩]

(১মঃ) গোসলের সময় দু'পা পরে ধৌত করা মুস্তাহাব। এর দলীল হলো মাইমূনাহ বর্ণিত হাদীস। আর এটা অধিকাংশের মাযহাব।

(২য়ঃ) গোসলের পূর্বে পূর্ণাঙ্গ ভাবে ওযূ করতে হবে। এর দলীল আয়িশা বর্ণিত হাদীস।
কেননা তার হাদীসে রাসূল (ﷺ) এর অধিকাংশ কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মাইমূনাহর হাদীস এর ব্যতিক্রম। কারণ সেখানে শুধু একবারের গোসলের কথা বলা হয়েছে।

এটা ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এর মাযহাব এবং ইমাম মালিক ও আহমাদ (রাহি.) এর একটি বর্ণনা মতে এ অভিমত পেশ করা হয়েছে।

(৩য়ঃ) এটা ইচ্ছাধীন, চাইলে পূর্বেই ওযূর সাথে দু'পা ধৌত করবে অথবা গোসলের পর ধৌত করবে। একটি বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদ (রাহি.) এ মত পেশ করেছেন।

(৪র্থঃ) গোসল করার স্থানটি যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে পরে পা ধৌত করবে। আর যদি স্থান পরিষ্কার হয় তাহলে আগেই ওযূর সাথে পা ধৌত করবে। এটা ইমাম মালিক (রাহি.) এর মাযহাব।

আমার বক্তব্যঃ শেষোক্ত মতামতটিই অধিক প্রাধান্য যোগ্য। তবে সবগুলোর উপর আমল করা যায়। এ ক্ষেত্রে যে কোনটির উপর আমল করার সুযোগ রয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

---

[৫৫২] মুসলিমের (৩১৬) বর্ণনা আয়িশার সূত্রে, এ হাদীসের শেষের অংশ "...ثم أفاض على سائر جسد ثم غسل رجليه" এটা অতিরিক্ত অংশ যা সংরক্ষিত নয়। দেখুন, 'ইলালু-মুসলিম' (৬৯) আল-হারাযী প্রণীত, 'আত-তামহীদ' (২২/৯৩), ফাতহুল বারী (১/২৩৪) ইবনু রাজব প্রণীত।

[৫৫৩] ফাতহুল বারী (১/৩৬২) ইবনু হাজার প্রণীত, আল-মুগনী (১/২৮৮), শারহুল উমদাহ (১/৩৭১), আল-খিলাফিয়্যাত (২/৪২৫) ইমাম বাইহাকী প্রণীত।

Contents

৫। মাথার উপর ৩ বার পানি প্রবাহিত করবে, যেন চুলের গোঁড়ায় পানি পৌঁছে যায়।

৬। প্রথমে মাথার ডান পাশ এবং পরে বাম পাশ ধুয়ে ফেলবে।

৭। সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুলগুলো খিলাল করবে।

ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

অর্থাৎ: অতঃপর তিনি তার মাথার চুলগুলো খিলাল করতেন। এমনকি চামড়া ভিজেছে বলে যখন তিনি নিশ্চিত হতেন, তখন মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালতেন।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ»

অর্থাৎ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জানাবাতের গোসলের সময় দুধ দোহনের পাত্রের (হেলাব)[৫৫৪] মত একটি পাত্রভর্তি পানি চেয়ে নিতেন, তারপর আঁজলা ভরে পানি নিয়ে প্রথমে মাথার ডান দিক ও পরে বাম দিক ধুয়ে ফেলতেন, অতঃপর অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে মাথার উপরে ঢালতেন।[৫৫৫]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ»

অর্থাৎ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদের কারও জানাবাতের গোসলের প্রয়োজন হলে সে দু হাতে পানি নিয়ে তিনবার মাথায় ঢালত। পরে হাতে পানি নিয়ে ডান পাশে তিনবার এবং আবার অপর হাতে পানি নিয়ে বাম পাশে তিনবার ঢালত।[৫৫৬]

প্রসঙ্গ কথা

গোসলের সময় কি দাড়ি খিলাল করতে হবে?

অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত: ইমাম মালিক, আবূ হানীফা, শাফেঈ ও ইবনে হাযমের[৫৫৭] মতে, দাড়ি খিলাল করা আবশ্যক নয়। বরং এটা মুস্তাহাব।

আমার বক্তব্য: যদি চামড়া বা ত্বকে পানি পৌঁছে তাহলে খিলাল করা মুস্তাহাব। নতুবা দাড়ির গোড়ায় বা ত্বকে পানি পৌঁছানোর জন্য দাড়ি খিলাল করা ওয়াজিব হবে। সতর্কতামূলক সর্বাবস্থায় দাড়ি খিলাল করা উচিত। কেননা আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে আমভাবে বলা হয়েছে যে, "তিনি চুলের গোঁড়া খিলাল করতেন"।

---

[৫৫৪] উটের দুধ দোহনের পাত্রকে হেলাব বলে, ইমাম খাত্ত্বাবী প্রণীত "মা'আলিমুস সুনান" (১/৬৯)।

[৫৫৫] সহীহ; বুখারী (২৫৮), মুসলিম (৩১৮)।

[৫৫৬] সহীহ; বুখারী (২৭৭)।

[৫৫৭] আল-মুহাল্লা (২/৩৩), আল আওসাত্ব (২/১২৭), আত-তামহীদ (২২/৯৫)।

www.waytojannah.com

৮ ও ৯। সারা শরীরে পানি ঢালবে, প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে:

সর্বাঙ্গে পানি প্রবাহিত করার প্রমাণ মহানাবী (ﷺ) এর গোসলের বিবরণ সংক্রান্ত বহু হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। আর ডান দিক থেকে শুরু করার প্রমাণ, আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীস।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

রাসূল (ﷺ) জুতা পরিধান, মাথা আঁচড়ানো ও পবিত্রতা অর্জন তথা সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালোবাসতেন।[৫৫৮]

দু'টি প্রয়োজনীয় কথা

১ম: সর্বাঙ্গে একবার পানি প্রবাহিত করতে হবে। আয়িশা (রা.)ও মাইমূনাহ (রা.) বর্ণিত হাদীস দু'টির বর্ণনা অনুযায়ী দু'হাত এবং মাথা তিনবার করে ধৌত করবে। আর সর্বাঙ্গ ধৌত করার ব্যাপারে আয়িশা (রা.) বলেন:

ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ

অর্থাৎ: তারপর তার সারা দেহের উপর পানি পৌঁছিয়ে দিতেন। আর মাইমূনাহ বলেন:

ثُمَّ أفاض عَلَى جِلْدِهِ

অর্থাৎ: তারপর তার দেহের উপর পানি পৌঁছিয়ে দিতেন।

ইবনে বাত্তাল বলেন:[৫৫৯] যেহেতু কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয় নি, সেহেতু সর্বনিম্ন সংখ্যাটিই এখানে ধর্তব্য। আর তা হলো একবার। কেননা আসলকে কখনও অতিরিক্ত বলা যায় না।

আমার বক্তব্য: ইমাম আহ্মাদ ও মালিক (রাহি.) এর অনুসারীদের স্পষ্ট অভিমত হলো, তিনবার পানি প্রবাহিত করা মুস্তাহাব। শাইখুল ইসলাম ও অধিকাংশ এমতটিকে পছন্দ করেছেন।

২য়: গোসলের অঙ্গগুলো কচলানোর হুকুম[৫৬০]:

বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন যে, গোসলের সময় সর্বাঙ্গ হাত দিয়ে কচলানো কি শর্ত? না কচলিয়ে শুধু সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করলেই চলবে? এটা হলো একটি শাব্দিক মতভেদগত মাসআলা। আর তা হলো, শুধু কি পানি ঢেলে দিলেই গোসল সাব্যস্ত হবে, না কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কচলানোর ফলে গোসল সাব্যস্ত হবে?

ইমাম মালিক ও শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী মাযিনী ছাড়া অধিকাংশ বিদ্বানের মতে অঙ্গ কচলানো ওয়াজিব নয়। বরং এটা গোসলের মুস্তাহাব। সুতরাং যদি মানুষ তার সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে দিয়ে গোসল করে, তাহলে আল্লাহ কর্তৃক অবধারিত ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তদ্রুপ কেউ যদি পানিতে ডুব দিয়ে

---

[৫৫৮] সহীহ; বুখারী (১৬৮), মুসলিম (২৬৮)।

[৫৫৯] ফাতহুল বারী (১/৪৩৯)।

[৫৬০] আল মুহাল্লা (২/৩০), আল-ইস্তিযকার (৩/৬৩), আল মুগনী (১/২৯০) বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/৫৫), আস সায়লুল জাররার (১/১১৩)।

Contents

সর্বাঙ্গে পানি পৌঁছে দেয়, তাহলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। অত্র মাসআলাটির ক্ষেত্রে অধিকাংশের দলীলের স্বপক্ষে হুবহু সেই দলীলটিই প্রযোজ্য হবে, যে দলীলটি ইতিপূর্বে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিধানে প্রদত্ত হয়েছে।

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, অঙ্গ কচলানো মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

এর সমর্থনে উম্মে সালামার হাদীসসহ মশকের ঘটনায় বর্ণিত ইমরান বিন হুসাইনের হাদীসটি পেশ করা যেতে পারে। সেখানে বলা হয়েছে:

وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ»

অর্থাৎ: অপর এক ব্যক্তি যিনি জুনুবী হয়েছিলেন, তাকেও এক পাত্র পানি দিয়ে রাসূল (ﷺ) বললেন, এ পানি নিয়ে যাও ও গোসল কর।[৫৬১]

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যদি কেউ গোসলের জন্য ঝর্ণার নিচে বসে এবং তার সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছে যায়, তাহলে গোসলের নিয়ত করার ফলে তার গোসল বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

মহিলাদের জানাবাতের গোসল:

নারীর গোসলের নিয়ম সম্পূর্ণ পুরুষের গোসলের মতই। নারীদের খোপা খোলা জরুরি নয়। তবে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো আবশ্যক।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»

অর্থাৎ: উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি তো মাথার চুলের বেনী গেঁথে থাকি। সুতরাং জানাবাতের গোসলের সময় কি আমি তা খুলবো? তিনি বললেন, না। বরং তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার উপর তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢেলে পবিত্রতা অর্জন করবে।[৫৬২]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ[৫৬৩]، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحِلَّاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ»

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মাথার চুল কাপড়ে বাঁধা অবস্থায় গোসল করতাম। তখন আমাদের কেউ কেউ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় এবং কেউ কেউ ইহরাম বিহীন অবস্থায় রাসূল (ﷺ) এর সাথী ছিলাম।[৫৬৪]

গোসলের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে আমর মহিলাদের খোপা খোলার নির্দেশ দিলে আয়িশা (রা.) তা অস্বীকার করেন।[৫৬৫]

---

[৫৬১] সহীহ; বুখারী (৩৪৪)।

[৫৬২] সহীহ; এ হাদীসটি ইতিপূর্বে বহুবার আলোচিত হয়েছে।

[৫৬৩] الضِّمَادُ হল এমন বস্তু যা চুলে ব্যবহার করা হয়। ফলে চুল পরিপাটি হয় ও স্থির থকে। যেমন আঠা জাতীয় বস্তু। এর ফলে চুলের বেনী তৈরি হয়।

[৫৬৪] সহীহ; আবূ দাউদ (২৫৪), বাইহাক্বী (২/১৮২)।

[৫৬৫] সহীহ; মুসলিম (৩৩১), নাসাঈ (১/২০৩), ইবনু মাজাহ (৬০৪)।

www.waytojannah.com

হায়য ও নিফাসের কারণে মহিলাদের গোসল।[৫৬৬]

হায়য ও নিফাসের গোসল জানাবাতের গোসলের মতই। তবে এ ক্ষেত্রে বর্ধিত কিছু কাজ রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১। পানিসহ সাবান বা পরিষ্কারকারী অনুরূপ কিছু ব্যবহার করা:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا» فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِينَ بِهَا» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ،

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) আসমা (রা.) নাবী (ﷺ) কে ঋতুর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমরা কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর মাথায় পানি ঢালবে এবং উত্তমরূপে ঘষে ঘষে চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছাবে এবং সারা শরীরে পানি ঢেলে দিবে। পরে কস্তুরী মাখানো একটুকরা কাপড় দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করবে। এ কথা শুনে আসমা বললেন, কস্তুরী মাখানো বস্ত্র দ্বারা কিরূপে পবিত্রতা হাসিল করবো? তখন নাবী (ﷺ) বললেন, সুবহানাল্লাহ্! তুমি তা দিয়েই পবিত্রতা হাসিল করবে। আয়িশা (রা.) চুপিসারে তাকে বললেন: রক্ত চিহ্নিত স্থানে উক্ত (কস্তুরী মিশ্রিত) কাপড় দ্বারা ঘষে মুছে ফেলো।[৫৬৭]

২। খোপা খুলে দিতে হবে যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে:

এর প্রমাণ মহানাবী (ﷺ) এর পূর্বোল্লেখিত হাদীস।

ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا.....

অর্থাৎ: অতঃপর মাথায় পানি ঢালবে এবং উত্তমরূপে ঘষে ঘষে চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছাবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হায়যের গোসলের ক্ষেত্রে শুধু জানাবাতের গোসলের ন্যায় পানি প্রবাহিত করলেই চলবে না। বিশেষ করে একই হাদীসে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল (ﷺ) কে যখন জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি বলেন:

ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا

অর্থাৎ: 'অতঃপর মাথায় পানি ঢালবে এবং ঘষে চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছাবে'। এ অংশে دَلْكًا شَدِيدًا শব্দ উল্লেখ করা হয় নি। সুতরাং এর দ্বারা জানাবাতের গোসল ও হায়যের গোসলের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যায়।

---

[৫৬৬] আমার লিখা বই 'ফিকহুস সুন্নাহ লিন নিসা' (পৃ.৪৯), জামি' আহকামিন নিসা (১/১১৬- এবং তার পরবর্তী অংশ) কিছুটা বৃদ্ধির সাথে।

[৫৬৭] সহীহ: বুখারী (৩১৪), মুসলিম (৩৩২) শব্দগুলি মুসলিমের।

Contents

হায়যের গোসলে খোপা খোলার বিধানের ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম শাফেঈ মালিক ও আবূ হানীফা (রাহি.) এর মতে এটা মুস্তাহাব। ওয়াজিব নয়।[৫৬৮]

তাদের দলীলঃ

(১) হাদীসে সুস্পষ্টভাবে খোপা খোলা ওয়াজিবের কথা বলা হয় নি।

(২) মহানাবী (ﷺ) এর হাজ্জ পালনের ঘটনার বর্ণিত আয়িশা (রা.) এর হাদীসে তিনি বলেন:

«فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ»

আরাফার দিনে আমি ঋতুবতী ছিলাম। আমি মহানাবী (ﷺ) এর কাছে আমার অসুবিধার কথা বললাম। তিনি বললেন, তোমার উমরা ছেড়ে দাও, মাথার বেনী খুলে চুল আঁচড়াও, আর হাজ্জের ইহরাম বাঁধ।[৫৬৯]

তারা বলেনঃ এটা ছিল ইহরামের গোসল। হায়যের গোসল নয়। সুতরাং এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

(৩) আয়িশা (রা.) এর অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে তিনি ঋতুবতী থাকা অবস্থায় মহানাবী (ﷺ) তাকে বলেছিলেন- وَانْقُضِي شعرك واغسلى-অর্থাৎঃ মাথার বেনী খুলে গোসল কর।[৫৭০]

তারা বলেনঃ এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসের দিকেই ফিরানো হয়েছে। সুতরাং উভয়টি একই হাদীস। তারা "واغسلى" শব্দটিকে ত্রুটিযুক্ত মনে করে বলেন, এটা মূলতঃ ইহরামের গোসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(৪) গোসলের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে আমর মহিলাদের খোপা খোলার নির্দেশ দিলে আয়িশা (রা.) তা অস্বীকার করেন।

অপরদিকে ইমাম আহমাদ, হাসান, ত্বউস (রাহি.) এর মতে, হায়যের গোসলের সময় মহিলাদের খোপা খোলা ওয়াজিব। এর প্রমাণ পূর্বোল্লেখিত হাদীস সমূহ।

অত্র মাসআলায় এ মতামতটিই প্রাধান্য প্রাপ্ত। যেমনটি আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রাহি.)[৫৭১] এর সঠিক বিশ্লেষণ করেছেন এবং নিম্নোক্তভাবে অধিকাংশের মতামতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(১) তাদের উক্তি আয়িশা (রা.) এর হাদীসের ক্ষেত্রে যে, "তিনি হাজ্জে ছিলেন এবং তা ছিল ইহরাম অবস্থায়", তাদের এ কথা সঠিক। কিন্তু হায়যের গোসলকে অন্যান্য গোসলের চেয়ে বেশি তা'কীদ দেয়া হয়েছে। মহানাবী (ﷺ) হায়যের গোসলের ক্ষেত্রে অত্যধিক পবিত্রতার জন্য যতটুকু নির্দেশ দিয়েছেন অন্যান্য গোসলের ক্ষেত্রে ততটুকু দেন নি। ফলে তিনি হায়যের গোসলে খোপা খোলার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

[৫৬৮] আল মুগনী (১/২২৭), আল মুহাল্লা (২/৩৮), নাইলুল আওতার (১/৩১১) তাহযিবুস সুনান (১/২৯৩), আওনুল মা'বুদ সহ।

[৫৬৯] সহীহ; বুখারী (৩৭১), মুসলিম (১২১১)।

[৫৭০] এর সনদ সহীহ; ইবনু মাজাহ (৬৪১), দেখুন, আল ইরওয়া (১/১৬৭)।

[৫৭১] তাহযিবুস সুনান (১/২৯৩) আওনুল মা'বুদ সহ।

www.waytojannah.com

মূলতঃ খোপা খোলার মাধ্যমে হায়যের নাপাকী দূর হয় না। খোপা খোলা ওয়াজিব হওয়ার উপর সতর্ক করার জন্য তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে উত্তমভাবে নাপাকী দূর হয়।

(২) আয়িশা (রা.) এর হাদীস, যেখানে বলা হয়েছে তিনি ঋতুবতী থাকা অবস্থায় মহানাবী (ﷺ) তাকে বলেছিলেন: وَانْقُضِي شعرك واغسلي-অর্থাৎ: মাথার বেনী খুলে গোসল কর। এটা হাজ্জের ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীস নয়। এটা অনেকবার বর্ণিত হাদীস। বিশেষ করে এর সনদের রাবীগণ মুকসিরীন পর্যায়ের।

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর বাণীকে আয়িশা (রা.) যে অস্বীকার করেছিলেন, তার কারণ মূলতঃ ইবনে আমর জানাবাতের গোসলের ক্ষেত্রে মহিলাদের মাথার খোপা খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। যেমন আয়শা (রা.) বলেছিলেন:

يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ. أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ، «لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

আশ্চর্য লাগে! ইবনে আমরের মত লোক মেয়েদেরকে গোসলের সময় মাথার চুল খোলার আদেশ করেন। তাহলে তো তিনি তাদেরকে মাথার চুল মুড়ে ফেলার আদেশ দিতে পারেন। অথচ আমি এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একসাথে একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করেছি। এ সময় আমি আমার মাথায় তিন অঞ্জলির অধিক পানি ঢালিনি।[৫৭২]

প্রকৃতপক্ষে, আয়িশা রাসূল (ﷺ) এর সাথে জানাবাতের গোসল করেছিলেন, যেখানে উভয়ের অংশগ্রহণ ছিল। এটা হায়যের গোসল ছিল না। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, হায়য ও নিফাসের গোসলের সময় মহিলাদের মাথার খোপা খোলা ওয়াজিব। আর এটাই বেশি সতর্কতামূলক আমল। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

৩। মেশক বা অনুরূপ সুগন্ধি লাগিয়ে এক টুকরা তুলা দিয়ে রক্তের চিহ্ন মুছে ফেলবে:

হায়য ও নিফাসওয়ালী মহিলার জন্য মুস্তাহাব হলো, মেশক বা সুগন্ধিযুক্ত এক টুকরা ন্যাকড়া বা তুলা ব্যবহার করবে এবং লজ্জাস্থানে ধৌত করার পর সেখানে তা প্রবেশ করাবে। এভাবেই শরীরের যে সব স্থানে রক্ত লেগেছে, সে সব স্থান মুছে সুগন্ধযুক্ত করবে। এতে দুর্গন্ধযুক্ত জায়গাটা সুগন্ধিযুক্ত হবে। এটা পূর্বোল্লেখিত আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালনকারীনী মহিলারও এরূপ করার অনুমতি রয়েছে। যেমন শোক পালন কারীনীদের সুগন্ধি ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞায় বর্ণিত উম্মে আতিয়াহ এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

وَلَا تَطَّيَّبَ، وَلَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ

[৫৭২] সহীহ; মুসলিম (৩৩১), নাসাঈ (১/২০৩), ইবনু মাজাহ (৬০৪)।

Contents

আমরা সুরমা লাগাতাম না, সুগন্ধি ব্যবহার করতাম না ও ইয়ামানের তৈরি রঙ্গিন কাপড় ছাড়া অন্য কোন রঙ্গিন কাপড় ব্যবহার করতাম না। তবে হায়য থেকে পবিত্রতার গোসলে আযফারের খশবু মিশ্রিত বস্ত্র খণ্ড ব্যবহারের অনুমতি ছিল।[৫৭৩]

অত্র গ্রন্থের যথাস্থানে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশা আল্লাহ।

গোসলের পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুছাঃ

মহানাবী (ﷺ) এর গোসলের নিয়মাবলী সংক্রান্ত হাদীসে পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে :

"فناولته ثوبا (وفى رواية : المنديل) فلم يأخذه وهو ينفض يديه"

অর্থাৎ : আমি তাকে একটি কাপড় দিলাম (অপর বর্ণনায় কাপড়ের পরিবর্তে রুমাল বা গামছার কথা রয়েছে)। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তা গ্রহণ করলেন না। বরং দু'হাত দ্বারা শরীর মুছলেন।[৫৭৪]

অত্র হাদীস দ্বারা গোসলের পর শরীর মুছা অপছন্দীয় হওয়ার প্রমাণ দেয়া হয়। মূলতঃ এর দ্বারা এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৫৭৫] কারণ :

১। এটি এমন একটি ঘটনা, যা কয়েকটি বিষয়ের সম্ভাবনা রাখে-
হয়তো তা গ্রহণ না করার অন্য কোন কারণ ছিল যা শরীর মুছা অপছন্দনীয় হওয়ার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। বরং এ বিষয়টি গুরুত্বহীনতার সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা তিনি তাড়াতাড়ি করছিলেন অথবা আরও অন্যকিছু হতে পারে।

২। এ হাদীস আরও প্রমাণ করছে যে, রাসূল (ﷺ) এর শরীর মুছার অভ্যাস ছিল। যদি না থাকত তাহলে মাইমূনাহ (রা.) রুমাল বা গামছা নিয়ে আসতেন না।

৩। হাত দ্বারা পানি মুছার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি শরীর মুছা অপছন্দ করতেন না। কেননা হাত ও রুমাল উভয়টি দ্বারা শরীর মুছা যায়।

সারকথাঃ গোসলের পর শরীর মুছাতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহই ভাল জানেন।

গোসল সংক্রান্ত কতিপয় মাসায়েল

গোসলের পর ওযূ আবশ্যক নয়ঃ

যে ব্যক্তি শারঈ পন্থায় গোসল করবে এবং সালাত আদায়ের নিয়ত করবে তার জন্য পরে আর ওযূ করা আবশ্যক নয়। এমনকি যদিও সে গোসল করার সময় ওযূ নাও করে। কেননা, জানাবাত থেকে পবিত্রতা অর্জন করলে ক্ষুদ্রতর নাপাকী থেকেও পবিত্রতা অর্জন করিয়ে দেয়। এর কারণ হলো, জানাবাতের বাধা

---

[৫৭৩] সহীহ; বুখারী (৩১৩)।
[৫৭৪] সহীহ; ইতিপূর্বে বহুবার এসেছে।
[৫৭৫] আল ফাতহ (১/৪৩২), দেখুন, আল মাজমূ' (১/৪৫৯)।

www.waytojannah.com

সমূহ ক্ষুদ্রতম নাপাকির বাধার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং কম সংখ্যকের বিধান বেশি সংখ্যকের বিধানের আওতাধীন হয়ে যায়।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ»

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূল (ﷺ) জানাবাতের গোসলের পর আর ওযূ করতেন না।[৫৭৬]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে:

-يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ، وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ-

তিনি গোসল করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আমি তাকে গোসলের পর নতুনভাবে ওযূ করতে দেখি নি।[৫৭৭]

عن بن عمر كان يقول إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل

ইবনে উমার বলেন, গোসল সম্পাদন করে যদি তোমার লিঙ্গ স্পর্শ না কর, তাহলে গোসলের চেয়ে পরিপূর্ণ ওযূ আর কি হতে পারে?[৫৭৮]

আমার বক্তব্য: এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়, এক দলের মতে, জানাবাতের গোসলকারীর জন্য ক্ষুদ্রতর নাপাকি দূর করার নিয়ত করা ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশের অভিমত। ইবনে তাইমিয়াহ এই অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন।[৫৭৯]

হাম্বালীদের মতে, যদি দু'টি নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করে, তাহলে উভয়টির জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি শুধু গোসলের জন্য নিয়ত করে, তাহলে যে নিয়ত করেছে শুধু তাই প্রযোজ্য হবে।[৫৮০]

যদি গোসলের সময় দু'টি ওয়াজিব একত্রিত হয়:

যেমন- হায়য ও জানাবাতের গোসল অথবা জানাবাত ও জুম'আর গোসল, তাহলে শুধু উভয় ক্ষেত্রে একটি গোসলই যথেষ্ট হবে, যদি উভয়টির নিয়ত এক সঙ্গে করা হয়। এটা অধিকাংশ বিদ্বানদের অভিমত।[৫৮১]

যদি কোন মহিলা জুনুবী হয় অতঃপর গোসলের পূর্বে হায়য হয়:

এ ক্ষেত্রে একদল বিদ্বানদের অভিমত হলো: তার জন্য জানাবাতের গোসল আবশ্যক নয়। বরং যখন সে হায়য থেকে পবিত্র হবে তখন জানাবাত ও হায়য উভয়টির জন্য নিয়ত করে একবার গোসল করা তার

---

[৫৭৬] সহীহ লিগাইরিহী; তিরমিযী (১০৭), নাসাঈ (১/১৩৭), ইবনু মাজাহ (৫৭৯)।

[৫৭৭] সহীহ লিগাইরিহী; আবূ দাউদ (২৫০), আহমাদ (৬/১১৯)।

[৫৭৮] এর সনদ সহীহ; এ হাদীসটি আব্দুর রাযযাক তার আল-মুসান্নাফ (১০৩৯) এ উল্লেখ করেছেন।

[৫৭৯] আল মাসবূত্ব (১/৪৪), আশ-শারহুস সাগীর (১/৬৫), আল-উম্ম (১/৩৬) মাজমূ' আল-ফাতাওয়া (২১/৩৯৭), আল-মুহাল্লা (২/৪৪)।

[৫৮০] আল-ইদ্দাতু শারহিল উমদাহ (৪৮ পৃ.)।

[৫৮১] আল মুগনী (১/২৯২), বরং 'রহমাতুল উম্মাহ্ ফি ইখতিলাফিল আয়িম্মা' গ্রন্থে এটাকে ইজমা সাব্যস্ত করা হয়েছে (পৃ:৫১)। ইবনে হাযম তার মুহাল্লা গ্রন্থে এর বিপরীত মত পেশ করায় এটা বাতিল হয়ে গেছে। আর এ কথার সঙ্গে আলবনী 'তামামুল মিন্নাহ' গ্রন্থে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

Contents

জন্য আবশ্যক। এটা ইমাম আহমাদ (রাহি.) এর মাযহাব।[৫৮২] আর কতিপয় বিদ্বানের মতে, জানাবাতের জন্য গোসল করা আবশ্যক। অতঃপর যখন হায়য থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে তখন হায়যের জন্য গোসল করবে। এটা আত্বা, নাখঈ ও হাসান (রাহি.) এর অভিমত।

আর কতিপয় বিদ্বান বলেন- জানাবাতের কারণে শুধু লজ্জাস্থান ধৌত করা আবশ্যক। অতঃপর যখন হায়য থেকে পবিত্র হবে তখন গোসল করবে। শেষে উল্লেখিত দু'টি অভিমতের ক্ষেত্রে কোন দলীল নেই। তাই প্রথম অভিমতটিই সঠিক।

তবে যদি সে জানাবাতের জন্য গোসল করার ইচ্ছা করে অথবা তার লজ্জাস্থান ধৌত করে অতঃপর হায়য থেকে পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে, তাহলে সে করতে পারে, এতে কোন বাধা নেই। এতে কোন সমস্যাও হবে না। মূলতঃ এটা তার জন্য আবশ্যক নয়।

মহিলার গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষের গোসল করা বৈধঃ

এ সংক্রান্ত আলোচনা "পানির বিধান" নামক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একত্রে গোসল করা বৈধঃ

এ সময় একে অপরের গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকানো বৈধ। এ ক্ষেত্রে অপছন্দের কিছু নেই।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي) كِلَانَا جُنُبٌ -

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি ও নাবী (ﷺ) জানাবাত অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম । তিনি আমার চাইতে এত দ্রুত পানি তুলে নিতেন যে, আমি শেষ পর্যন্ত বলতাম, আমার জন্য কিছু পানি রাখতে হবে তো।[৫৮৩]

জনসমক্ষে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা বৈধ নয়ঃ

তবে যদি আড়ালে হয়, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। এ ব্যাপারে পূর্বে উল্লেখিত মাইমূনাহ বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ হয়েছে-

....وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلًا وَسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ

অর্থাৎঃ আমি রাসূল (ﷺ)এর গোসলের পানি রেখে পর্দা করে দিলাম, তিনি পানি দিয়ে হাত ধুলেন....। মহানাবী (ﷺ) থেকে সাব্যস্ত আছে যে, মূসা (عليه السلام)[৫৮৪] ও আইয়ূব (عليه السلام) উলঙ্গ হয়ে গোসল করেছেন।[৫৮৫] এটা ছিল নির্জন স্থানে।

গোসল চলাকালীন সময়ে যে অপবিত্র হবেঃ

---

[৫৮২] সহীহ; বুখারী (২৯৯), মুসলিম (৩২১)।
[৫৮৩] পূর্বে দেখুন।
[৫৮৪] সহীহ; বুখারী (২৭৮), মুসলিম (৩৩৯)।
[৫৮৫] সহীহ; বুখারী (১৭৯)।

www.waytojannah.com

জুনুবী ব্যক্তি যদি গোসল পূর্ণ করার পূর্বেই অপবিত্র হয়, তাহলে সে গোসল পূর্ণ করে নিবে। তাকে পুনরায় শুরু থেকে গোসল করতে হবে না। কেননা নাপাকী গোসলকে বাধা দিতে পারে না এবং এর অস্তিত্বে কোন প্রকার প্রভাব ফেলতে পারে না, যেমনটি হাদাস ব্যতীত অন্য কিছুতে ফেলতে পারে। এ ক্ষেত্রে শুধু তার জন্য ওযূ করাই যথেষ্ট। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত। এদের মধ্যে আত্বা ও সাওরী উল্লেখযোগ্য। এটা ইমাম শাফেঈ এর মাযহাব এর সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ। ইবনে কুদামা এবং ইবনে মুনযির এ মতটিকে পছন্দ করেছেন।[৫৮৬]

জানাবাত সংক্রান্ত মাসায়েল

জুনুবী ব্যক্তির জন্য দেরীতে গোসল করা বৈধ:

জুনুবী হওয়ার সাথে সাথেই গোসল করা ওয়াজিব নয়। যদিও দ্রুত গোসল করা উত্তম ও অত্যধিক পবিত্রতার পরিচায়ক।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ» قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ»

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তাঁর সঙ্গে মদীনার কোন এক পথে নাবী (ﷺ) এর দেখা হলো। আবূ হুরাইরা (রাঃ) তখন জানাবাতের অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নিজেকে নাপাক মনে করে সরে পড়লাম। পরে আবূ হুরাইরা (রাঃ) গোসল করে এলেন। পুনরায় সাক্ষাত হলে রাসুলুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন: হে আবূ হুরাইরা! কোথায় ছিলে? আবূ হুরাইরা বললেন, আমি জানাবাতের অবস্থায় আপনার সঙ্গে বসা সামীচীন মনে করি নি। তিনি বললেন: সুবহানাল্লাহ! মু'মিন নাপাক হয় না।[৫৮৭]

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ «يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ»

আনাস ইবন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নাবী (ﷺ) একই রাতে পর্যায়ক্রমে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।[৫৮৮]

তদপুরি, জানাবাতের গোসল দ্রুত করা সালাতের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মর্যাদা পাওয়ার মাধ্যম। মহানাবী (ﷺ) এরূপ ক্ষেত্রে গোসল করার পূর্বে খুব কমই ঘুমাতেন।

এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

জুনুবী ব্যক্তির জন্য গোসলের পূর্বে ঘুমানো জায়েয আছে, যদি ওযূ করে:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ»

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) যখন জুনুবী অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি তাঁর লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলে সালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন।[৫৮৯]

---

[৫৮৬] আল মুগনী (১/২৯০), আল আওসাত্ব (২/১১২)।

[৫৮৭] সহীহ; বুখারী (২৮৩), মুসলিম (৩৭১)।

[৫৮৮] সহীহ; বুখারী (২৮৪), মুসলিম (৩০৯)।

Contents

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: " كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً "

আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ কাইস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়িশা (রা.) কে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বিতর সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে এ প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণনা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম: নাপাক অবস্থায় তিনি কি করতেন? তিনি কি ঘুমানোর পূর্বে গোসল করে নিতেন? না কি গোসল না করে ঘুমাতেন? তিনি বললেন, তিনি উভয়টিই করতেন। কখনও তিনি গোসল করে ঘুমাতেন আবার কখনও শুধু ওযূ করে ঘুমিয়ে পড়তেন। আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস বলেন, একথা শুনে আমি বলে উঠলাম আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহ্‌র সব প্রশংসা যিনি আমাদের জন্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহজতা প্রদান করেছেন।[৫৯০]

একদা উমার বিন খাত্তাব (رضي الله عنه) সহবাসের কারণে নাপাক হলে করণীয় কি, এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল (ﷺ) জবাবে বলেন: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ»-তুমি ওযূ কর এবং তোমার লজ্জাস্থান ধৌত কর। অতঃপর ঘুমাও।[৫৯১]

জুনুবী ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত ও মাসহাফ (পবিত্র গ্রন্থ) স্পর্শ করাতে কোন ক্ষতি নেই:

এ সংক্রান্ত আলোচনা "ওযূ" অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সেখানে দেখে নিন।

হায়যওয়ালী মহিলা ও জুনুবী ব্যক্তির জন্য মাসজিদে প্রবেশ ও সেখানে অবস্থান করা বৈধ কিনা?

জাহেরী মাযহাব ব্যতীত অধিকাংশ বিদ্বানের চারজন ইমামসহ অন্যান্যদের মতে, হায়য, নিফাস ও জুনুবী অবস্থায় মাসজিদে অবস্থান করা জায়েয। এটা সাহাবাদের মধ্য হতে ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে।[৫৯২]

যারা এটা নিষেধ করেন তাদের দলীল নিম্নরূপ-

১। আল্লাহর বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর। *(সূরা নিসা-৪৩)*

---

[৫৮৯] সহীহ; বুখারী (২৮৮), মুসলিম (৩০৫)।

[৫৯০] সহীহ; মুসলিম (৩০৭)।

[৫৯১] সহীহ; বুখারী (২৯০), মুসলিম (৩০৬)।

[৫৯২] আল-মাজমূ' (২/১৮৪), আল মুগনী (১/১৪৫), 'আললুবাবু শারহিল কিতাব' (১/৪৩), ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ মসজিদে অবস্থান ছাড়া অতিক্রম করা বৈধ মনে করেন, আল-মুহাল্লা (২/১৮৩)।

www.waytojannah.com

তারা বলেন এখানে সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সালাতের স্থান তথা মাসজিদ। সুতরাং অত্র আয়াতে জুনুবী ব্যক্তিকে মাসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে মুসাফির অবস্থায় হলে সেটা ভিন্ন কথা। এরপর তারা হায়য ও নিফাসকে জানাবাতের উপর কিয়াস করেছেন।

যারা মাসজিদে প্রবেশ করা বৈধ মনে করেন, তারা এর উত্তর দিয়ে বলেন- অত্র আয়াতের যে অর্থ করা হয়েছে তা সালাফদের একটি তা'বীল। অন্য একটি তা'বীল অনুযায়ী সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য মূল ইবাদাত। এর দ্বারা মাসজিদ উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা জুনুবী অবস্থায় গোসল করা ছাড়া সালাতে উপস্থিত হবে না, তবে যদি সে মুসাফির হয় তাহলে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে। এ জন্য আল্লাহ এর পরেই বলেছেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব–পায়খানা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ কর, তবে যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম কর। *(সূরা নিসা-৪৩, সূরা মায়িদা- ৬)*

এরপর হায়যকে জানাবাতের সাথে কিয়াস করার ব্যাপারেও সমালোচনা লক্ষ করা যায়, কেননা হায়য হলো, ওযর সংক্রান্ত বিষয়। পবিত্র হওয়ার পূর্বে এর জন্য গোসল করা সম্ভব নয় এবং কোন মহিলা হায়য চলাকালীন সময় হায়যের অপবিত্রতা দূর করতেও সক্ষম নয়। কিন্তু জানাবাত এর ব্যতিক্রম। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছামত গোসল করা সম্ভব।

২। জুসরাহ বিনতে দুজাজাহ আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ -আমি ঋতুবতী ও জুনুবী ব্যক্তির জন্য মাসজিদে প্রবেশ করা হালাল মনে করি না।[৫৯৩]

যারা বৈধ মনে করেন, তারা এর উত্তর দিয়ে বলেন, হাদীসটি যঈফ। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে না। কেননা জুসরাহ'র উপর কেন্দ্র করাটা তাফার্‌রুদের সম্ভাবনা রাখে না।

৩। উম্মে আতিয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানাবী (ﷺ) নির্দেশ দিয়ে বলেন:

«لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى»

অর্থাৎ: যুবতী, পর্দানশীল ও ঋতুবতী মহিলারা বের হবে। অবশ্য ঋতুবতী মহিলা মুসাল্লা থেকে দূরে থাকবে। তারা মুসলিমদের কল্যাণ ও দু'আয় অংশ গ্রহণ করবে।[৫৯৪]

যারা মাসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ মনে করেন, তারা বলেন: যদি ঈদের মুসাল্লার (ঈদগাহের) ক্ষেত্রে এরূপ নিষেধাজ্ঞা হয়, তাহলে মাসজিদের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি নিষেধ হবে।

যারা বৈধ মনে করেন, তাদের জবাব হলো: হাদীসে উল্লেখিত মুসাল্লা দ্বারা সালাত উদ্দেশ্য। কেননা মহানাবী (ﷺ) এবং তার সাহাবীগণ ঈদের সালাত খোলা ময়দানে আদায় করতেন। মাসজিদে করতেন

---

[৫৯৩] যঈফ; আবূ দাউদ (২৩২), বাইহাক্বী (২/৪৪২), ইবনু খুযায়মাহ (২/২৮৪), দেখুন,আল -ইরওয়া (১৯৩)।

[৫৯৪] সহীহ; বুখারী (৩২৪), মুসলিম (৮৯০)।

Contents

না। আর পৃথিবীর সমস্ত স্থান হলো মাসজিদ। সুতরাং মাসজিদের কিছু অংশকে নিষেধাজ্ঞার সাথে নির্দিষ্ট করা আর কিছু অংশ বাদ দেয়া বৈধ হতে পারে না।

উপরন্তু এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে স্বয়ং صَلَاة শব্দে বর্ণিত হয়েছে- " فَأَمَّا الْحَيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ " অর্থাৎ: ঋতুবতী মহিলা সালাত থেকে দূরে থাকবে।

(8) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي المَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ»

৪। আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় রাসূল (ﷺ) আমার দিকে তার মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় তার চুল আঁচড়িয়ে দিতাম।[৫৯৫]

যারা মাসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ বলে মনে করেন, তারা বলেন: অত্র হাদীসে আয়িশা (রা.) কে মাসজিদে প্রবেশ করে রাসূলের (ﷺ) মাথা আঁচড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তিনি ছিলেন ঋতুবতী।

যারা বৈধ মনে করেন, তারা এর জবাব দিয়ে বলেন: তারা যে প্রমাণটি দিচ্ছেন, তা স্পষ্ট নয়। কেননা আয়িশা (রা.) মাসজিদে না যাওয়ার পেছনে হায়য ছাড়া অন্য কোন কারণও থাকতে পারে। হয়তো বা ব্যাপারটা এরূপ ছিল যে, মাসজিদে অনেক পুরুষ লোক ছিল অথবা অনুরূপ কিছু কারণ ছিল।

হায়য ও জুনুবী অবস্থায় যারা মাসজিদে প্রবেশ করা বৈধ মনে করেন তারা এছাড়াও আরও প্রমাণ দিয়ে থাকেন, নিম্নে তা পেশ করা হলো:

১। যেহেতু এটা নিষেধের ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনা নেই তাই মূলতঃ এটা বৈধ। প্রত্যেক মুসলমান যেখানেই সালাতের সময় হবে সেখানেই সালাত আদায় করতে পারে। যমিনটা মাসজিদ স্বরূপ।

২। মুশরিকরা মাসজিদে প্রবেশ করেছিল বলে প্রমাণ রয়েছে এবং মহানাবী (ﷺ) তাদেরকে মাসজিদে বন্দি করে রেখেছিলেন এরও প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

অর্থাৎ: নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক, সুতরাং তারা যেন এ বছর মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।

অপরপক্ষে মুসলিম ব্যক্তি সর্বাবস্থায় পবিত্র থাকে। মহানাবী (ﷺ) বলেন, "إن المسلم لا ينجس " 'মুসলিম কখনও অপবিত্র হয় না'।[৫৯৬] সুতরাং কিভাবে মুসলিমকে মাসজিদে প্রবেশে নিষেধ করা হয়, আর কাফেরের প্রবেশকে বৈধ মনে করা হয়?!

যারা নিষেধ মনে করেন তাদের জবাব হলো: শরীয়াত মুসলমান ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছে। আর শরীয়াত দলীল দ্বারা জুনুবী ও ঋতুবতীকে মাসজিদে অবস্থান করা হারাম করেছে। অপরদিকে কাফিরকে মাসজিদে বন্দি রাখার ব্যাপারেও দলীল সাব্যস্ত রয়েছে। সুতরাং শরীয়াত যেহেতু

---

[৫৯৫] সহীহ; বুখারী (২০২৯) ইতেকাফ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

[৫৯৬] সহীহ; কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

www.waytojannah.com

উভয়ের মাঝে দলীল দ্বারা পার্থক্য করে দিয়েছে, তাই কাফির মুসলিমের মাঝে সমতা আনয়ন করা বৈধ নয়। এরূপ করা قياس مع الناس (আয়াতের উপর অনুমান) এর শামিল যা ঠিক নয়।

আমি বলি: যদি কুরআন দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় তাহলে এটা ঠিক আছে। যেমনটি এটা স্পষ্ট।

(৩) عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ العَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا، «فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَتْ» ، قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي المَسْجِدِ

৩। আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, কোন আরব গোত্রের একটা কালো দাসী ছিল। তারা তাকে আযাদ করে দিল। এরপর সে রাসূল (ﷺ) এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। তার জন্য মাসজিদে একটা তাবু অথবা ছাপড়া করে দেয়া হয়েছিল।[৫৯৭]

যারা বৈধ মনে করেন তারা বলেন: এই মহিলাটি মাসজিদে নাববীতে অবস্থান করত। আর যেহেতু সে নারী, তাই এ অবস্থায় তার হায়যও হয়েছিল। অথচ মহানাবী তাকে মাসজিদে অবস্থান করতে নিষেধ করেন নি এবং হায়য অবস্থায় তাকে মাসজিদ থেকে দূরে থাকতেও বলেন নি।

যারা বৈধ মনে করেন না তাদের জবাব হলো: বিষয়টা স্পষ্ট যে, এই মহিলাটির কোন পরিবার ছিল না এবং মাসজিদ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থলও ছিল না। সুতরাং বাধ্য হয়েই তিনি মাসজিদে অবস্থান করেছেন। তাই এর উপর অন্যকিছুকে কিয়াস করা যায় না। এটি নির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা। সুতরাং নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে এর দ্বারা স্পষ্ট দলীল পেশ করা যায় না।

৪। আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে এক মহিলার ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, মাসজিদ ঝাড়ু দিত। পরে সে মারা যায়। ফলে রাসূল (ﷺ) তার প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেন।[৫৯৮]

এই মহিলাটি কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সর্বাবস্থায় মাসজিদ ঝাড়ু দিত। অথচ মহানাবী (ﷺ) তাকে হায়য অবস্থায় মাসজিদ থেকে দূরে থাকতে বলেন নি।

৫। রাসূল (ﷺ) এর যামানায় মাসজিদে অবস্থানরত আহলে সুফ্ফাদের ব্যাপারে বর্ণিত আবূ হুরাইরার এর হাদীসটি এর প্রমাণ।[৫৯৯]

যারা বৈধ মনে করেন না তারা এর দলীলের জবাবে বলেন: আহলে সুফ্ফাদের কোন পরিবার ছিল না এবং তাদের কোন ধনসম্পদও ছিল না, যেমনটি হাদীসের বাণী দ্বারা সুস্পষ্ট।

৬। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে-

أَنَّ عَبْد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، « كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ »

অর্থাৎ: আব্দুল্লাহ বিন উমার (رضي الله عنه) মাসজিদে নাববীতে ঘুমাতেন। তিনি ছিলেন অবিবাহিত যুবক। তার কোন পরিবার ছিল না।[৬০০]

---

[৫৯৭] সহীহ; বুখারী (৪৩৯)।

[৫৯৮] সহীহ; বুখারী (৪৫৮), মুসলিম (৯৫৬)। এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে যে, সে মহিলা ছিল না কি পুরুষ ছিল? কিন্তু ইবনে খুযাইমা ও বায়হাক্বীতে (৪/৪৮) হাসান সনদে বর্ণিত শব্দের মাধ্যমে মহিলা হওয়ার ব্যাপারে সমর্থন পাওয়া যায়।

[৫৯৯] সহীহ; বুখারী (৬৪৫২), তিরমিযী (৪৭৯)।

[৬০০] সহীহ; বুখারী (৩৫৩০), মুসলিম (২৪৭৯)।

Contents

আর যুবকের অধিক স্বপ্নদোষ হয়। অথচ মহানাবী (ﷺ) তাকে জুনুবী অবস্থায় মাসজিদে অবস্থান করতে নিষেধ করেন নি।

যারা বৈধ মনে করেন না তাদের জবাব হলো: এখানে এ কথা উল্লেখ নেই যে, মহানাবী (ﷺ) এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন কিংবা তিনি এর স্বীকৃতি দিয়েছেন!!

যারা বৈধ মনে করেন তারা এর দলীলের জবাবে বলেন: যদিও এটা মহানাবী (ﷺ) এর কাছে গোপন থাকে তবুও আল্লাহর কাছে এটা গোপন থাকবে না। ওহীর মাধ্যমে তার কাছে এটা জানিয়ে দেয়া উচিত হত। ফলে তিনি নিষেধ করে দিতেন।

এর জবাবে বলা হয়ে থাকে, সাহাবাদের প্রত্যেকটি ভুলের জন্য শিক্ষা স্বরূপ ওহী অবতীর্ণ করা আবশ্যক নয়। মহানাবী (ﷺ) এর যামানায় অনেক ঘটনেই তাদের না জানার কারণে কোন মাসআলার ক্ষেত্রে ভিন্নমুখী মতামত পরিলক্ষিত হয়েছে।

৭। আয়িশা (রা.) যখন হাজ্জ পালনরত অবস্থায় ঋতুবতী হয়েছিলেন তখন রাসূল (ﷺ) তার জন্য হাজ্জের সকল কার্যাবলী পালন করা বৈধ করে দিয়েছিলেন। বাইতুল্লাহ ত্বওয়াফ ছাড়া কোন কিছুই করতে নিষেধ করেন নি।[৬০১] সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণ হলো যে, তার মাসজিদে প্রবেশ করা বৈধ ছিল। কেননা এটি ছিল তার হাজ্জের অংশ।

যারা বৈধ মনে করেন না তাদের জবাব হলো: মূলতঃ রাসূল (ﷺ) আয়িশাকে এটা জানানোর ইচ্ছা করেছিলেন যে, ঋতুবতী মহিলার জন্য ত্বওয়াফ ব্যতীত হাজ্জের অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা বৈধ। আর মাসজিদে প্রবেশের বিধানটা তার জানেই ছিল যে, এটা নিষিদ্ধ। যেহেতু তিনিই হাদীসের বর্ণনা কারী। তদুপুরি রাসূল (ﷺ) তাকে ঋতুবতী অবস্থায় সালাত আদায় করতেও নিষেধ করেন নি। অথচ সকল হাজীগণ সালাত আদায় করেন। তাহলে কি বলা যাবে যে, তিনি হায়য অবস্থায় সালাত আদায় করেছেন?!!

আমি মনে করি: এটা যথপযুক্ত জবাব। নিষেধাজ্ঞার হাদীস সাব্যস্ত হলে ভিন্ন কথা ছিল। কিন্তু সে হাদীস তো দুর্বল।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» ، قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»

৮। আয়িশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইতিকাফরত অবস্থায় আমাকে বললেন: মাসজিদ থেকে আমাকে চাটাইটি দাও। তিনি (আয়িশা) বলেন, আমি বললাম: আমি তো এখন ঋতুবতী। জবাবে তিনি বললেন, ঋতু তো তোমার হাতে লেগে নেই।[৬০২]

---

[৬০১] সহীহ; বুখারী (১৬৫০), এ সম্পর্কে 'হাজ্জ' অধ্যায়ে আলোচনা আসবে।

[৬০২] এর সনদ সহীহ; মুসলিম (২৯৮), আবূ দাউদ (২৬১), তিরমিযী (১৩৪), নাসাঈ (২/১৯২)।

www.waytojannah.com

এর দ্বারা বুঝা যায়, চাটাইটি মাসজিদে ছিল। অতঃপর চাটাইটি নেয়ার জন্য তিনি তাকে মাসজিদে প্রবেশ করতে বাধ্য করলেন।

যারা বৈধ মনে করেন না তারা এর জবাবে বলেন: এ হাদীসটি অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে:

بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ: نَاوِلِينِي الثَّوْبَ " فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»

একদা রাসূল (ﷺ) মাসজিদে অবস্থানরত অবস্থায় আয়িশা (রা.) কে বললেন, হে আয়িশা! আমাকে কাপড়টি হাত বাড়িয়ে দাও। তিনি (আয়িশা) বলেন, আমি বললাম: আমি তো এখন ঋতুবতী। জবাবে তিনি বললেন, ঋতু তো তোমার হাতে লেগে নেই।[৬০৩]

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, রাসূল (ﷺ) ছিলেন মাসজিদে আর আয়িশা (রা.) ও চাটাইটি ছিল মাসজিদের বাইরে। ফলে রাসূল (ﷺ) তা হাত বাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আয়িশা (রা.) সরাসরি মাসজিদে প্রবেশ করেন নি।

আমার বক্তব্য: এ হাদীসটি সম্ভবনাময় অর্থ দিচ্ছে। তাই বিরুদ্ধবাদীদের দলীল থেকে তা বাতিল করা উচিত।

رَأَيْت رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ إذَا تَوَضَّئُوا وُضُوءَ الصَّلاةِ .

৯। আত্বা বিন ইয়াসারের আসারে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি রাসূল (ﷺ) এর সাহাবাদের জুনুবী অবস্থায় সালাতের ওযূ করে মাসজিদে বসে থাকতে দেখেছি।[৬০৪]

আমার বক্তব্য: আমি এ মাসআলাটির ব্যাপারে যতটুক বুঝেছি তা হলো: মাসজিদে জুনুবী ব্যক্তি, হায়যওয়ালী ও নিফাসওয়ালীর অবস্থান করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাকারীগণ ও বৈধকারীদের দলীলগুলো উপস্থাপন করার পর এ কথাই স্পষ্ট হচ্ছে যে, নিষেধাজ্ঞাকারীগণের দলীলসমূহ অবৈধ হওয়াকে খণ্ডন করার ক্ষেত্রে উন্নিত হতে পারে নি। আল্লাহই সঠিক জানেন।

---

[৬০৩] এর সনদ সহীহ; মুসলিম (২৯৯), নাসাঈ (১/১৯২)।

[৬০৪] এর সনদ হাসান পর্যায়ের; সাঈদ ইবনে মানসূর তার সুনানে (৪/১২৭৫), উল্লেখ করেছেন।

Contents

তায়াম্মুম (تيمم)[৬০৫]

تيمم (তায়াম্মুম) এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:[৬০৬]

তায়াম্মুম এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা বা সংকল্প করা। যেমন বলা হয়: " تيممت فلانا – يممته – تأممته – "أممته এদের অর্থ- قصدته -তথা আমি তার ইচ্ছা করেছি।

শরীভাষায়: ওযূ ও গোসলকে বৈধ করে এমন বৈধতার জন্য পবিত্রতার নিমিত্তে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের মাটির উপর হাত বুলানোর ইচ্ছা করাকে তায়াম্মুম বলা হয়।

আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾

অর্থাৎ: নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। *(সূরা বাকারাহ- ২৬৭)*

শরীয়াতে তায়াম্মুমের বৈধতা

শরীয়াতে তায়াম্মুমের প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত:

১। কুরআন হতে দলীল: আল্লাহর বাণী:

﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

অর্থাৎ: যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। *(সূরা নিসা-৪৩)*

২। সুন্নাহ হতে দলীল:

মহানাবী (ﷺ) বলেন:

وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ

অর্থাৎ: পৃথিবীর সমস্ত জমিন আমার জন্য ও আমার উম্মতের জন্য মাসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি যেখানেই সালাতের সময় পাবে সে স্থানই তার জন্য মাসজিদ ও পবিত্রতার মাধ্যম হবে।[৬০৭]

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»

ইমরান ইব্ন হুসায়ন আল-খুযা'ঈ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে জামা'আতে সালাত আদায় না করে পৃথক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন: হে অমুক! তুমি

---

[৬০৫] এ অধ্যায়টি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে আমি আমার ঘণিষ্ঠ বন্ধু তারিক সালিম (আল্লাহ তাকে সাওয়াব দান করুন) এর শরীয়া বিষয়ে মাষ্টার্স থিসিস- থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি।

[৬০৬] আল মাজমূ' (২/২৩৮), আল-মুগনী (১/১৪৮), আল মাসবূত্ব (১/১০৬)।

[৬০৭] হাসান; আহমাদ (২/২২২) আমর বিন শুআ'ইব তার পিতা হতে তিনি তার দাদার সূত্রে।

www.waytojannah.com

জামা'আতে সালাত আদায় করলে না কেন? লোকটি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার গোসলের প্রয়োজন হয়েছিল কিন্তু পানি নেই। তিনি বললেন: তুমি পবিত্র মাটির ব্যবহার (তায়াম্মুম) করবে। তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট। এরপর যখন পানি পাওয়া গেল, তখন রাসূল (ﷺ) এ ব্যক্তিটিকে পানির পাত্র দিয়ে বললেন, "এ দ্বারা গোসল কর"। [৬০৮]

৩। ইজমা হতে দলীল:

ইবনে কুদামা "মুগনী" গ্রন্থে (১/১৪৮) বলেন, মুসলিম বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে, তায়াম্মুম বৈধ।

যে সকল অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ:

পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে ওযূ ও গোসলের বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুম করতে হয়। ইমাম নাববী বলেন: এটা আমাদের মাযহাব। সকল সাহাবা, তাবেঈ ও তাদের পরবর্তী বিদ্বানগণ এ মতামতই দিয়েছেন। তবে সাহাবী উমার বিন খাত্তাব (رضي الله عنه) ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) [৬০৯] এবং তাবেঈ ইবরাহীম নাখঈ বিপরীত মত পোষণ করেছেন। তারা তায়াম্মুম করতে নিষেধ করেন (অর্থাৎ তারা বড় নাপাকীর ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে নিষেধ করেন)। ইবনে সিবাগ এবং অনেকেই বলেন যে, কথিত আছে, উমার বিন খাত্তাব (رضي الله عنه) ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) এ মতামত থেকে ফিরে এসেছেন। আমাদের অনুসারীবৃন্দ ও অধিকাংশ বিদ্বান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন-

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

অর্থাৎ: যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর *(সূরা মায়িদা-৬)* থেকে وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا অর্থাৎ: তোমরা জুনুবী হলে পবিত্রতা অর্জন কর *(সূরা মায়িদা-৬)* পর্যন্ত। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا -অর্থাৎ: তোমরা পানি না পেলে তায়াম্মুম কর *(সূরা মায়িদা-৬)* । এ অংশটুকু পূর্বের সকল প্রকার হাদাস (নাপাকী) ও জুনুবীর দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। [৬১০]

আমি মনে করি: এরপরও বড় নাপাকীর জন্য তায়াম্মুম করার ক্ষেত্রে অন্য দলীলও রয়েছে। আল্লাহর বাণী:

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

অর্থাৎ: যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর *(সূরা মায়িদা-৬)* ।

বিদ্বানদের এক দলের মতে: অত্র আয়াতে "الملامسة" (স্পর্শ) দ্বারা উদ্দেশ্য "الجماع" বা সহবাস। এদের মধ্যে ইবনে আব্বাস অন্যতম। [৬১১]

---

[৬০৮] সহীহ; বুখারী (৩৪৮), মুসলিম (১৫৩৫)।
[৬০৯] বুখারী (৩৪৫), মুসলিম (৭৯৬)।
[৬১০] আল মাজমূ' (২/২৪০)।
[৬১১] তাফসীরে ত্বাবারী (৯৬৮৩), সহীহ সনদে।

Contents

এরপরও জানাবাতের কারণে তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার প্রমাণে মহানাবী (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে-

(১) পূর্বে উল্লেখিত ইমরান বিন হুসাইন এর হাদীস। এ হাদীসে মহানাবী (ﷺ) এক জুনুবী ব্যক্তিকে বলেন, «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» অর্থাৎ: তুমি পবিত্র মাটি ব্যবহার (তায়াম্মুম) করবে। তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।[৬১২]

قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

(২) অর্থাৎ: আম্মার বিন ইয়াসার (رضي الله عنه), উমার বিন খাত্তাব (رضي الله عنه)কে বলেন: আপনার কি স্মরণ নেই? আমি ও আপনি দু'জনে এক সফরে ছিলাম। দু'জনের গোসলের প্রয়োজন দেখা দিলে আপনি তো সালাত আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করলাম। তারপর আমি ঘটনাটি নাবী (ﷺ) এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন নাবী (ﷺ) বললেন: তোমার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট ছিল। এ বলে নাবী (ﷺ) দু'হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ফুঁ দিয়ে তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মাসাহ করলেন।[৬১৩]

পানি পাওয়া না গেলে মৃত ব্যক্তিকে তায়াম্মুম করানো যাবে কিনা?

পানি পাওয়া না গেলে জীবিত ব্যক্তির ন্যায় মৃত ব্যক্তিকেও তায়াম্মুম করানো যাবে। কেননা তাকে গোসল করানো ফরয। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাটি পবিত্রকারী বস্তু যদি পানি না পাওয়া যায়। আর এটা সার্বজনীনভাবে প্রত্যেক ওয়াজিব পবিত্রতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ত্বহারাত অর্জনের সকল গোসলের ক্ষেত্রেও এর কোন মতভেদ নেই।[৬১৪]

যে সব অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ

দুই অবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ। যথা-

(১) পানি না পাওয়া গেলে, চাই সফরে হোক কিংবা বাড়িতে হোক।

(২) পানি ব্যবহারে অপারগ হলে, এর কয়েকটি রূপ রয়েছে।

নিম্নে তা আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ।

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾

অর্থাৎ: যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর *(সূরা মায়িদা-৬)*।

---

[৬১২] বুখারী ও মুসলিম, কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

[৬১৩] সহীহ; বুখারী (৩৩৮), মুসলিম (৭৯৮)।

[৬১৪] দেখুন, আল-মুহাল্লা (২/২৫৮)।

www.waytojannah.com

এরূপ কোন শর্ত নয় যে, মুসাফির যখন দীর্ঘ সফর করবে তখন তার জন্য তায়াম্মুম শারীয়াত সম্মত হবে:
বরং মুসাফির যখন পানি না পাবে তখন তায়াম্মুম করবে, চাই দীর্ঘ সফর হোক বা ছোট সফর হোক। এটাই বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমত।[৬১৫] কেননা আয়াতে কারীমায় সাধারণভাবে সফরের কথা বলা হয়েছে। এর প্রমাণ নিম্নে বর্ণিত হাদীস:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ» ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، .....فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا»

(১) অর্থাৎ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সঙ্গে কোন এক সফরে বেরিয়েছিলাম। যখন আমরা 'বায়দা' অথবা 'যাতুল জায়শ' নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার একখানা হার হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে হারের খোঁজে থেমে গেলেন আর লোকেরাও তাঁর সঙ্গে থেমে গেলেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে ছিলেন না আর তাদের কাছেও পানি ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘুমালেন এবং ভোরে উঠলেন, কিন্তু পানি ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন।[৬১৬]

(২) عن بن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعه فلم يعد الصلاة

(২) অর্থাৎ: আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি জরুফ থেকে মিরবদ নামক স্থানে পৌঁছার পর তায়াম্মুম করলেন। তিনি তার মুখমণ্ডল ও দু'হাত মাসাহ করলেন। অতঃপর আসরের সালাত আদায় করে মদীনায় প্রবেশ করলেন। তখনও সূর্য উঁচুতে ছিল। কিন্তু তিনি সালাত পুনরায় পড়েন নি।[৬১৭]
ইমাম শাফেঈ (রাহি.) বলেন, الجرف (জুরুফ) হলো মদীনার নিকটবর্তী স্থান।

তায়াম্মুম বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আনুগত্যের সফর হওয়া শর্ত নয়:
বিশুদ্ধ অভিমত হলো: মুসাফির সফরে থাকাকালিন সময়ে পানি না পেলে তায়াম্মুম করবে। চাই তার সফর আনুগত্যের সফর হোক কিংবা অবাধ্যতার সফর হোক। কেননা তায়াম্মুম হলো শরীয়াতের আবশ্যিক বিধান। সুতরাং পানি পাওয়া ছাড়া তা পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। কারণ এটা এমন একটি বিধান, যা শুধু সফরের সাথেই নির্দিষ্ট নয়। তাই একদিন-একরাত মাসাহ করার মত অবাধ্যতার সফরেও তায়াম্মুম বৈধ করা হয়েছে।[৬১৮]

---

[৬১৫] আল মুহাল্লা (২/১১৬), আল মুগনী (১/১৪৮)।
[৬১৬] সহীহ; বুখারী (৩৩৪), মুসলিম (৭৬৪)।
[৬১৭] এ হাদীসের সনদ সহীহ; মুওয়াত্ত্বা মালিক (ত্বহারাত-৭৩ পৃ.), বাইহাক্বী (১/২২৪)।
[৬১৮] আল মুহাল্লা (২/১১৬), আল মুগনী (১/১৪৮)।

www.waytojannah.com

Contents

আমার বক্তব্য: এমন অবস্থায় তার উপর থেকে ফরযের বিধান রহিত হবে না। বরং তায়াম্মুম বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এর শর্ত বাস্তবায়ন করা তার জন্য আবশ্যক। আর অবাধ্যতার সফরের কারণে তার যে পাপ হবে তার শাস্তি সে ভোগ করবে। আল্লাহই ভাল অবগত।

যে ব্যক্তির কাছে অল্প পরিমাণ পানি আছে যা কিছু অঙ্গে ব্যবহার করা যাবে:
এই মাসআলাটির ক্ষেত্রে বিদ্বানদের দু'টি অভিমত পরিলক্ষিত হয়।

১ম: পানি দ্বারা যতটুকু অঙ্গ ধৌত করা সম্ভব তা ধৌত করবে এবং বাকি অঙ্গ তায়াম্মুম করবে:
এটা ইমাম আহমাদের মাযহাব। ইমাম শাফেঈ (রাহি.) দু'টি অভিমতের একটিতে এ মতামত দিয়েছেন এবং ইবনে হাযমও এ মতটির কথাই বলেছেন।[৬১৯] তাদের দলীল হলো:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

অর্থাৎ: তোমরা আল্লাহকে সাধ্যমত ভয় কর সূরা *(তাগাবুন-১৬)*।
মহানাবী (ﷺ) বলেন:

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

অর্থাৎ: আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ের আদেশ করি তখন তা সাধ্যমত আদায় করার চেষ্টা কর।[৬২০]

ইবনে হাযম (রাহি.) বলেন: এরূপ ক্ষেত্রে কিছু অংশ ওযূ করা অথবা ধৌত করা সম্ভব, বাকি অংশ সম্ভব নয়। সুতরাং ওযূ ও গোসলের প্রথম অঙ্গসমূহ যথাসাধ্য পানি পৌঁছিয়ে ধৌত করা তার জন্য ফরয হবে। যখন পানি শেষ হয়ে যাবে তখন বাকি অঙ্গে তায়াম্মুম করা তার জন্য আবশ্যক হবে। কেননা এখন তার কাছে অঙ্গ পবিত্র করার আর কোন পানি নেই। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক পবিত্র মাটি ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করা তার জন্য ওয়াজিব।

২য়: এরূপ অবস্থায় প্রথম থেকেই তায়াম্মুম করবে:
এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মালিক (রাহি.) এর মাযহাব। ইমাম শাফেঈ দু'টি অভিমতের একটিতে এ মতামত দিয়েছেন এবং সালাফদের একটি দল এ মতটির কথাই বলেছেন।[৬২১]

তারা বলেন: পানির দ্বারা পবিত্রতা অর্জন ও তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন একত্রিত হতে পারে না। পর্যাপ্ত পানি থাকলে সম্পূর্ণ পানি দিয়েই পবিত্রতা অর্জন করবে, আর পর্যাপ্ত না হলে তায়াম্মুম করে নিতে হবে। ইবনে মুনযির এ মাযহাবের পক্ষে দলীল পেশ করে বলেন:[৬২২]

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

অর্থাৎ: যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও। *(সূরা মায়িদা-৬)*।

---

[৬১৯] আল-মুহাল্লা (২/১৩৭), আল-মুগনী (১/১৫০), আল-ওয়াসত্ব (২/৩২)।
[৬২০] সহীহ; বুখারী (৭২৮৮), মুসলিম (৩১৯৯)।
[৬২১] আল-মাজমূ' (২/৩১২), মাজমূ' আল-ফাতাওয়া (২১/৪৫৩)।
[৬২২] আল আওসাত্ব (২/৩৪) ইবনু মুনযির প্রণীত।

www.waytojannah.com

অত্র আয়াতে আল্লাহ জুনুবী ব্যক্তির উপর পানি দ্বারা গোসল করাকে ওয়াজিব করেছেন। আর যদি পানি না পায় তাহলে তায়াম্মুম করবে। যেমন যিহারকারীর (স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করাকে যিহার বলা হয়) জন্য একজন দাসমুক্ত করা ওয়াজিব। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে দু'মাস সিয়াম পালন করবে। যখন যিহারকারী দাসমুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অল্প কিছু অর্থ-কড়ি দিতে সক্ষম, কিন্তু সম্পূর্ণ সক্ষম নয়; তখন তার উপর সিয়াম পালন করা ফরয। অনুরূপভাবে কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করার পানি পাওয়াটা পানি না পাওয়ার মতই। এ মতাবস্থায় তার উপর তায়াম্মুম করা ফরয হবে। তামাত্তু হাজ্জ সম্পাদনকারীর কাছে যদি হাদী'র সম্পূর্ণ মূল্য না থাকে এবং শপথ ভঙ্গকারী যদি ১০ জন মিসকিনের কম মিসকিনকে খাওয়ানোর ক্ষমতা রাখে তাহলে এর হুকুম পূর্বোল্লেখিত হুকুমের মতই। সুতরাং উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী আংশিক ফরযকে বৈধ মনে করে দু'টি ফরয সাব্যস্ত করা বৈধ নয়।

আমার বক্তব্য: সম্ভবত এটা স্পষ্ট যে, প্রথমেই তায়াম্মুম করবে। কেননা আসল এবং বিকল্প একত্রে জমা হয় না। সুতরাং কোন ব্যক্তির কাছে যদি ওযূ বা গোসলের অঙ্গ ধৌত করার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি না থাকে, তাহলে বিকল্প বস্তু ব্যবহার করবে তথা তায়াম্মুম করবে। এর ফলে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ সাধ্যমত পালন করা হবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে আমার কাছে মনে হয়, যে ব্যক্তি কতিপয় অঙ্গ ধৌত করার পর তায়াম্মুম করে, সে যেন শুধু তায়াম্মুম দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করল। ধৌত ও তায়াম্মুম উভয়ের সমষ্টি দ্বারা নয়। সুতরাং পানি যথেষ্ট না হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত হওয়ার ফলে কিছু অঙ্গ ধৌত করার কারণে তাকে অর্থগত ভাবে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বলা যেতে পারে না। আল্লাহই ভাল জানেন।

কোন ব্যক্তির কাছে যদি পানি থাকে কিন্তু তা ব্যবহার করলে নিজের অথবা সঙ্গীর কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর পিপসার আশঙ্কা করে:

এরূপ হলে ইবনে মুনযির বলেন:[৬২৩] "বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি মুসাফির অবস্থায় কারও কাছে পবিত্রতা অর্জনের সমপরিমাণ পানি থাকে, কিন্তু তা ব্যবহার করলে সে পিপসার আশঙ্কা করে তাহলে পান করার জন্য পানি রেখে দিবে এবং তায়াম্মুম করবে"।

ইবনে কুদামাহ বলেন:[৬২৪] "যে ব্যক্তি তার চতুষ্পদ জন্তু ও মাল-পত্র হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে। তথা যে পানি পেল কিন্তু পানি এবং তার মাঝে রয়েছে দুস্যু বাহিনী অথবা হিংস্র জন্তু, যারা তার মাল লুট করে নিতে পারে কিংবা চতুষ্পদ জন্তুকে খেয়ে ফেরতে পারে- এমতবস্থায় যদি সে এমন পিপাসিত হয় যে, তার প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে, তখন সে পানটুকু পান করবে এবং তৃহারাতের জন্য তায়াম্মুম করবে"।

একটি মাসআলা:

যদি মৃত ব্যক্তি, জুনুবী ব্যক্তি, হায়যওয়ালী ও শরীরে নাপাক লেগে আছে এমন ব্যক্তি এক সঙ্গে একত্রিত হয় এবং তাদের একজন ব্যতীত অন্যদের পানি ব্যবহার করার পরিমাণ না থাকে, তাহলে পানি ব্যবহার করার কে বেশি হক্বদার?

---

[৬২৩] আল-ওয়াসত্ব (২/২৮)।

[৬২৪] আল-মুগনী (১/১৬৫), দেখুন, আল মাজমূ' (২/২৮১)।

Contents

(১) যদি তাদের কেউ পানির মালিক হয়ে থাকে তাহলে সেই বেশি হক্বদার। এ মতটির ব্যাপারে অধিকাংশ একত্বতা ঘোষণা করেছেন।[৬২৫]

(২) আর যদি সকলেই পানি ব্যবহারের অধিকারী হয় তাহলে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি এর হক্বদার হবে।

(ক) অন্যান্য অপবিত্র ব্যক্তিদের চেয়ে মৃত ব্যক্তিই বেশি হক্বদার। যেমনটি ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ (রাহি.) বলেছেন।[৬২৬] এর দুটি কারণ-

১মঃ এটি তার জীবনের শেষ কাজ। সুতরাং তাকে ত্বহারাত অর্জনের দুটি মাধ্যমের মধ্যে যেটি বেশি পরিপূর্ণ সেটি দিয়ে (অর্থাৎ পানি দিয়ে) তার কাজ সমাধা করা উচিত। আর জীবিতরা এক সময় পানি পেয়ে যাবে।
২য়ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার উদ্দেশ্য হলোঃ তাকে পরিষ্কার করা। আর তা মাটি দ্বারা অর্জিত হয় না। আর জীবিত ব্যক্তিদের পবিত্র করার উদ্দেশ্য হলো, সালাত আদায়ের বৈধতা লাভ করা। আর এটা তায়াম্মুম দ্বারা অর্জিত হয়ে যায়।
(খ) অন্যান্য অপবিত্র ব্যক্তিদের চেয়ে যে ব্যক্তির শরীরে নাপাক লেগেছে সেই পানি ব্যবহারের বেশি হক্বদার। এটা শাফেঈ ও হাম্বালী মাযহাবের অভিমত।[৬২৭] ইমাম নাববী (রাহি.) বলেন, কেননা এ ব্যক্তির নাজাসাত দূর করার জন্য পানি ছাড়া আর বিকল্প মাধ্যম নেই।
(গ) জুনুবী ব্যক্তির চেয়ে হায়যওয়ালী মহিলা পানি ব্যবহার করার বেশি হক্বদার। কেননা তার অপবিত্রতা বেশি জটিল এবং এর ফলে সে আল্লাহর হক্ব আদায় করতে পারবে ও সহবাস বৈধ করার জন্য স্বামীর হক্ব আদায় করতে সক্ষম হবে। এ মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। হাম্বালী ও শাফেঈ মতালম্বীদের মতে দুটি অবস্থা (যা আলোচনা করা হলো), শাফেঈর আরেকটি মত আছে (যা ৩য় অবস্থা)। তা হলো তারা উভয়ে পানি ব্যবহারের সমান হক্বদার। কেননা দুজনই প্রয়োজনের সম্মুখীন।[৬২৮]

(ঘ) জুনুবী ও মুহদিস (ছোট ধরণের অপবিত্র ব্যক্তি) যদি একত্রিত হয়, তাহলে যে পানি রয়েছে তা অনুমান করে দেখতে হবে। যদি তা গোসল করার জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে, জুনুবী ব্যক্তিই পানি ব্যবহার করার বেশি অধিকার রাখে। আর যদি গোসল করার জন্য যথেষ্ট পরিমান পানি না থাকে তাহলে মুহদিস (ছোট ধরণের অপবিত্র) ব্যক্তিই বেশি পানি ব্যবহারের অধিকারী।[৬২৯]

(ঙ) যদি মৃত ব্যক্তি ও যার শরীরে নাপাক লেগে আছে এমন দু'ব্যক্তি একত্রিত হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে।[৬৩০] যারা মুহদিস (ছোট ধরণের অপবিত্র ব্যক্তি) ব্যক্তির উপর মৃত ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে পূর্বোল্লেখিত (ক) নং এ বর্ণিত কারণকে গন্য করেন, তারা এ ক্ষেত্রেও একই কারণে বলেন যে, মৃত ব্যক্তিই পানি ব্যবহারের বেশি অধিকারী।

---

[৬২৫] আল মাজমূ' (২/৩১৬), আল মুগনী (১/১৭০)।
[৬২৬] আল মাজমূ' (২/৩১৮), আল মুগনী (১/১৭০)।
[৬২৭] আল মুগনী (১/১৭১), আল মাজমূ' (২/৩১৯)।
[৬২৮] আল মুগনী (১/১৭১), আল মাজমূ' (২/৩১৯)।
[৬২৯] প্রাগুক্ত।
[৬৩০] আল মুগনী (১/১৭০), আল মাজমূ' (২/৩১৮)।

www.waytojannah.com

আর যারা মনে করেন যে, যে ব্যক্তির শরীরে নাজাসাত রয়েছে, তার নাজাসাত দূর করার জন্য পানি ছাড়া আর বিকল্প কোন মাধ্যম নেই- তাদের মতেঃ শরীরে নাজাসাত ওয়ালা ব্যক্তিই বেশি পানি ব্যবহারের অধিকারী।

রুগ্ন ব্যক্তি যদি পানি ব্যবহারে জীবননাশের আশঙ্কা করে তাহলে তার তারাম্মুমের বিধানঃ

অধিকাংশ বিদ্বান তথা ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ, আহমাদ ও ইবনে হাযম (রাহি.) সহ অন্যান্যদের মতে, রুগ্ন ব্যক্তি যদি পানি ব্যবহারে জীবননাশের আশঙ্কা করে তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ। আল্লাহ বলেনঃ

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

অর্থাৎঃ আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর *(সূরা মায়িদা-৬)*।

মুজাহিদ বলেনঃ অত্র আয়াতে এমন রুগ্ন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে জুনুবী হয়েছে। ফলে গোসল করার কারণে জীবননাশের আশঙ্কা করছে। তাহলে তার জন্য পানি না পাওয়া মুসাফিরের ন্যায় তায়াম্মুম করার অবকাশ রয়েছে।[৬৩১] আল্লাহ আরও বলেনঃ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ অর্থাৎঃ আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।

অপর পক্ষে আত্বা[৬৩২] ও হাসান (রাহি.) এরূপ অবস্থায় তায়াম্মুম করতে নিষেধ করেছেন, তবে পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করবে। কেননা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা তাই বুঝা যায়।

এদের মতামতের জবাবে বলা যায়ঃ অত্র আয়াতই আমাদের দলীল কেননা আয়াতের মূল ইবারত হলোঃ

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى فعجزتم أَوْ خفتم من استعمال الماء, أو كنتم عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

অর্থাৎঃ যদি তোমরা অসুস্থ হওয়ার ফলে পানি ব্যবহারে অপারগ হও বা জীবননাশের আশঙ্কা কর অথবা সফরে থাকাকালীন সময় পানি না পাও, তাহলে তোমরা তায়াম্মুম কর।[৬৩৩]

যদি রুগ্ন ব্যক্তি পানি ব্যবহারের ফলে রোগ বৃদ্ধি বা আরোগ্য লাভে বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে সে তায়াম্মুম করবে কিনা?

অধিকাংশ বিদ্বান[৬৩৪] তথা আবূ হানীফা, মালিক, (একটি বর্ণনা অনুযায়ী) শাফেঈ ও ইবনে হাযম (রাহি.) এর মতে, জীবননাশের আশঙ্কার কারণেই শুধু রুগ্ন ব্যক্তি তায়াম্মুম করবে এমন কোন শর্ত নয়। বরং যদি রুগ্ন ব্যক্তি পানি ব্যবহারের ফলে রোগ বৃদ্ধি বা আরোগ্য লাভে বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে সে তায়াম্মুম করবে। কেননা সূরা মায়িদার আয়াতটিতে সাধারণভাবে বলা হয়েছে।

---

[৬৩১] এর সনদ সহীহ; এ হাদীসটি আব্দুর রাযযাক সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন।

[৬৩২] এ হাদীসটি আব্দুর রাযযাক তার আল-মুসান্নাফ' (৮৬১) গ্রন্থে সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন।

[৬৩৩] আল মাজমূ' (২/৩৩০)।

[৬৩৪] আল- মাসবূত্ব (১/১২১), আল মাজমূ' (২/৩৩১), আল মুহাল্লা (২/১১৬), আল আওসাত্ব (২/২৬), মাজমূ'-আল ফাতাওয়া (২১/৩৯১)।

Contents

মহান আল্লাহ অপর আয়াতে সার্বজনীনভাবে ঘোষণা করেন:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

অর্থাৎ: আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না *(সূরা বাকারাহ্-১৮৫)*।

ইবনে হাযম বলেন: "আল্লাহর সকল প্রশংসা। তিনি জটিলতা ও কষ্টকে দূর করে দিয়েছেন, চাই তার রোগ বৃদ্ধি হোক বা না হোক। অনুরূপভাবে যদি কেউ রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা করে, তাহলে এটা কষ্ট ও জটিলতার অন্তর্ভুক্ত"।
ইমাম আহমাদ ও শাফেঈ (রাহি.) এর দু'টি অভিমতের একটিতে বর্ণিত আছে, তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য জীবননাশের আশঙ্কা থাকা শর্ত। অধিকাংশের মাযহাবটিই অধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

যে ব্যক্তির দেহে যখম রয়েছে তার করণীয় কি?

এই মাসআলায় আসলের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে, আর তা হলো, আসল ও বিকল্প কি একত্রিত হতে পারে। অর্থাৎ ওযূ কিংবা গোসল ও তায়াম্মুম কি একত্রিত হতে পারে, না পারে না? এ সংক্রান্ত আলোচনা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।[৬৩৫]

সুতরাং যারা উভয়কে জমা করা নিষেধ মনে করেন, তারা হলেন, আবূ হানীফা ও মালিক (আর এ মতামতটিকেই আমরা প্রাধান্য দিয়েছি)। এদের মতে, কম সংখ্যকটা অধিকসংখ্যকের অনুগামী হবে। সুতরাং যদি অধিকাংশ শরীর যখম হয়, তাহলে বাকী সুস্থ অঙ্গ ধৌত করা ছাড়াই তায়াম্মুম করবে। আর যদি অধিকাংশ অঙ্গ সুস্থ হয়, তাহলে শরীর ধৌত করবে এবং যখমকৃত অঙ্গ ধৌত করবে না।[৬৩৬]

আর যারা গোসল ও তায়াম্মুমকে একত্রিত করা বৈধ মনে করেন, তারা বলেন: শরীরের সুস্থ অঙ্গগুলো ধৌত করবে এবং যখমকৃত অঙ্গগুলো তায়াম্মুম করবে। এটা ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ এর অভিমত। শাইখুল ইসলাম এ মতটিকে সমর্থন করেছেন।[৬৩৭]

আমার বক্তব্য: বাহ্যিক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রথম মতামতটিই অধিক বিশুদ্ধ। যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এ ব্যাপারে মহানাবী (ﷺ) এর পক্ষ থেকে কোন সহীহ হাদীস নেই।
কিন্তু জাবির বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেন:

خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ

---

[৬৩৫] এ সংক্রান্ত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।
[৬৩৬] আল মাসবূত্ব (১/১১২), আল মাজমূ' (২/৩৩৩)।
[৬৩৭] আল মুগনী (১/১৬২), আল মাজমূ' (১/১৬২), মাজমূ' আল ফাতাওয়া (২১/৪৬৬)।

www.waytojannah.com

فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ – أَوْ» يَعْصِبَ «شَكَّ مُوسَى – عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»

অর্থাৎ: কোন এক সফরে যাওয়ার সময় আমাদের এক ব্যক্তির মাথা প্রস্তরাঘাতে যখম হয়। এ অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হয়। সে তার সাথীদের জিজ্ঞেস করে, এ অবস্থায় আমি কি তায়াম্মুম করতে পারি? তাঁরা বলেন, যেহেতু তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম তাই তোমাকে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া যায় না। অতঃপর সে ব্যক্তি গোসল করার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সফল হতে প্রত্যাবর্তনের পর নাবী করীমকে এই সংবাদ দেয়া হলে তিনি বলেন: তার সাথীরা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুক! তারা যখন জানে না তখন জিজ্ঞেসা করল না কেন? কেননা অজ্ঞতার ঔষধ হলো জিজ্ঞেস করা। সে ব্যক্তি তায়াম্মুম করলেই যথেষ্ট হতো। তার আহত স্থানে ব্যান্ডেজ করে তার উপর মাসাহ করলেই চলত এবং শরীরের অন্যান্য স্থান ধুয়ে ফেললেই হতো।[৬৩৮]

হাদীসটি যঈফ। ইমাম বাইহাকী, ইবনে হাযম এবং অন্যান্যরা হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, মুলতঃ এটি যঈফ। যদিও আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, কিন্তু তা ঠিক নয়।

ইবনে উমার (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

إذا لم تكن على الجراح عصائب غسل ما حوله ولم يغسله

অর্থাৎ: যখন তার যখমের উপর ব্যান্ডেজ থাকবে না, তখন তার আশেপাশে ধুয়ে ফেলবে। কিন্তু যখমের স্থান ধুবে না।[৬৩৯]

উবাইদ বিন উমাইর থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, তিনি এক যখম প্রাপ্ত জুনুবী ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন: ليغسل ما حوله ولا يقرب جراحته الماء-অর্থাৎ: সে যেন তার আশেপাশের অংশ ধুয়ে ফেলে। তবে যখমের উপর যেন পানি না পৌঁছে।[৬৪০]

অত্র হাদীসটি ইমাম আবূ হানীফা ও মালিক (রাহি.) এর অভিমতের অনুকূলে। আর এ অভিমতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহই ভাল জানেন।

যদি পানি ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে তা ব্যবহারে জীবননাশের আশঙ্কা থাকে তাহলে জানাবাতের কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ কিনা?

যদি পানি ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে তা ব্যবহারে জীবননাশের আশঙ্কা থাকে তাহলে জানাবাতের কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ। কেননা এটা অসুস্থতার স্থলাভিষিক্ত। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত।[৬৪১] তাদের দলীল নিম্নরূপ-

১। আল্লাহর বাণী: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا -অর্থাৎ:আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু *(সূরা নিসা-২৯)*।

---

৬৩৮ যঈফ; আবূ দাউদ (৩৩৬), দারাকুতনী (১/১৯০), বাইহাক্বী (১/২৩৭) এর সনদ যঈফ। ইবনে আব্বাসের হাদীসটি আলবানী হাসান বলেছেন। আবূ দাউদ (৩৩৭), ইবনু মাজাহ (৫৭২) তবে হাদীসটি মুনকাতি' হওয়ায় দলীলের অনুপযুক্ত।

৬৩৯ এর সনদ দুর্বল; বাইহাক্বী (১/২২৮)।

৬৪০ এর সনদ সহীহ; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (৮৬৫)।

৬৪১ আল মাবসূত্ব (১/১২২), আল মাজমূ' (২/৩৩০), আল ইস্তিযকার (৩/১৭৩), আল মুগনী (১/১৬৩), আল মুহাল্লা (২/১৩৪), মাজমূ' আল ফাতাওয়া (২১/৩৯৯)।

Contents

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

২। অর্থাৎ: আমরা ইব্নুল আস্ (رضي الله عنه) এর সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন: যাতু সালাসিলের যুদ্ধের সময় একদা শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার আশঙ্কা হলো যে, যদি এই সময় আমি গোসল করি তবে ক্ষতিগ্রস্ত হব। আমি তায়াম্মুম করে আমার সাথীদের সাথে ফজরের সালাত আদায় করি। প্রত্যাবর্তনের পর আমার সঙ্গী সাথীরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে অবহিত করেন। নাবী করীম (ﷺ) বলেন: হে আমর! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সাথীদের সঙ্গে সালাত আদায় করলে? আমি তাঁকে আমার গোসল করার অসমর্থতার কারণ জ্ঞাপন করলাম এবং আরও বললাম, আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে বলতে শুনেছি: তোমারা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান- (সূরা নিসা: ২৯)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কিছু না বলে মুচকি হাসি দেন।[৬৪২]

এ হাদীসটির ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মতে হাদীসটি যঈফ। কিন্তু শরীয়াতের কায়দার পক্ষ্যে সাক্ষ্য দেয়। অনুরূপভাবে এই মাযহাবকে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা আরও শক্তিশালী করা যায়-

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

অর্থাৎ: আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না *(সূরা মায়িদা-৬)*।
আয়াতের অত্র অংশটুকু তায়াম্মুমের কথা উল্লেখ করার পর উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা যেন ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে যে, তায়াম্মুমকে শরীয়াতের বিধিবদ্ধ করা হয়েছে পানি ব্যবহারে কষ্টে সম্মুখীন হলে। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রবল ঠাণ্ডা কষ্ট বা জটিলতারই অন্তর্ভুক্ত। তবে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত যে, তায়াম্মুমকে ঠাণ্ডার কারণেই শরীয়াতে বিধিবদ্ধ করা হয় নি। বরং, পানি ব্যবহারে অপারগ হলেই শুধু এ ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করা বৈধ। আল্লাহই ভাল জানেন।

সময় স্বল্প হওয়ার কারণে পানি ব্যবহার করতে গেলে সালাতে সময় পেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে তায়াম্মুম করা যাবে কি?
এ মাসআলাটির ব্যাপারে বিদ্বানগণ দু'টি অভিমত পেশ করেছেন:

১ম: সময় যদিও পেরিয়ে যায় তবুও তায়াম্মুম করা যাবে না:
এটি ইমাম শাফেঈ, হাম্বালী ও আবূ ইউসুফের অভিমত।[৬৪৩] তাদের দলীল নিম্নরূপ-
১। আল্লাহর বাণী:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ..... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾

---

[৬৪২] যঈফ; আবূ দাউদ (৩৩৪), আহমাদ (৪/২০৩), দারাকুতনী (১/১৭৮) হাকিম (১/১৭৭), বাইহাক্বী (১/২২৫) এ হাদীসের সনদ ও মতনের ত্রুটি রয়েছে। শাইখ আলবানী তার আল ইরওয়া (১/১৮২) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন, যা সঠিক নয়।
[৬৪৩] আল মুগনী (১/১৬৬), আল মাজমূ' (২/২৮০), আল ইস্তিযকার (৩/১৭১), তামামুল মিন্নাহ (১৩২ পৃ.)।

www.waytojannah.com

অর্থাৎ: হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ধৌত কর। ..... অতঃপর তোমরা যদি পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম কর *(সূরা মায়িদা-৬)*।

তারা বলেন: আয়াতে তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য পানি না পাওয়াকে শর্ত করা হয়েছে।

২। আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ-

অর্থাৎ: যে ব্যক্তির বায়ু নির্গত হয় তার সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে ওযূ করে।[৬৪৪]

৩। ইবনে উমার (رضي الله عنه) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ،

অর্থাৎ:'পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত সালাত কবুল হয় না এবং হারাম মালের ছাদাক্বা কবুল হয় না'।[৬৪৫]

এর দ্বারা পানি ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সুতরাং যদি সে সালাত পায়, তাহলে তার জন্য ভালো। আর যদি চেষ্টা কিংবা অলসতার কারণে সালাত ছুটে যায়, তাহলে এর ভালো অথবা মন্দ ফল সে ভোগ করবে।

২য়: সময় পেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করাই শরীয়াত সম্মত:

এটা আহলে রায়, আওযায়ী, মালিক ও ইবনে হাযম (রাহি.) এর অভিমত, শাইখুল ইসলাম এ মতটিকে পছন্দ করেছেন।[৬৪৬]

হানাফীগণ এটা বৈধ হওয়ার কারণ হিসেবে বলেন: এমন কিছু সালাত রয়েছে যা ছুটে গেলে এর কোন বিকল্প নেই। যেমন জানাযার সালাত।[৬৪৭]

এ মতের বক্তাদের দলীল হলো:

قَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ الأَنْصَارِيُّ «أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ»

১। অর্থাৎ: আবূ জুহাইম আল আনসারী (রা.) বলেন: নাবী (ﷺ) (মদীনার নিকটস্থ) 'বিরে জামাল' থেকে আসছিলেন। পথিমধ্যে তার সাথে এক ব্যক্তির দেখা হলো। লোকটি তাকে সালাম করলো। নাবী (ﷺ) জওয়াব না দিয়ে দেয়ালের কাছে অগ্রসর হয়ে তাতে (হাত মেরে) নিজ চেহারা ও হস্তদ্বয় মাসাহ করে নিলেন, তারপর সালামের জওয়াব দিলেন।[৬৪৮]

তারা বলেন: এটাই ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায় তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার প্রমাণ।

২। ইবনে আব্দিল বার "ইস্তিযকার" গ্রন্থে (৩/১৭১) বলেন: 'যে ব্যক্তি পানি পাবে না অথবা যদি পানি পেতে গেলে সালাত ছুটে যাওয়ার অশঙ্কা থাকে তাহলে সে তায়াম্মুম করে নিবে। সে যদি অসুস্থ বা মুসাফির হয়, তাহলে তায়াম্মুম বৈধ হওয়া স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর যদি সে সুস্থ বা মুকীম হয়, তবে অর্থগত দলীল দ্বারা তার তায়াম্মুম বৈধ হবে।

---

[৬৪৪] সহীহ; বুখারী (৬৯৫৪), মুসলিম (৫২৬)।

[৬৪৫] সহীহ; মুসলিম (৫২৪), তিরমিযী (১), ইবনু মাজাহ (২৭২)।

[৬৪৬] আল মুগনী (১/১৬৬), আল মুহাল্লা (২/১১৭), মাজমূ' আল ফাতাওয়া (২১/৪৩৯, ৪৫৬), আল-আওসাত্ব (২/৩০)।

[৬৪৭] আল মাবসূত্ব (১/১১৮, ১১৯)।

[৬৪৮] সহীহ; বুখারী (৩৩৭), মুসলিম (৮০০)।

Contents

৩। শাইখুল ইসলাম বলেন, বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমত হলো: যে সকল সালাত ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে সব সালাতের জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ। যেমন: জানাযার সালাত, ঈদের সালাত। এছাড়াও যে সব সালাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এমন সালাত। কেননা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করা সালাত ছেড়ে দেয়ার চেয়ে উত্তম।

তিনি আরও বলেন: অনুরূপভাবে, যদি ওয়াজিব জামায়াতের সালাত তায়াম্মুম ছাড়া আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে তা তায়াম্মুম করেই আদায় করবে।

আমার বক্তব্য: সম্ভবতঃ বিশুদ্ধ মত হলো: এমন অবস্থায় তায়াম্মুম করবে, যাতে সালাত আদায় করতে পারে, কেননা তায়াম্মুমকে শরীয়াতে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, সঠিক সময়ে সালাত আদায় করার জন্য ও সালাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায়। যাতে সালাতের সময়ের প্রতি যত্নবান হওয়া যায়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

যে ব্যক্তি এমন সময় জাগ্রত হয়েছে যে, সালাত আদায়ের স্বল্প সময় রয়েছে, তাহলে কি সে সময়ের মধ্যে সালাত আদায়ের জন্য তায়াম্মুম করবে?

পূর্ববর্তী মাসআলাটির মত এই মাসআলাতেও দুটি অভিমত রয়েছে।[৬৪৯]

১ম: সময়ের মধ্যে সালাত আদায়ের জন্য তায়াম্মুম করবেঃ

এটা ইমাম মালিক, আওযায়ী, সাওরী ও ইবনে হাযম (রাহি.) এর অভিমত।

২য়: গোসল করে সালাত আদায় করবে যদিও সালাতের সময় পেরিয়ে যায়:

এটা অধিকাংশ বিদ্বান তথা, ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ, আহমাদ (রাহি.) এর অভিমত। ইমাম মালিক (রাহি.) দু'টি অভিমতের একটিতে এ মতামত পেশ করেছেন। শাইখুল ইসলাম এমতটিকে পছন্দ করেছেন।

আর এটাই প্রাধান্য প্রাপ্ত অভিমত। কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সালাতের সময় হলো, যখন সে জাগ্রত হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন:

«أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا

অর্থাৎ: ঘুমানোতে কোন দোষ বা অবহেলা নেই। অবহেলা তখনই বলা হবে যদি কোন ব্যক্তি সালাত আদায় না করে দেরী করে এবং অন্য সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়। কোন সময় কারও এরূপ হলে, সে যখন জাগ্রত হবে তখনই সালাত আদায় করে নিবে।[৬৫০]

ইবনে তাইমিয়াহ (২২/৩৫) বলেন: এমন অবস্থায় যদি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে জাগ্রত হয় এবং সূর্য উদয়ের পর ছাড়া গোসল ও সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে সময়ই সালাত আদায় করবে

---

[৬৪৯] আল আওসাত্ব (২/৩০), আল মুহাল্লা (২/১১৭), মাজমূ' (২২/৩৫-৩৬)।

[৬৫০] সহীহ; মুসলিম (১৫৩২), আবূ দাউদ (৪৩৭), আর সহীহহাইনে আবু হুরাইরা থেকে মারফূ সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, "من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" এবং মুসলিমে আনাস থেকে একটি হাদীস এসেছে, "من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" এ শব্দে।

www.waytojannah.com

এবং সালাত ছেড়ে দিবে না। তবে যে ব্যক্তি প্রথম ওয়াক্তে জাগ্রত হবে, তার জন্য সালাত আদায়ের সময় হলো, সূর্য উদয়ের পূবেই। তার জন্য সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত ত্যাগ উচিত হবে না।

কোন মাটি (সাঈদ) দিয়ে তায়াম্মুম করা বৈধ?

কোন মাটি (সাঈদ) দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ, তা নিয়ে বিদ্বানদের মাঝে দু'টি অভিমত পরিলক্ষিত হয়।

১মঃ সাধারণভাবে পৃথিবীর উপরিভাগ দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ। যেমনঃ কঙ্কর, পাহাড়, বালু ও মাটি ইত্যাদিঃ

এটা আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মালিক (রাহি.) এর অভিমত। শাইখুল ইসলাম এ মতটিকে পছন্দ করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনে হাযমও এমতটিকে সমর্থন করেছেন। তবে এর সাথে শর্ত করেছেন যে, যদি পৃথিবীর উপরিভাগটা মাটি ছাড়া অন্য কিছু হয় তাহলে, তা মাটির সাথে মিলে থাকতে হবে।[৬৫১]

এদের দলীল নিম্নরূপ-

১। আল্লাহর বাণী: صَعِيدًا زَلَقًا অর্থাৎ: অনুর্বর উদ্ভিদশূন্য যমীন *(সূরা কাহাফ- ৪০)*। আল্লাহর বাণী-

﴿صَعِيدًا جُرُزًا﴾

অর্থাৎ: উদ্ভিদহীন শুষ্ক মাটি *(সূরা কাহাফ- ৪০)*।

"ইস্তিযকার" গ্রন্থে (৩/১৫) বলা হয়েছে: جُرُز (জুরুয) হলো- মোটা বা পুরু জমিন যাতে কোন উদ্ভিদ গজায় না।

২। মহানাবী (ﷺ) বলেন: وَجُعِلَتِ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا অর্থাৎ: পৃথিবীর সমস্ত জমিন আমার জন্য মাসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দেয়া হয়েছে।[৬৫২]

৩। মহানাবী (ﷺ) বলেন: يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ،

অর্থাৎ: আগের ও পরের সকল মানুষকে আল্লাহ একই ভূমিতে একত্রিত করবেন।[৬৫৩] অত্র হাদীসে "صَعِيدٍ وَاحِدٍ" এর অর্থ "أرض واحد" তথা একই জমিনে।

৪। মহানাবী (ﷺ) বলেন:

وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ

অর্থাৎ: পৃথিবীর সমস্ত জমিন আমার জন্য ও আমার উম্মতের জন্য মাসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তি যেখানেই সালাতের সময় পাবে সে স্থানই তার জন্য মাসজিদ ও পবিত্রতার মাধ্যম হবে।[৬৫৪]

---

[৬৫১] আল ইস্তিযকার (৩/১৫৭), আল মাবসূত্ব (১/১০৮), মাজমূ' আল ফাতাওয়া (২১/৩৬৪), আল মুহাল্লা (২/১৫৮)।

[৬৫২] সহীহ; পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

[৬৫৩] সহীহ; বুখারী (৪৭১২), মুসলিম (৪৭২)।

Contents

৫। আবূ জুহাইম এর হাদীসে রয়েছে:

«أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»

অর্থাৎ: নাবী (ﷺ) (মদীনার নিকটস্থ) 'বিরে জামাল' থেকে আসছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে এক ব্যক্তির দেখা হলো। লোকটি তাঁকে সালাম করলো। নাবী জওয়াব না দিয়ে দেয়ালের কাছে অগ্রসর হয়ে তাতে (হাত মেরে) নিজ চেহারা ও হস্তদ্বয় মাসাহ করে নিলেন, তারপর সালামের জওয়াব দিলেন।[৬৫৫]

৬। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সব চেয়ে পবিত্র মাটি হলো, ক্ষেত-খামারের মাটি।[৬৫৬]

২য়: "সাঈদ" দ্বারা উদ্দেশ্য মাটি। সুতরাং মাটি ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে তায়াম্মুম বৈধ হবে না:
এটা ইমাম শাফেঈ, হাম্বালী ও আবূ সাওর (রাহি.) এর অভিমত। ইবনে মুনযির এ মতটিকে সমর্থন করেছেন।[৬৫৭] তাদের দলীল নিম্নরূপ-

১। অন্য হাদীসে অতিরিক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে-

وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا،

অর্থাৎ: পৃথিবীর সমস্ত জমিন আমাদের জন্য মাসজিদ ও এর মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে বানিয়ে দেয়া হয়েছে।[৬৫৮]

তারা বলেন: এ বর্ণনাটি وَجُعِلَتِ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا এর সাথে নির্দিষ্ট।

২। মহানাবী (ﷺ) বলেন:

أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقلنا يا رسول الله ما هو قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهور وجعلت أمتي خير الأمم

অর্থাৎ: মহানাবী (ﷺ) বলেন, আমাকে এমন কিছু বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে যা ইতিপূর্বে কোন নাবীকে দেয়া হয় নি। আমাকে অত্যন্ত জাক-জমকের সাথে সাহায্য করা হয়েছে। আমাকে জমিনের চাবি কাঠি দেয়া হয়েছে। আমার নাম রাখা হয়েছে আহমদ। আমার জন্য মাটিকে পবিত্রতার মাধ্যম করা হয়েছে। আমার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[৬৫৯]

আমার বক্তব্য: আমার কাছে প্রথম অভিমতটি বেশি বিশুদ্ধ। অর্থাৎ সাধারণভাবে যাকে জমিন বলা হয় তা দ্বারাই তায়াম্মুম বৈধ। অথবা জমিনের অর্থে ব্যবহৃত হয় এমন বস্তু। যেমন- ধূলা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

---

[৬৫৪] হাসান; পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।
[৬৫৫] সহীহ; পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।
[৬৫৬] এর সনদ যঈফ; ইবনু আবী শাইবাহ (১/১৬১)।
[৬৫৭] আল মুগনী (১/১৫৫), আল মাজমূ' (২/১৪৬), ইস্তিযকার (৩/১৫৯), আওসাত্ব (২/৪৩)।
[৬৫৮] সহীহ; মুসলিম (৫২২), ইবনু হিব্বান (১৬৯৭), দারাকুতনী (১/১৭৫), বাইহাক্বী (১/২১৩-২৩০), এর অতিরিক্ত অংশ নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। তবে তা সাব্যস্ত হওয়াই অধিক সঠিক।
[৬৫৯] মুনকার; আহমাদ (১/৯৮), বাইহাকী (১/২১৩)।

www.waytojannah.com

২য় অভিমতটি দুই দিক থেকে সমালোচিত:

১ম: তারা যে দলীল দিয়েছেন তা দ্বারা কিছু সাব্যস্ত হয় না। যেমনটি আপনি দেখলেন।

২য়: তারা হাদীসে বর্ণিত "التربة" দ্বারা "تراب" (মাটি) অর্থ গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রেও কিছু সমালোচনা রয়েই যায়। কেননা আবূ হুরাইরা কর্তৃক মুসলিম শরীফে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي فَقَالَ: «خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ،

আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: একদা রাসূল (ﷺ) আমার হাত ধরে বলেন: আল্লাহ জমিনকে শনিবারের দিন সৃষ্টি করেন। জমিনে পাহাড় স্থাপন করেন রবিবারের দিন। গাছপালা সৃষ্টি করেন সোমবারের দিন।

"লিসানুল আরব" গ্রন্থে বলা হয়েছে- "خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ" অত্র অংশে التُّرْبَةَ দ্বারা أَرْضُ বা জমিন উদ্দেশ্য।

আমার বক্তব্য: হাদীস দ্বারা এ অর্থটি স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

দু'টি পবিত্রকারী বস্তু তথা পানি ও মাটি না পাওয়া গেলে তার বিধান:

বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী দু'টি পবিত্রকারী বস্তু তথা পানি ও মাটি না পাওয়া গেলে সে অবস্থায় সময়মত সালাত আদায় করে নিবে। তাকে আর পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না।

এটা ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও তাদের অনুসারী এবং ইবনে হাযম (রাহি.) এর অভিমত। ইবনে তাইমিয়াহ এ মতটিকে পছন্দ করেছেন।[৬৬০]

তাদের দলীল নিম্নরূপ:

১। আল্লাহর বাণী:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

অর্থাৎ: তোমরা আল্লাহকে সাধ্যমত ভয় কর *(সূরা তাগাবুন-১৬)*।

২। আল্লাহর বাণী:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

অর্থাৎ: আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না *(সূরা বাকারাহ-২৮৬)*।

৩। মহানাবী (ﷺ) বলেন:

«وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

অর্থাৎ: আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ের আদেশ করি তখন তা সাধ্যমত আদায় করার চেষ্টা কর।[৬৬১]

---

[৬৬০] আল মুগনী (১/১৫৭), আল মাজমূ' (২/৩২১), মুহাল্লা (২/১৩৮) আল ফাতাওয়া (২১/৪৬৭)।

[৬৬১] সহীহ: বুখারী (৭২৮৮), মুসলিম (৩১৯৯)।

Contents

তারা বলেন: এর দ্বারা বুঝা যায়, সালাত আদায়ের জন্য যে কাজগুলো করা দরকার তা যথা সাধ্য করার চেষ্টা করবে। আর পবিত্রতা অর্জনে সক্ষম না হলে এ বিধান তার থেকে বাতিল হবে। এর মাধ্যমেই সে তাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা পালনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর আদেশকৃত কর্মটি পালন করলে তাকে তা কাযা করতে হবে না।

আমার বক্তব্য: সম্ভবত অত্র মাযহাবটিকে আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে।

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لِأَسْمَاءَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَلَبِهَا رِجَالًا، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ، وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ»

অর্থাৎ: আয়িশা থেকে বর্ণিত: তিনি একবার তার বোন আসমার একটি মালা (ধার করে) কোন এক সফরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু হারটি হারিয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার সাহাবাদের কয়েকজনকে সেটির অনুসন্ধান করতে পাঠালেন, ইতিমধ্যে সালাতের সময় হলে তারা সবাই বিনা ওযূতেই সালাত পড়লো। যখন তারা নাবী (ﷺ)-এর নিকট ফিরে আসলেন। তখন এ ব্যাপারে অসুবিধার কথা বলে অভিযোগ করলেন। ঠিক এ কারণে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হলো।[৬৬২]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানাবী (ﷺ) তাদেরকে পানি না পাওয়া অবস্থায় বিনা ওযূতে সালাত আদায়ের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং পুনরায় তাদেরকে সালাত আদায় করতে বলেন নি। সুতরাং যদি মাটিও না পাওয়া না যেত, তাহলে বিধানটি এরূপই হত। অর্থাৎ: বিনা ওযূতেই সালাত আদায় করতে হতো। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

অপর পক্ষে আবূ হানীফা, আসহাবে রায়, মালিক ও আওযায়ী (রাহি.) এর মতে: সালাতের ওয়াক্ত পেরিয়ে গেলেও ওযূ অথবা তায়াম্মুম না করা পর্যন্ত সালাত আদায় করা যাবে না।[৬৬৩]

তায়াম্মুমে নিয়ত সংশ্লিষ্ট মাসায়েল:

তায়াম্মুম দ্বারা সালাত বৈধ হওয়ার জন্য হাদাস বা নাপাকী দূর করার নিয়ত করা বৈধ:

বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমতে, সাধারণভাবে তায়াম্মুম পানির স্থালাভিষিক্ত। পানি দ্বারা যা বৈধ হয় তায়াম্মুম দ্বারা তাই বৈধ হবে। পানি দ্বারা ত্বহারাত অর্জন করে সময় পেরিয়ে গেলেও যেমন পবিত্রতা বাকি থাকে, তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেও সময় চলে যাওয়ার পরও তায়াম্মুমের পবিত্রতা অবশিষ্ট থাকে। যদি নফল সালাতের জন্য তায়াম্মুম করা হয় তাহলে তা দ্বারা ফরয সালাত আদায় করা যায়, অনুরূপভাবে এর বিপরীতটিও করা যায়। এটা ইমাম মালিক (রাহি.) ব্যতীত অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত।[৬৬৪]

---

[৬৬২] সহীহ; বুখারী (৫৮৮২), মুসলিম (৭৯৫)।

[৬৬৩] আওসাত্ব (২/৪৫), ইস্তিযকার (৩/১৫০), মুহাল্লা (২/১৩৯)।

[৬৬৪] মাজমূ' (২/২৫৫), আল মুগনী (১/১৫৮), মাজমূ' আল ফাতাওয়া (১২/৪৩৬), আল মাবসূত্ব (১/১১৭)।

www.waytojannah.com

শাইখুল ইসলাম বলেন:[৬৬৫] এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা এরই প্রমাণ বহন করে। কেননা মহান আল্লাহ পানির মতই তায়াম্মুমকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছেন।
আল্লাহ বলেন:

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾

তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে *(সূরা মায়িদা:৬)*

সুতরাং যারা বলে থাকেন যে, মাটি দ্বারা নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যায় না, তারা কিতাব ও সুন্নাহর বিরোধিতা করেন। যেহেতু এটা হাদাস বা নাপাক থেকে পবিত্রতা দানকারী; সুতরাং তা সম্পূর্ণভাবে হাদাস বা নাপাক হওয়া থেকে বাধা দিবে। কেননা আল্লাহ মুসলমানদেরকে তায়াম্মুম দ্বারা নাপাক থেকে পবিত্র রাখতে চান। সুতরাং তায়াম্মুম হলো: নাপাকী দূরকারী ও তায়াম্মুমকারীকে পবিত্রতা দানকারী। কিন্তু পানি ব্যবহারে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে এটা নাপাকী দূর করতে পারে। কেননা তায়াম্মুম হলো পানির বিকল্প মাধ্যম। সুতরাং ওযর সাপেক্ষে পানি না পাওয়া পর্যন্ত তায়াম্মুম পবিত্রতা দান করতে পারে।

আমার বক্তব্য: সালাত আদায়, ত্বওয়াফ করা, কুরআন পাঠ করা, কুরআন স্পর্শ করা ইত্যাদির জন্য তায়াম্মুমকে শরীয়াতে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যেমনটি ওযূ, গোসলের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। তবে তায়াম্মুম হলো ওযর বশতঃ পানি না পাওয়া অবস্থায় বিকল্প মাধ্যম।
তাই যে ব্যক্তি তায়াম্মুমের নিয়ত করবে তার নাপাকী দূর হবে এবং ওযূ ও গোসল দ্বারা যে সব কাজ বৈধ হয় তায়াম্মুম দ্বারা তাই বৈধ হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

জানাবাত দূর করার নিয়তে তায়াম্মুম করলে তা কি ছোট নাপাকী দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে?

বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমতে- জানাবাত দূর করার নিয়তে তায়াম্মুম করলে তা ছোট নাপাকী দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে এটা ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেঈ (রাহি.) এর অভিমত।[৬৬৬] এটা দুটি কারণে:

(১) উভয় ক্ষেত্রে একই পবিত্রতা অর্জন করা হয়। ফলে একটির করার কারণে অন্যটির বিধান বাতিল হয়ে যায়। যেমন: পেশাব ও পায়খানা।

(২) তায়াম্মুম পানি ব্যবহারের বিকল্প হওয়ার কারণে তা পানির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আর বিশুদ্ধ অভিমতে, গোসল করার কারণে ছোট নাপাকীর জন্য ওযূর প্রয়োজন হয় না। সুতরাং তায়াম্মুমও অনুরূপ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি ছোট নাপাকি দূর করার জন্য নিয়ত করবে তার ক্ষেত্রে জানাবাতের নিয়তের জন্য যথেষ্ট হবে কি না এ ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। যারা উপরে উল্লেখিত ১ম কারণের দিকে লক্ষ্য রাখেন তারা এটাকে যথেষ্ট মনে করেন। আর যারা মনে করেন যে, এটা পানির বিকল্প মাধ্যম তারা এটা নিষেধ করেন।

---

[৬৬৫] মাজমূ' আল ফাতাওয়া (২১/৪৩৬)।
[৬৬৬] আল মুগনী (১/১৬৬)।

Contents

আর ইমাম মালিক, আবূ সাওর, হাম্বালী ও ইবনে হাযম (রাহি.) এর মতে:[৬৬৭] একটির নিয়ত অন্যটির জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা মহানাবীর সাধারণ বাণী হলো:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

অর্থাৎ: প্রত্যেকটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে যার জন্যে সে নিয়ত করবে।[৬৬৮]

তায়াম্মুমের বিশুদ্ধ পদ্ধতি

রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত তায়াম্মুমের বিশুদ্ধ পদ্ধতি নিম্নরূপ:

প্রথমে পবিত্র মাটির উপর একবার দুই হাত মারবে, তারপর দু'হাত ফুঁক দিয়ে ঝেড়ে ফেলবে। এরপর **মুখমণ্ডল ও দু** হাতের কব্জি পর্যন্ত বুলাবে। এটা হাম্বালী ও ইবনে হাযম (রাহি.) এর মাযহাব। সালাফদের একটি দলও এ অভিমত পেশ করেছেন। ইবনে তাইমিয়াহ (রাহি.) এ অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন।[৬৬৯]

তাদের দলীল নিম্নরূপ:

(১) قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

১। আম্মার বিন ইয়াসার (رضي الله عنه) উমার বিন খাত্তাব (رضي الله عنه) কে বলেন: আপনার কি স্মরণ নেই? আমি ও আপনি দু'জনে এক সফরে ছিলাম। দু'জনের গোসলের প্রয়োজন দেখা দিলে আপনি তো সালাত আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করলাম। তারপর আমি ঘটনাটি নাবী এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন নাবী (ﷺ) বললেন: তোমার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট ছিল। এ বলে নাবী (ﷺ) দু'হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ফুঁ দিয়ে তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মাসাহ করলেন।[৬৭০]

(২) عن أبي هريرة قال لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع فأتيت النبي ﷺ فلم أجده فانطلقت أطلبه فاستقبلته فلما رأى عرف الذي جئت له فبال ثم ضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه .

২। আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন আমি জানতাম না যে কিভাবে তায়াম্মুম করতে হবে। ফলে এ বিষয়ে জানার জন্য আমি রাসূল (ﷺ) এর কাছে আসলাম। কিন্তু তাকে পেলাম না। অতঃপর আমি তাঁর খোজে বের হয়ে তাকে খুজে পেলাম। তিনি

---

[৬৬৭] আল মুগনী (১/১৬৬), আল মুহাল্লা (২/১৩৮)।
[৬৬৮] সহীহ; বুখারী (১)।
[৬৬৯] মুগনী (১/১৫৯), মুহাল্লা (২/১৪৬), ফাতাওয়া (২১/৪২২)।
[৬৭০] সহীহ; বুখারী (৩৩৮), মুসলিম (৭৯৮)।

www.waytojannah.com

আমাকে দেখে আমার আগমনের কারণ বুঝতে পারলেন। এরপর তিনি পেশাব করলেন। অতঃপর তিনি দু'হাত মাটিতে মারলেন এবং তা দিয়ে তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মাসাহ করলেন।[৬৭১]

অপর দিকে বিদ্বানদের একটি দল তায়াম্মুমের জন্য দু'বার হাত মাটিতে মারার কথা বলেছেন। একবার মুখমন্ডলের জন্য আরেকবার দু'হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার জন্য।

এটা হানাফী, মালিকী ও শাফেঈ মাযহাব এর অভিমত। সাওরী ও লাইস এ অভিমতটিই পেশ করেছেন। ইবনে উমার, শা'বী, হাসান বসরী ও অন্যান্যদের থেকে এ অভিমতটিই বর্ণিত হয়েছে।[৬৭২]

তাদের দলীল নিম্নরূপ:

(১) عن بن عمر عن النبي ﷺ قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين

১। ইবনে উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) বলেন: তায়াম্মুমে দু'বার হাত মারতে হয়। একবার মুখমন্ডলের জন্য। আর একবার দু'হাত কুনই পর্যন্ত মাসাহ করার জন্য।[৬৭৩]

২। ইবনে উমার থেকে এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যিনি রাসূল (ﷺ) এর হাজত পালনের সময় তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁকে সালাম প্রদান করেন। অত্র ঘটনায় রয়েছে:

«ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ»

রাসূল (ﷺ) তাঁর দু'হাতকে দেয়ালে মারলেন এবং তা দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন। অতঃপর আবার দেয়ালে মেরে দু'বাহু মাসাহ করলেন। এরপর ব্যক্তিটির সালামের জবাব দিলেন।[৬৭৪]

৩। **আবূ জুহাইম (رضي الله عنه)এর এক বর্ণনায় এসেছে:**

حَتَّى قَامَ إِلَى جِدَارٍ فَحَتَّهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ.

অর্থাৎ: রাসূল (ﷺ) এক দেয়ালের কাছে আসলেন এবং তার লাঠিটি দ্বারা তাতে আঘাত করলেন। অতঃপর তার দু'হাতকে দেয়ালে রাখলেন এবং তা দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন এবং দু'বাহু মাসাহ করলেন। এরপর আমার সালামের জবাব দিলেন।[৬৭৫]

(৪) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ «تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالصَّعِيدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ، ثُمَّ مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ»

---

[৬৭১] এর সনদ দুর্বল (لين) ইবনু আবী শাইবাহ (১/১৫৯) এর পূর্বের অংশ এর সাক্ষ্য দেয়।

[৬৭২] মাবসূত্ব (১/১০৬), ইস্তিযকার (৩/১৬২), মাজমূ' (২/২৪২)।

[৬৭৩] যঈফ; হাকিম (১/১৭৯), বাইহাকী (১/২০৭)। বাইহাক্বী হাদীসটিকে মাওকূফ হিসেবে প্রধান্য দিয়েছেন।

[৬৭৪] যঈফ; আবূ দাউদ (১/৮৮), বাইহাকী (১/২০৬), এ হাদীসকে ইমাম আহমাদ মুনকার বলেছেন।

[৬৭৫] মুনকার; ইমাম শাফেঈ তার মুসনাদ (১৩০), গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বাইহাক্বী (১/২০৫), পূর্ব বর্ণিত সহীহাইনের বর্ণনাটি এ হাদীসের বিরোধী।

Contents

৪। আম্মার বিন ইয়াসির (رضي الله عنه) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা তাঁরা ফজরের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটি দ্বারা সায়াম্মুম করেন এবং এ সময় তারা রাসূল (ﷺ) এর সাথে ছিলেন। প্রথমে তাঁরা তাদের দুই হাতের তালু পাক মাটির উপর মেরে মুখমণ্ডল একবার মাসাহ করেন। অতঃপর দুই হাত মাটির উপর মেরে তাদের উভয় হাতের বগল পর্যন্ত মাসাহ করেন।[৬৭৬]

আমার বক্তব্য: বিশুদ্ধ অভিমত হলো, তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে একবার মাটিতে হাত মেরে মুখমণ্ডল ও দুহাতের কব্জি পর্যন্ত বুলাতে হবে। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। **এর কারণ দু'টি-**

(১) বিরুদ্ধবাদীদের স্বপক্ষে বর্ণিত হাদীসগুলোর সবই যঈফ। এর স্বপক্ষে কোন সহীহ মারফূ হাদীস সাব্যস্ত নেই।

(২) তায়াম্মুমের হুকুমটা সাধারণভাবে দু'হাতের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং চোরের হাত কাটার মতই এতে দু'বাহু অন্তর্ভুক্ত হবে না। চুরির ক্ষেত্রে চোরের হাত কাটার স্থান সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের দলীলটা এর প্রমাণ বহন করে, যা আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। তেমনি ভাবে আল্লাহর বাণী,

﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾

অর্থাৎ: সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত দ্বারা মাসাহ কর *(সূরা মায়িদা-৬)"* একই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। আর হাত কর্তন করার ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো, তা কব্জি পর্যন্ত কর্তন করা।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ:

যে সমস্ত নাপাকীর কারণে ওযূ নষ্ট হয়, সে সমস্ত কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়। ইসলামী পণ্ডিতদের মাঝে এ মাসয়ালাটির ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।[৬৭৭]

তায়াম্মুমের সাথে সংশ্লিষ্ট মাসায়েল:

তায়াম্মুম করার পর সালাত আরম্ভ হওয়ার সময় পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম দ্বারা সালাত বিশুদ্ধ হবে কিনা?

ইবনে আব্দুল বার বলেন:[৬৭৮]

বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি পানি সন্ধান করার পর পানি না পাওয়ার ফলে তায়াম্মুম করে, অতঃপর সালাত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পানি পেয়ে যায়, তাহলে তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে এবং তা দ্বারা সালাত আদায় করা বৈধ হবে না। বরং সে এ অবস্থা থেকে ফিরে তায়াম্মুম পূর্ব অবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবে।

---

[৬৭৬] মুযত্বারিব; আবূ দাউদ (১/৮৪), ইবনু মাজাহ (৫৭১), নাসাঈ (১/১৬৮), বাইহাকী (১/২০৮)।
[৬৭৭] ইবনু হাযম প্রণীত আল মুহাল্লা (২/১২২)।
[৬৭৮] ইস্তিযকার (৩/১৬৭)।

www.waytojannah.com

কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে সালাত আরম্ভ করল, অতঃপর সালাতরত অবস্থায় পানি উপস্থিত হলো, তাহলে কি সে সালাত পূর্ণ করবে না বাতিল করবে?

এ মাসআলাটির ব্যাপারে বিদ্বানগণের মাঝে দু'টি অভিমত পরিলক্ষিত হয়:

১ম: এ মতাবস্থায় সালাত ছেড়ে দিয়ে পানি ব্যবহার করা তার জন্য আবশ্যক। অতঃপর প্রথম থেকে নতুন করে সালাত আদায় করা বাঞ্ছণীয়।
এটা ইমাম আবূ হানীফা ও আহমাদ (রাহি.) এর মাযহাব। সাওরী ও ইবনে হাযম (রাহি.) এ অভিমতের কথাই বলেছেন।[৬৭৯] **তাদের দলীল:**

(১) মহানাবী (ﷺ) বলেন,

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ،

অর্থাৎ: পবিত্র মাটি মুসলমানকে পবিত্রতা দানকারী, যদিও সে দশ বছর যাবৎ পানি না পায়। যখন সে পানি পেয়ে যাবে, তখন সে যেন তার চামড়া ধুয়ে নেয়।[৬৮০]
তারা বলেন: এর দ্বারা পানি পাওয়া শর্ত করা হয়েছে।

(২) তারা বলেন: সালাতের বাইরে যেমন পানি উপস্থিত হলে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যায় তদ্রুপ সালাতরত অবস্থায় পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়ার কারণেও তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে।

(৩) তারা আরও বলেন: তায়াম্মুম হলো জরুরী ভিত্তিতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য। সুতরাং পানি পাওয়ার ফলে জরুরী অবস্থা দূর হয়ে যাবে। যেমন: মুস্তাহাযাহ মহিলা রক্ত বন্ধ হওয়ার পর পবিত্রতা অর্জন করে।

২য়: সালাত ছেড়ে না দিয়ে তা পূর্ণ করে নিবে:
এটা ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রাহি.) এর মাযহাব এবং ইমাম আহমাদের ২য় অভিমত। তবে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি এ অভিমত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আবূ সাওর, দাউদ ও ইবনে মুনযিরও এ অভিমতের প্রবক্তা।[৬৮১]
তাদের দলীল:
(১) আল্লাহর বাণী:

﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

অর্থাৎ: তোমরা তোমাদের আমল সমূহ বাতিল কর না *(সূরা মুহাম্মাদ-৩৩)*।

তারা বলেন: এ কারণে তার সালাত থেকে বের হওয়া বৈধ নয়।

(২) পবিত্রতা অর্জনের জন্য একটি সময় রয়েছে আর সালাত আদায়ের জন্য একটি সময় রয়েছে। সুতরাং সালাত শুরু করার পর সে ত্বহারাতের "ফারযিয়্যাত" এর জন্য আনুগত্যকারী নয়। কেননা সে নির্দেশিত পন্থায় তায়াম্মুম করেছে, তাই সালাতের তাকবীরের মাধ্যমে ত্বহারাতের "ফারযিয়্যাত" থেকে

---

[৬৭৯] আল মাবসূত্ব (১/১২০), আল মুগনী (১/১৬৭), ইস্তিযকার (৩/১৭০), আল মুহাল্লা (২/১২৬)।
[৬৮০] যঈফ, এ হাদীসের হাসান হওয়া নিয়ে ইখতেলাফ করা হয়েছে; তিরমিযী (২১৪), আবূ দাউদ (৩২৯), নাসাঈ (১/১৭১), এ আলোচনা 'গোসল' অধ্যায়েও হয়েছে।
[৬৮১] ইস্তিযকার (৩/১৬৯), মাজমূ' (২/৩৫৮), আওসাত্ব (২/৬৫)।

Contents

মুক্ত হয়ে গেছে। অতএব, কুরআন ও সুন্নাহ এবং ইজমার দলীল ব্যতীত তার পবিত্রতা নষ্ট করা বৈধ হবে না। কেননা এর সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর তার উপর ফরযকৃত সালাতের যতটুকু সালাত আদায় করেছে তা বাতিল করাও বৈধ হবে না।

আমার বক্তব্য: আমার কাছে যেটা বিশুদ্ধ মনে হয়, তা হলো সে সালাত পূর্ণ করবে। কেননা সালাত আরম্ভ করার পর সালাত বাতিল করা ওয়াজিব হওয়ার কোন দলীল সাব্যস্ত নেই। যেমন কেউ যদি কাফ্ফারার সিয়াম পালন শুরু করার পর সিয়ামরত অবস্থায় দাস পেয়ে যায় তাহলেও সে সিয়াম ভঙ্গ করবে না। আল্লাহই ভাল জানেন।

যে ব্যক্তি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল, অতঃপর সালাতের সময় অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পানি উপস্থিত হলো, তাহলে কি সে পুনরায় সালাত আদায় করবে?

বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমতে, যে ব্যক্তি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল, অতঃপর সালাতের সময় অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পানি উপস্থিত হলো, তাহলে তাকে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না। এটা ইমাম মালিক, সাওরী, আওযায়ী, মাযিনী, ত্বহাবী (রাহি.) এর অভিমত। একটি বর্ণনা মতে আহমাদ এ অভিমত পেশ করেছেন। ইবনে হাযমও এ মতের প্রবক্তা।[৬৮২]

অপরদিকে আবূ হানীফা ও শাফেঈ (রাহি.) এর মতে:[৬৮৩] পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে।

তাদের এ অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করে ইবনে হাযম বলেন: ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেঈ (রাহি.) এর কথা স্পষ্ট ভুল। কেননা তাদের এ নির্দেশটা তায়াম্মুম ও সালাতের ক্ষেত্রে দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো বা তাদের এ নির্দেশটা ফরয সালাতের ক্ষেত্রে হবে অথবা ফরয নয় এমন সালাতের ক্ষেত্রে হবে। এ ছাড়া ৩য় কোন প্রকার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদি তাদের অনুসারীগণ বলেন: তাদের এ নির্দেশটা ফরয সালাতের ক্ষেত্রে, তাহলে আমরা বলব: সময়ের পরে সালাতের পুনরাবৃত্তি করার দরকার কি? ফরয তো আদায় হয়েই গেছে। আর যদি তারা বলেন: তাদের এ নির্দেশটা ফরয ব্যতীত অন্য সালাতের ক্ষেত্রে; তাহলে এটা স্বীকার করতেই হয় যে, তারা এমন একটি বিষয়কে আবশ্যক করে নিয়েছেন যা আবশ্যক নয়। আর এরূপ করাতো ভুল।

আমার বক্তব্য: হ্যাঁ, পুনরায় তার উপর সালাত আদায় করা ওয়াজিব নয়। তবে সময় থাকা অবস্থায় পানি পাওয়া গেলে পুনরায় সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ» . وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»

---

[৬৮২] দেখুন, মাজমূ' (২/৩৫৩), আল মুহাল্লা (২/১৩৯)।

[৬৮৩] মাজমূ (২/৩৫৩)।

www.waytojannah.com

অর্থাৎ: আবূ সাঈদ আল-খুদরী (ﷺ)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে সালাতের সময় উপস্থিত হয় আর তারা পানি না পাওয়ায় তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে। অতঃপর উক্ত সালাতের সময়ের মধ্যে পানি প্রাপ্ত হওয়ায় তাদের একজন ওযূ করে পুনরায় সালাত আদায় করল এবং অপর ব্যক্তি সালাত আদায় করা হতে বিরত থাকে। অতঃপর উভয়েই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর খিদমতে হাযির হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি (ﷺ) বলেন ঃ তোমাদের যে ব্যক্তি সালাত পুনরায় আদায় করে নি সে সুন্নাত মোতাবেক কাজ করেছে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি ওযূ করে পুনরায় সালাত আদায় করেছে তার সম্পর্কে বলেন, তুমি দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হয়েছ।[৬৮৪]

হায়য ও নিফাস প্রসঙ্গ (الحيض والنفاس)[৬৮৫]

মহিলাদের লজ্জাস্থান হতে স্বভাবগতভাবে নির্গত রক্ত ৩ প্রকার। যথা:

(১) হায়যের রক্ত (دام الحيض)

(২) নিফাসের রক্ত (دام النفاس)

(৩) ইস্তিহাযার রক্ত (دام الإستحاضة)

হায়যের রক্ত (دام الحيض)[৬৮৬]:

এটা দূর্গন্ধযুক্ত, ঘন ও কালো রঙের রক্ত, যা নির্দিষ্ট সময়ে মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে বের হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বনী আদমের প্রত্যেক মহিলার উপর এ রক্তকে অবধারিত করে দিয়েছেন। যেমনটি রাসূল (ﷺ) আয়িশা সিদ্দীকাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

"হে আয়িশা! আল্লাহ তা'আলা হায়যের রক্তকে প্রত্যেক আদম কন্যার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন" *বুখারী (হা-২৯৪) ও মুসলিম (হা-১২১৩)*। এছাড়া মা হাওয়া (عليها السلام) এর মাধ্যমে প্রথম হায়যের সূত্রপাত ঘটেছিল মর্মে প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (১/৪০০) ইমাম হাকিম ও ইবনে মুনযির হতে সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, "জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর সর্বপ্রথম মা হাওয়ার মাধ্যমে হায়যের সূত্রপাত হয়েছিল"।

হায়যের সময়সীমা:

হায়যের সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ কোন সময়সীমা নেই। সুতরাং প্রত্যেক নারীর হায়যের নিয়মের উপর তার সময়সীমা নির্ধারিত হবে। কেননা নাবী করীম (ﷺ) থেকে এ মর্মে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহি.) বলেন, যারা ইমাম শাফেঈ ও আহমাদের মতে হায়যের

---

[৬৮৪] এ হাদীসকে আলবানী সহীহ বলেছেন; আবূ দাউদ (৩৩৪), নাসাঈ (১/২১৩)।

[৬৮৫] আমার গ্রন্থ "ফিক্বহুস সুন্নাহ লিন নিসা" থেকে চয়িত (পৃঃ৫৫-৬৯), আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে আমি এর সহজ বিষয়ের সামান্য কিছু আলোচনা করেছি, মূলতঃ ফিক্বহ শাস্ত্রে এ সংক্রান্ত দীর্ঘ অলোচনা রয়েছে।

[৬৮৬] "الحيض"এর আরও কিছু সমার্থক শব্দ আছে, যেমন: -الإعصار -الإكبار -الضحك -العراك -الطمث -আল মুহাযযাব (১/১৪১)।

Contents

সর্বোচ্চ সময় পনের দিন এবং সর্বনিম্ন সময় একদিন অথবা ইমাম মালিকের মতে কোন সময়সীমা নেই বলে উল্লেখ করেন, তাদের এই মত কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং এটা প্রত্যেক নারীর হায়যের নিয়মের উপর নির্ভরশীল। যেমনটি আমরা পূর্বে আলোচনা করলাম। (আল্লাহই অধিক অবগত)[৬৮৭]

হায়যের শুরু ও শেষ:[৬৮৮]

১। হায়যের শুরু বুঝা যায়, সম্ভাব্য সময়ে লজ্জাস্থান থেকে দূর্গন্ধময়, পাতলা ও কালো রক্ত নির্গত হওয়া দ্বারা।

২। হায়যের শেষ সময় তথা হায়যের পরিসমাপ্তি বুঝা যায়, লজ্জাস্থান থেকে সাধারণ রক্ত, ফ্যাকাশে বর্ণের রক্ত ও পঙ্কিলতা নির্গত হওয়া বন্ধের দ্বারা। এটা নিম্নোক্ত দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা করা যেতে পারে। যথা-

ক। الجفوف (শুষ্কতা): অর্থাৎ কোন মহিলা তার লজ্জাস্থানে তুলা বা ন্যাকড়া প্রবেশ করানোর পর তা শুষ্ক বের হলে, তার হায়যের সময় শেষ হয়েছে বলে ধরে নিবে।

খ। القصة البيضاء (পূর্ণ সাদা পানি): অর্থাৎ এক ধরনের সাদা পানি বিশেষ, যা হায়য বন্ধের সময় লজ্জাস্থান থেকে নির্গত হয়। এ প্রসঙ্গে আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এর দাসী একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে,

كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ فَتَقُولُ لَهُنَّ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ

অর্থাৎ: মহিলারা আয়িশা (রা.) এর নিকট কৌটায় করে তুলা প্রেরণ করত। তাতে হলুদ রং এর ঋতুর রক্ত লেগে থাকত। তারা এ অবস্থায় সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে তাঁর নিকট জানতে চাইতেন। উত্তরে তিনি বলতেন, তাড়াহুড়ো করো না, পূর্ণ সাদা বর্ণ দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এর দ্বারা তিনি হায়য হতে পবিত্র হওয়া বুঝাতেন"।[৬৮৯]

হায়য থেকে পবিত্র হওয়ার পর الصُّفْرَةُ ও الكدرة এর বিধান:

'সুফরা' ও 'কুদরা' হলো এমন পানি, যা দেখতে পুঁজের ন্যায় এবং এর রং অনেকটা হলুদ বর্ণের। কোন মহিলা যদি লজ্জাস্থান থেকে রক্ত নির্গত বন্ধ ও লজ্জাস্থান শুষ্ক পাবার পর এ ধরনের অবস্থা লক্ষ করে, তবে তা হায়য হিসেবে গণ্য করবে না। বরং সে পবিত্র। এ অবস্থায় সে সালাত, সিয়াম, সহবাস প্রভৃতি বৈধ কাজ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে উম্মে আতিয়্যার হাদীসটি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন:

«كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ، وَالصُّفْرَةَ (بَعْدَ الطُّهْرِ) شَيْئًا»

---

[৬৮৭] জামি' আহকামিন নিসা (১/১৭৯), আল মুহাল্লা (২/১৯১) আল মুগনী (১/৩০৮)।

[৬৮৮] জামি' আহকামিন নিসা (১/২০০- এবং তার পরবর্তী অংশ)।

[৬৮৯] হাসান লিগাইরিহী; মালিক (৫৯ পৃ.) বুখারী মুয়াল্লাক্ব সূত্রে (১/৪২০ ফাতহুল বারী), মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (১/৩০২), দুর্বল সূত্রে। তবে দারেমীতে একটি শাহেদ হাদীস আছে, (১/২১৪), বাইহাক্বী (১/৩৩৭) এর দ্বারা উক্ত হাদীস সহীহ বলে সাব্যস্ত হয়। (আল্লাহই অধিক অবগত)।

www.waytojannah.com

রক্তস্রাব হতে পবিত্রতার পর মেটে ও হলুদ রং কে আমরা হায়য হিসেবে ধর্তব্য মনে করতাম না।[৬৯০]

প্রসঙ্গ কথা:

১। আলিমদের বড় একটি দলের মতে:

কোন মহিলা যদি পবিত্র হওয়ার পর গোসলের জন্যে পানি না পায়, তবে শুধু মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে স্বামীর সাথে সহবাসে মিলিত হতে পারবে।[৬৯১]

২। যদি কোন মহিলার অভ্যাসের অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হয়, তাহলে তার করণীয় কি?

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন মহিলার প্রত্যেক মাসে নিয়মিত ৬ দিন ঋতুস্রাব হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে কোন কোন মাসে যদি ৭ দিন, ৮ দিন বা ১০ দিন ঋতুস্রাব হয়, তাহলে সে কি করবে? এর উত্তরে আমরা বলব, এ ধরনের মহিলারা নিম্নোক্ত দুটি অবস্থার বাহিরে নয়।

(ক) যথাসাধ্য হায়যের রক্ত ও অন্য রক্তের মাঝে পার্থক্য করার চেষ্টা করবে। এ অবস্থায় যদি দেখে যে, লজ্জাস্থান থেকে নির্গত রক্তের রং, গন্ধ ও বৈশিষ্ট্য হায়যের রক্তের ন্যায় হয়, তাহলে পূর্বের ন্যায় সালাত, সিয়াম ও সহবাস থেকে বিরত থাকবে। কেননা কুরআন হাদীসে হায়যের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা বর্ণিত হয় নি। যেমনটি আমরা পূর্বেও আলোচনা করে এসেছি। আর যদি এ নির্গত রক্ত হায়যের রক্তের সাথে না মিলে, তাহলে সে গোসল করে সালাত আদায় করে নিবে।

(খ) আর যদি নির্গত রক্ত পার্থক্য করা সম্ভব না হয়। যা কিছু কিছু মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। তাহলে সে এ রক্তকে হায়যের রক্ত মনে করে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সালাত, সিয়াম, ও সহবাস থেকে বিরত থাকবে। কেননা হায়যের কোন সর্বোচ্চ সময়সীমা নেই।[৬৯২]

৩। হায়যের নির্ধারিত সময়ের মাঝখানে রক্ত বন্ধ হয়ে পুনরায় দেখা দিলে করণীয়:

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন মহিলার কোন মাসে একটানা দু'দিন ঋতুস্রাব হয়ে ৩য় দিন বন্ধ হয়ে গেল, এরপর আবার ৪র্থ দিন হায়যের রক্ত দেখা দিল। তাহলে বিশুদ্ধ অভিমতে, এরূপ অবস্থায় করণীয় হলো, হায়যের নিয়মিত সময়ের মধ্যে রক্ত নির্গত হওয়া বন্ধ হলেও তা হায়য বলে বিবেচিত হবে। শুধু রক্ত বন্ধের কারণে পবিত্র বিবেচনা করা যাবে না। কেননা এখানে পবিত্রতার আলামত দেখাটাই মূল বিবেচ্য বিষয়। আর সে পবিত্রতার অর্থ হলো, পূর্ণ সাদা বর্ণ দেখা, যা মহিলাদের কাছে সুপরিচিত।[৬৯৩]

---

[৬৯০] আবূ দাউদ (৩০৭), নাসাঈ (১/১৮৬), ইবনু মাজাহ (৬৪৭) প্রভৃতি। (بَعْدَ الطُّهْرِ) অতিরিক্ত এ অংশটুকু সাব্যস্ত নয়। তবে হাদীসের চাহিদা অনুযায়ী অর্থগত ভাবে তা সাব্যস্ত ধরা হয়, যেমন বুখারী (রাহি.) এর সমর্থনে অধ্যায় রচনা করেছেন এবং অতিরিক্ত অংশটুকু ছাড়া হাদীস বর্ণনা করেছেন (৩২৬)।

[৬৯১] মাজমূ' আল ফাতাওয়া (১/৬২৫), আল মুহাল্লা (২/১৭১), শারহে মুসলিম (১/৫৯৩), জামি' আহকামিন নিসা (১/১৫২)।

[৬৯২] জামি' আহকামিন নিসা (১/২১৫), ইবনু উসাইমীনের ফাতাওয়া উল মারআত।

[৬৯৩] ফাতাওয়া উল মারআত, সংকলক মুহাম্মাদ আল মুসনাদ (পৃ.২৬০)।

Contents

৪। গর্ভবতী মহিলারা কি ঋতুবতী হয়?[৬৯৪]

এ ক্ষেত্রে উলামাদের মাঝে দু'ধরনের মত পরিলক্ষিত হয়।

(ক) অধিকাংশ বিদ্যানের মতে: গর্ভবতী মহিলা ঋতুবতী হয় না। এ ক্ষেত্রে তারা আবূ সাঈদ খুদরী (ﷺ) বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (ﷺ) বলেন:

«لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»

অর্থাৎ: কোন গর্ভবতী বন্দিনীর সাথে তার সন্তান প্রসবের আগে এবং কোন রমনীর সাথে তার হায়য হতে পবিত্র হওয়ার পূর্বে সহবাস করবে না।[৬৯৫]

এছাড়াও তারা প্রমাণ হিসেবে বলেন: দাসীর স্বাধীন হওয়াটা হায়যের সাথে বিবেচ্য যা জরায়ু বাচ্চামুক্ত হওয়ার দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু যদি গর্ভবতী মহিলার হায়য হয়, তাহলে হায়য দ্বারা জরায়ু মুক্ত হওয়া পূর্ণ হবে না।

(খ) ইমাম শাফেঈ ও একদল আলিমের মতে: গর্ভবতী মহিলা ঋতুবতী হয়।

তবে এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, প্রকৃতি ও প্রচলিত সাধারণ নিয়মানুযায়ী বুঝা যায় যে, গর্ভবতী মহিলা ঋতুবতী হয় না। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো, এ সময় কোন কোন গর্ভবতী মহিলার রক্ত নির্গত হয়। এ ক্ষেত্রে সে রক্ত যদি রং, গন্ধ ও বৈশিষ্ট্যে হায়যের রক্তের সাথে মিলে যায় এবং নিয়মিত সময়ের মধ্যে হয়, তাহলে এটাকে হায়য হিসেবে গণ্য করে সালাত, সিয়াম ও সহবাস প্রভৃতি কাজে থেকে বিরত থাকবে। তবে এই হায়য ইদ্দতের মাসআলায় প্রযোজ্য হবে না। কেননা মহান আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

অর্থাৎ: "আর গর্ভধারিনীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত" *(সূরা ত্বলাক- ৪)*।

আর যদি গর্ভবতীর নির্গত এ রক্তের বৈশিষ্ট্য হায়যের রক্তের সাথে না মিলে ও অনিয়মিত হয়, সেক্ষেত্রে এটা ধর্তব্য হবে না। যেমন ইস্তিহাযার রক্ত।

হায়য ও নিফাস অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

১। সালাত: সকল উলামার ঐক্যমতে: হায়য ও নিফাস অবস্থায় ফরয, নফলসহ সকল ধরনের সালাত আদায় করা হারাম। অনুরূপভাবে পবিত্র হওয়ার পর ফরয সালাতের পুনরায় কাযা আদায় না করার ব্যাপারেও বিদ্বানগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[৬৯৬] আবূ সাঈদ খুদরী, রাসুল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেন:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»

অর্থাৎ: হায়য অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকে না? দীনের ক্ষেত্রে এটা তাদের একটা ঘাটতি।[৬৯৭]

মুয়ায থেকে বর্ণিত, একজন মহিলা আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন:

---

[৬৯৪] জামি' আহকামিন নিসা (১/২০৮)।

[৬৯৫] হাসান লিগাইরিহী; আবূ দাউদ (২১৫৭), আহমাদ (৩/৬২) এ হাদীসের একটি শাহেদ আছে দারাকুতনী (৩/২৫৭)-এ।

[৬৯৬] ইমাম নববী প্রণীত, মাজমূ (২/৩৫১) ইবনে হাযম প্রণীত মুহাল্লা, (২/১৭৫)।

[৬৯৭] সহীহ; বুখারী (১৯৫১), মুসলিম (৮০) প্রভৃতি।

www.waytojannah.com

أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ «كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ» أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نَفْعَلُهُ

আমাদের জন্য হায়য কালীন কাযা সালাত পবিত্র হওয়ার পর আদায় করলে চলবে কি না? আয়িশা (রা.) বললেন, তুমি কি হারূরিয়্যা[৬৯৮] (খারিজীদের একটি দল, যারা ঋতুবতীর জন্য সালাতের কাযা ওয়াজিব মনে করত)? আমরা নাবী (ﷺ) এর সময়ে ঋতুবতী হতাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে সালাত কাযার নির্দেশ দিতেন না। অথবা তিনি বললেন, আমরা তা কাযা করতাম না।[৬৯৯]

প্রসঙ্গ কথা:

ক। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন মহিলার আসরের কিছুক্ষণ পূর্বে হায়য হয় এবং যুহরের সালাত আদায় না করে থাকলে, পবিত্র হওয়ার পরে কি তাকে যুহরের সালাত কাযা আদায় করতে হবে?

অধিকাংশের মতে, যদি কোন নারীর আসরের সময়ের কিছুক্ষণ পূর্বে মাসিক (হায়য) হয় এবং সে যুহরের সালাত আদায় না করে থাকে, তাহলে তার ছুটে যাওয়া যুহরের সালাত কাযা আদায় করতে হবে। তবে পবিত্র অবস্থায় যুহরের অন্তত এক রাক'আত সালাত আদায় করা যেত, এমন সময়ের মধ্যে যদি তার হায়য শুরু হয়ে থাকে, তাহলে কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা মহান আল্লাহ্ বলেন:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

অর্থাৎ: নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয *(সূরা নিসা-১০৩)*।

এ ব্যাপারে আলিমদের আরেকটি অভিমত হলো: তাকে পুনরায় যুহরের সালাত কাযা করতে হবে না। তাদের দলীল হলো: রাসূল (ﷺ) এর যামানায় মহিলারা বিভিন্ন সময়ে ঋতুবতী হতেন। কিন্তু পবিত্র হওয়ার পর তাদেরকে হায়যের পূর্বে ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করতে বলেছেন মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহি.)'ফাতাওয়া' গ্রন্থে (২৩/২৩৫) বলেন: পুনরায় কাযা আদায় করতে হবে না মর্মে ইমাম আবূ হানীফা ও মালিকের অভিমতটিই দলীলের ক্ষেত্রে অধিক স্পষ্ট। কেননা নতুন দলীলের ভিত্তিতে কাযা সাব্যস্ত হবে। এখানে এমন কোন দলীল নেই, যাতে কাযা আদায় করতে হবে। কেননা সে মহিলা বৈধ জেনেই সালাত বিলম্বিত করেছিল। এটা তার বাড়াবাড়ি ছিল না। যেমন ঘুমন্ত ও ভুলে যাওয়া ব্যক্তি যখন সে জাগ্রত হয় বা তার স্মরণ হয়, তখনই তার সালাত আদায়ের সময়। এটাকে কাযা আদায় বলা হয় না।

খ। উদাহরণ স্বরূপ, আসরের কিছুক্ষণ পূর্বে পবিত্র হলো এবং গোসল করার পর পরই আসরের সময় হয়ে গেলে, তাকে কি যুহরের সালাত কাযা আদায় করতে হবে?

এর সমাধান হলো: যদি সে হায়য বা নিফাস থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে পবিত্র হয়, তাহলে ঐ দিনের যুহর ও আসরের সালাত আদায় করে নিবে। অনুরূপভাবে যদি সে ফজর উদয়ের আগে পবিত্র হয়, তাহলে ঐ রাতের মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করে নিবে। কেননা ওযরের ক্ষেত্রে সালাতের দ্বিতীয় সময়টিই প্রথম সালাতের সময়।

---

[৬৯৮] খারিজীদের একটি দল, যারা ঋতুবতীর জন্য সালাতের কাযা ওয়াজিব মনে করত।

[৬৯৯] সহীহ: বুখারী (৩২১), মুসলিম (পৃ. ২৬৫)।

Contents

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: এ কারণেই অধিকাংশ আলিম তথা ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমাদের মতে, ঋতুবতী মহিলা যদি দিনের শেষভাগে পবিত্র হয় তাহলে ঐ দিনের যুহর ও আসর উভয় সালাত আদায় করে নিবে। আর যদি রাতের শেষ ভাগে পবিত্র হয় তাহলে ঐ রাতের মাগরিব ও এশার উভয় সালাত আদায় করে নিবে। এটা আব্দুর রহমান ইবনে আউফ আবূ হুরাইরা ও ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। কেননা ওযরের ক্ষেত্রে সময়টা দুই সালাতের সাথে সংযুক্ত থাকে। এ কারণে ওযরের ক্ষেত্রে কেউ যদি দিনের শেষভাগে পবিত্র হয়, তাহলে তার যুহরের সালাতের সময় অবশিষ্ট থাকায় আসরের পূর্বে যুহরের সালাত আদায় করতে হবে। আবার কেউ যদি রাতের শেষভাগে পবিত্র হয়, তাহলে তার মাগরিব সালাতের সময় অবশিষ্ট থাকায় এশার পূর্বে মাগরিবের সালাত আদায় করতে হবে। (আল্লাহই অধিক অবগত আছেন)

২। সিয়াম: সকল উলামার ঐক্যমতে: নারীরা হায়য ও নিফাসের সময় সিয়াম রাখা বন্ধ রাখবে। তবে রমযানের সিয়াম পরবর্তীতে কাযা আদায় করে নিবে। আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন:

«كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»

অর্থাৎ: হায়য হলে, সিয়াম কাযা করা ও সালাত কাযা না করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেয়া হত।[৭০০]

প্রসঙ্গ কথা:

ক। যে ফজরের পূর্বে হায়য হতে পবিত্র হয়েছে, কিন্তু গোসল করে নি। সে সিয়াম রাখবে কি?

উত্তর: অধিকাংশের মতে, ঋতুবতী নারী যদি ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়ে সিয়ামের নিয়ত করে তাহলে তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে। কেননা সিয়াম বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে সালাতের ন্যায় গোসল জরুরী নয়।[৭০১]

খ। যে সূর্যাস্তের পূর্বে হায়য হতে পবিত্র হয়, সে দিনের বাকি সময় সিয়াম রাখবে কি?

উত্তর: তার জন্য দিনের অবশিষ্ট সময় সিয়াম রাখা জরুরী নয়। কেননা সে দিনের প্রথম অংশে সিয়াম ছেড়ে দেয়ার কারণে পরবর্তীতে তার কাযা আদায় করতে হবে। অতএব দিনের বাকী সময় সিয়াম রাখার কোনই দরকার নেই।

ইবনে জুরাইস (ﷺ) বলেন: আমি আত্বাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, المراة تصبح حائضا ثم تطهر في بعض النهار أتتمه قال لا هي قاضية - অর্থাৎ: কোন মহিলা যদি ঋতুবতী অবস্থায় সকাল করে এবং পরবর্তী সময়ে পবিত্র হয়, তাহলে কি সে সিয়াম পূর্ণ করবে? তিনি বললেন, না। বরং তা কাযা আদায় করবে।[৭০২]

৩। সহবাস করা:

সকল উলামার ঐক্যমতে: হায়য অবস্থায় সহবাস হারাম।[৭০৩] যেমন মহান আল্লাহ্ এটা হারাম ঘোষণা করে এরশাদ করেন:

---

[৭০০] সহীহ; মুসলিম (৩৩৫), আবূ দাউদ (২৬৩)।

[৭০১] ফাতহুল বারী (১/১৯২)।

[৭০২] এর সনদ সহীহ; আব্দুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন (১২৯২), সনদ সহীহ।

[৭০৩] মুহাল্লা (২/১৬২), মাজমূউল ফাতওয়া (২১/৬২৪), তাফসীরে ত্বাবারী (৪/৩৭৮)।

www.waytojannah.com

﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾

অর্থাৎ: সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক (*সূরা বাকারা:*২২২)। রাসূল (ﷺ) বলেন:

اصنعوا كل شيئ إلا النكاح

অর্থাৎ: এ অবস্থায় তোমরা সহবাস ব্যতীত তাদের সাথে সবকিছু করতে পার।[৭০৪] শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, সকল আলিমের ঐক্যমতে, নিফাস অবস্থায় হায়যের ন্যায় সহবাস হারাম।

প্রসঙ্গ কথা:

ক। যদি কোন মুসলিম হায়য অবস্থায় সহবাস হালাল মনে করে, তাহলে সে কাফির ও মুরতাদ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে যদি কেউ হালাল মনে না করে। বরং ভুলবশতঃ বা হায়য হয় নি মনে করে কিংবা হারাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে সহবাস করে, তাহলে তার কোন গোনাহ হবে না এবং কাফ্ফরাও আদায় করতে হবে না। তবে যদি হায়য হয়েছে জেনেও কিংবা হারাম হওয়া সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃত ভাবে সহবাস করে, তাহলে সে কবীরা গুণাহগার হবে এবং তার উপর তাওবা করা আবশ্যক হবে।[৭০৫] কিন্তু কাফফারা আবশ্যক হবে কিনা, এ ব্যাপারে অধিকাংশের অভিমত হলো, তার উপর কাফফারা আবশ্যক হবে না। তবে ইমাম আহমাদ এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন।

আর আমার (লেখক) কাছে অধিকাংশের মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। কেননা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, ঋতুবতী একজন মহিলার প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ﷺ) তাকে বলেছিলেন: অর্থাৎ: "এক দিনার অথবা অর্ধ দিনার সাদকা কর"।[৭০৬] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি দূর্বল হওয়ার কারণে দলীলের অযোগ্য। এছাড়া মুসলিম ব্যক্তির সম্পদের ব্যাপারে একটি মূলনীতি হলো, সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত তা কারও জন্য বৈধ নয়।

খ। যারা হায়য অবস্থায় যে সম্ভোগ নিষেধ বলেছেন, তার দ্বারা লজ্জাস্থান উদ্দেশ্য।[৭০৭] কেননা লজ্জাস্থান ব্যতীত ঋতুবতী মহিলার সাথে সকল প্রকার সম্ভোগ বৈধ। এ ক্ষেত্রে আনাস (رضي الله عنه) বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। যখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ -অর্থাৎ: সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক। এ আয়াতের প্রেক্ষিতে রাসূল (ﷺ) বলেন: اصنعوا كل شيئ إلا النكاح। অর্থাৎ: এ অবস্থায় তোমরা সহবাস ব্যতীত তাদের সাথে সবকিছু করতে পার।[৭০৮]

এছাড়া রাসূলের কতক স্ত্রী বর্ণনা করেন:

كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا

---

[৭০৪] সহীহ; মুসলিম (৩০২), আবূ দাউদ, নাসাঈ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।

[৭০৫] ইমাম নববী প্রণীত শারহে মুসলিম (৩/২০৪)।

[৭০৬] যঈফ; আবূ দাউদ (২৬৪), নাসাঈ (১/১৫৩), ইবনে মাজাহ (৬৪০)।

[৭০৭] এটা সাওরী, আহমাদ, ইসহাক, মুহাম্মদ বিন হাসান, ত্বহাবী প্রমুখ হানাফী বিদ্বানের মতামত ও মালিকিয়্যাহদের মতামত এবং ইমাম শাফেঈ (রহঃ) একটি কথা। ইবনে মুনযির ও নববী (রহঃ) (ফাতহুল বারী ১/৪০৪), এ মতটিকে পছন্দ করেছেন। এটা ইবনে হাযম (রহঃ) এর মাযহাব।

[৭০৮] পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

Contents

অর্থাৎ: রাসূল (ﷺ) যখন কোন ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে কিছু করতে চাইতেন, তখন লজ্জাস্থানের উপর কাপড় দিয়ে দিতেন।[৭০৯]

আমার বক্তব্য: লজ্জাস্থান ব্যতীত সকল সম্ভোগ বৈধ কথাটিকে মাসরুক থেকে বর্ণিত হাদীসটি আরও শক্তিশালী করে।
যেমন তিনি আয়িশাকে বলেছিলেন, অর্থাৎ: আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাচ্ছি কিন্তু আমাকে তা বলতে লজ্জা করে। তখন আয়িশা (রা.) বলেন: আমি তোমার মায়ের মত এবং তুমি আমার ছেলের মত। অতঃপর মাসরুক বললেন, হায়য অবস্থায় পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের সাথে কিরূপভাবে মেলামেশা করবে? জবাবে তিনি বললেন: লজ্জাস্থান উপভোগ ব্যতীত তার সাথে সব কিছু করতে পারবে।[৭১০]
এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, রাসূলের স্ত্রী হওয়ার সুবাদে এ মাসআলা সম্পর্কে আয়িশা (রা.) এর অধিক কেউ জানতেন না।

সতর্কতা:
এখানে আলিমদের আরেকটি মন্তব্য হলো: হায়য অবস্থায় সম্ভোগ বৈধ বলতে নাভীর নিচ থেকে হাটু পর্যন্ত উদ্দেশ্য। এ মতেরও দলীল বিদ্যমান।[৭১১] তবে আগের মতটিই অধিক মজবুত। (আল্লাহই অধিক অবগত)।

গ। কোন মহিলা যখন হায়য থেকে পবিত্র হয়, তার পক্ষে গোসল ব্যতীত স্বামীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾

অর্থাৎ: এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন (*সূরা বাকারা:* ২২২)।

মুজাহিদ (রহ) বলেন: নারীদের জন্যে দুটি তুহুর (পবিত্রতা) রয়েছে। প্রথম: আল্লাহ তা'আলার বাণী- حَتَّى يَطْهُرْنَ -অর্থাৎ: পবিত্র হওয়ার পর গোসল ব্যতীত সহবাস বৈধ নয়। তিনি আরও বলেন, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ অর্থাৎ: অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যা হলো: যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। সুতরাং যদি আল্লাহর নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী স্ত্রীর সাথে মেলামেশা না করে, তাহলে সে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।[৭১২]
আর এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ একমত যে, কোন মহিলা পবিত্র হলেও গোসল ব্যতীত স্বামীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হতে পারবে না। তবে ইবনে হাযম (রাহি.) এর বিপরীত মত পেশ করেছেন।

---

[৭০৯] আবূ দাউদ, সনদ সহীহ।
[৭১০] এর সনদ সহীহ ইমাম ত্বাবারী তার তাফসীরে এ হাদীস এনেছেন (৪/৩৭৮), সনদ সহীহ, হাদীসটি কয়েক ভাবে এসেছে।
[৭১১] এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মাযহাব। দেখুন "জামিউ আহকামুন নিসা" (১/১৪০), চাইলে এর পরেও কিছু অংশ দেখতে পারেন।
[৭১২] আব্দুর রাজ্জাক (১২৭২), বাইহাক্বী (১/৩১০), মুজাহিদ পর্যন্ত সনদ সহীহ।

www.waytojannah.com

এখানে একটি প্রশ্ন হলো: কোন মুসলিমের যদি আহলে কিতাব স্ত্রী থাকে, তাহলে তাকে গোসলে বাধ্য করা যাবে কিনা?

এ ক্ষেত্রে সমাধান হলো, ঐ আহলে কিতাবী স্ত্রীকে গোসলে বাধ্য করতে হবে। কেননা গোসল ব্যতীত স্বামীর সহবাসে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়। কারণ আয়াতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে মুসলিম নারীকে নির্দিষ্ট করা হয় নি।[৭১৩]

ঘ। ঋতুবতী মহিলার দায়িত্ব হলো: তার স্বামীকে সহবাস থেকে ফিরিয়ে রাখা। তবে যদি তাকে বাধ্য করা হয়, তাতে সে গোনাহগার হবে না। শুধু আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।[৭১৪]

৪। ত্বওয়াফ করা:

সকল আলিমের ঐক্যমতে: হায়য অবস্থায় ত্বওয়াফ করা বৈধ নয়। যেমন আয়িশা (রা.) হাজ্জের সময় ঋতুবতী হলে রাসূল (ﷺ) তাকে বলেছিলেন: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» অর্থাৎ: হাজীদের মত হাজ্জের সকল কার্যাদি সম্পাদন কর। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বাইতুল্লাহ ত্বওয়াফ কর না।[৭১৫] এ সংক্রান্ত বিভিন্ন অলোচনা 'হাজ্জ অধ্যায়' এ আলোচিত হবে (ইন্‌শা আল্লাহ্‌)।

হায়য অবস্থায় যেসব কাজ বৈধ:

১। আল্লাহর যিকর ও কুরআন পাঠ:

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ঋতুবতী ও জুনুবীর জন্য বিশুদ্ধ অভিমতে আল্লাহর যিকর ও কুরআন পাঠ করা বৈধ। এটা ইমাম আবূ হানীফা এর মাযহাব। প্রসিদ্ধ মতে, ইমাম শাফেঈ ও আহমাদও এ অভিমত পেশ করেছেন।[৭১৬]

আল্লামা ইবনে হাযম "المحلى" গ্রন্থে (১/৭৭-৭৮) বলেন: কুরআন তিলাওয়াত, তিলাওয়াতে সিজদা, মাসহাফ (কুরআন) স্পর্শ ও আল্লাহর যিকর করা উত্তম কাজ। যিকরকারী আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান পাবে। এখন কেউ যদি এগুলোকে কোন কোন অবস্থায় বৈধ নয় বলে দাবী করে, সেক্ষেত্রে প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে।

২। সিজদা এর আয়াত শ্রবণে সিজদা প্রদান:

ঋতুবতী মহিলার সিজদার আয়াত শ্রবণে সিজদা করতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কেননা সালাত ও সিজদা এক নয়। আর সিজদার ক্ষেত্রে পবিত্রতা শর্ত নয়।

সহীহ বুখারীতে (৪৮৬২) এসেছে: রাসূল (ﷺ) একদা সূরা নাযম পড়ে সিজদা দিলেন, যাতে সকল মুসলমান, মুশরিক ও জ্বিনজাতি সিজদা করেছিলেন। একথা বলা অসম্ভব যে, এ জাতিগুলোর সকলেই

---

[৭১৩] তাফসীরে কুরতুবী (৩/৯০)।

[৭১৪] জামিউ আহকামিন নিসা (১/১৮০)।

[৭১৫] বুখারী (১৬৫০)।

[৭১৬] এটা শাইখুল ইসলাম তার ফতওয়ার মধ্যে উল্লেখ করেছেন (২১/৪৫৯)।

পবিত্র। তাছাড়া সিজদায়ে তিলাওয়াত সালাতের ন্যায় নয়। ইমাম যুহ্‌রী ও ক্বতাদাহ 'মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাক' (১/৩২১) এ এভাবেই উল্লেখ করেছেন।[৭১৭]

৩। মাসহাফ (কুরআন) স্পর্শ করা:

হায়য অবস্থায় মাসহাফ স্পর্শ করা নিষেধ মর্মে কোন স্পষ্ট প্রমাণ আমরা অবগত হতে পারি নি। যদিও অধিকাংশ বিদ্বান হায়য অবস্থায় মাসহাফ স্পর্শ বৈধ মনে করেন না। পূর্বে এ ব্যাপারে অলোচনা করা হয়েছে।

৪। ঋতুবতী মহিলার কোলে মাথা রেখে পুরুষের কুরআন তিলাওয়াত:

আয়িশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেন:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ»

অর্থাৎ: আমি ঋতুবতী থাকা অবস্থায় রাসূল (ﷺ) আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন পাঠ করতেন।[৭১৮]

৫। দুই ঈদের সালাতে উপস্থিত হওয়া:

ঋতুবতী মহিলাদের জন্যে ঈদগাহে যাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে তারা সালাত থেকে বিরত থাকবে। রাসূল (ﷺ) বলেন:

«يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ، وَالحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى»

অর্থাৎ: যুবতী, পর্দানশীল ও ঋতুবতী মহিলারা বের হবে এবং কল্যাণ কাজ ও মুমিনদের দু'আয় অংশ গ্রহণ করবে। অবশ্য ঋতুবতী মহিলা সালাত থেকে দূরে থাকবে।[৭১৯]

৬। মাসজিদে প্রবেশ করা:

এ ব্যাপারে উলামাদের মাঝে বেশ মতানৈক্য বিদ্যমান। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই হয়েছে।[৭২০] তবে মোট কথা হলো, ঋতুবতী অবস্থায় মাসজিদে প্রবেশ করা যাবে না মর্মে কোন সহীহ দলীল আমরা অবগত হতে পারি নি। আর মূলনীতি হলো, নিষেধজ্ঞা না পাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা কাজ বৈধ। এছাড়াও এরূপ ক্ষেত্রে মহিলারা সর্বদা আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনার সুযোগ পাবে।

৭। ঋতুবতী মহিলার সাথে স্বামীর আহার ও পানাহার:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ»

---

[৭১৭] "জামেউ আহকামিন নিসা" (১/১৭৪)।

[৭১৮] বুখারী (৭৫৪৯), মুসলিম (২৪৬ পৃ.) প্রভৃতি।

[৭১৯] বুখারী অনেক স্থানে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে একটি নম্বর হল (৩২৪)।

[৭২০] গোসল অধ্যায়ের শেষে।

আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত: আমি ঋতুবতী অবস্থায় পানি পান করতাম। অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) কে অবশিষ্টটুকু প্রদান করলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম, তিনিও পাত্রের সেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড় খেতাম । অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) কে তা প্রদান করলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে খেতাম, তিনিও ঠিক সেখানে মুখ লাগিয়ে খেতেন।[৭২১]

৮। ঋতুবতী মহিলার স্বামীর খেদমত:

যেমন: স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া, চুল আঁচড়িয়ে দেয়া, কোথাও বের হওয়ার সময় স্বামীকে প্রস্তুত করে দেয়া।

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি হায়য অবস্থায় রাসূল (ﷺ) এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম।[৭২২]

৯। ঋতুবতী মহিলার স্বামীর সাথে একই লেপের মধ্যে ঘুমানো:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، قَالَ: «أَنُفِسْتِ» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ

উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল (ﷺ) এর সাথে একই চাদরের নীচে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার হায়য দেখা দিলে আমি চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে হায়যের কাপড় পড়ে নিলাম। তিনি বললেন, তোমার কি নিফাস দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর সাথে চাদরের ভেতর শুয়ে পড়লাম।[৭২৩]

ইমাম নাববী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় শারহে মুসলিমে (১/৯৫৪) বলেন, "এ হাদীস ঋতুবতী মহিলার স্বামীর সাথে একই বিছানায় ঘুমানোর বৈধতা নির্দেশ করে"।

নিফাস বা প্রসবোত্তর রক্তস্রাব (دام النفاس)

নিফাসের সংজ্ঞা: নিফাস হলো, সন্তান প্রসবের কারণে নারীর যৌনাঙ্গ দিয়ে নির্গত রক্ত।

১। নিফাসের সময়সীমা:

নিফাসের সর্বনিম্ন কোন সীমা নেই। সকল ইসলামী বিদ্বানের মতে,[৭২৪] চল্লিশ দিনপূর্ণ হওয়ার আগেই যদি কোন নারী নিফাস থেকে পবিত্র হয়, তাহলে সে গোসল করার মাধ্যমে সালাত আদায় ও স্বামীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হতে পারবে।

কোন নারীর নিফাসের রক্ত যদি চলমান থাকে, এ ব্যাপারে অধিকাংশ আলিমের অভিমত হলো, নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশ দিন। এরপর গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে। তাদের দলীল হিসেবে উম্মে সালামার হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

---

[৭২১] মুসলিম (৩০০), আবূ দাউদ (২৫৯), নাসাঈ (১/৫৬), ইবনে মাজাহ (৬৪৩), আর وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ এর অর্থ, আমি আমার দাঁত দ্বারা গোস্ত কামড় দিয়ে ধরতাম।

[৭২২] বুখারী (২৯৫), মুসলিম (২৯৭)।

[৭২৩] বুখারী (২৯৮), মুসলিম (২৯৬) প্রভৃতি।

[৭২৪] ইমাম তিরমিযী তার সুনান গ্রন্থে সংকলন করেছেন (১/৪২৯)।

Contents

كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا – أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً-

অর্থাৎ: রাসূল (ﷺ) এর যামানায় মহিলারা নিফাসগ্রস্ত হওয়ার পর ৪০ দিন বা ৪০ রাত অপেক্ষা করতেন।[৭২৫]

২। সকল উলামার ঐক্যমতে, হালাল, হারাম, মাকরূহ ও বৈধ (মানদূব) এর ক্ষেত্রে নিফাসগ্রস্ত মহিলার হুকুম হায়যগ্রস্ত মহিলার মতই।[৭২৬]

৩। ইদ্দত গণনার ক্ষেত্রে নিফাস হায়য থেকে আলাদা, কেননা এ দ্বারা ইদ্দত গণনা হয় না। কারণ ইদ্দত সমাপ্ত হয় সন্তান প্রসবের মাধ্যমে।[৭২৭]

ইস্তিহাযা বা রোগজনিত রক্তস্রাব (دام الإستحاضة)

ইস্তিহাযার সংজ্ঞা: হায়য ও নিফাসের সময় ছাড়া অন্য সময় কিংবা উভয় অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট রক্তস্রাবকে ইস্তিহাযা বলা হয়। এটা তাদের অভ্যাসগত, প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগত রক্ত প্রবাহ নয়। বরং এটা বিচ্ছিন্ন রক্তপাত। এটি লাল বর্ণের প্রবাহিত রক্ত যা সুস্থ হওয়া ছাড়া বন্ধ হয় না।[৭২৮]

হুকুম: সকল উলামার ঐক্যমতে, এ অবস্থায় সে নারী পবিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। এটা তাকে সালাত ও সিয়াম আদায়ে বাধা দিবে না।

ইস্তিহাযার সময়সীমা:

হায়য ও নিফাসের নির্ধারিত সময়ের বাহিরে এবং এ দু'অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন রক্ত নির্গত হলে তাতে কোন সমস্যা নেই।

যখন এ নির্গত রক্ত হায়য ও নিফাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে, তখন কি করতে হবে?

এর উত্তরে আমরা বলব, এ ধরনের নারী নিম্নোক্ত চার অবস্থার বাইরে হবে না। যথা-

১। ইস্তিহাযার পূর্বের ঋতুস্রাবের একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা তার জানা থাকবে। এ অবস্থায় সেই পরিচিত সময়সীমাটাই তার ঋতুস্রাবের সময় হিসেবে গণ্য করবে। এরপর সে গোসল করার মাধ্যমে সালাত আদায় করবে, এ ছাড়া বাকী সময়টা ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে।

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْآنَ دَمًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»

অর্থাৎ: আয়িশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেন, একদা উম্মে হাবীবা রাসূল (ﷺ) কে প্রদরের রক্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। আয়িশা বলেন: তার অবস্থা ছিল এই যে, আমি তার রক্তে বিরাট পানির পাত্রটি রঞ্জিত

---

[৭২৫] আবূ দাউদ (৩১১), তিরমিযী (১৩৯), ইবনে মাজাহ (৬৪৮), হাদীসটি হাসান হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো, তা যঈফ। আল্লাহই ভাল জানেন। তবে এর উপর আমল চালু রয়েছে

[৭২৬] শাওকানী প্রণীত নাইলুল আওতার (১/২৮৬)।

[৭২৭] ইবনে কুদামাহ প্রণীত আল মুগনী (১/৩৫০)।

[৭২৮] এটাকে রক্তক্ষরণ (Bleeding) বলা হয়।

www.waytojannah.com

দেখেছি। রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন: যে কয়দিন তোমার ঋতু থাকে সে কয়দিন অপেক্ষা কর। অতঃপর গোসল করে সালাত আদায় কর।[৭২৯]

২। ইস্তিহাযার পূর্বে তার ঋতুস্রাবের সময়সীমা জানা থাকবে না। কিন্তু ঋতুস্রাবের রক্তকে ইস্তিহাযার রক্ত থেকে আলাদা করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের রক্তের প্রতি লক্ষ রেখে সালাত ছেড়ে দিবে এবং এটা শেষ হলে পুনরায় গোসল করার পর সালাত আদায় করবে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ. أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «لَا. إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»

আয়িশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ফাতিমা বিনতে হুবাইশ রাসূল (ﷺ) এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল আমি একজন ইস্তেহাযা বা প্রদর রোগগ্রস্তা নারী। কখনও এ রোগ থেকে মুক্ত হই না। তাই আমি কি সালাত আদায় করা ছেড়ে দিব? রাসূল (ﷺ) বললেন, না। এটা হায়য নয়, বরং এটি শিরা নিঃসৃত রক্ত। তাই যখন হায়য দেখা দিবে তখন শুধু সালাত ছেড়ে দেবে। আর যখন হায়য ভাল হয়ে যাবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলে গোসল করে পবিত্র হয়ে সালাত আদায় করবে।[৭৩০]

৩। এমন নারী, যে সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে তার কখনও ঋতুস্রাব হয় নি। যার কারণে সে ঋতুস্রাবের রক্তকে অন্য রক্ত থেকে আলাদা করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ নারীর অবস্থার উপর ভিত্তি করবে। তারা যদি প্রতিমাসে ছয়দিন বা সাত দিন ঋতুবতী হয়, তাহলে তার হায়যের শুরু থেকে ঐ ছয়দিন বা সাতদিন হায়য হিসেবে গণ্য করবে। এরপর সে গোসল করার মাধ্যমে পবিত্র হবে। এ ছাড়া অনিয়মিতভাবে যে রক্ত নির্গত হবে, তা মুস্তাহাযা হিসেবে গণ্য হবে।
যেমন বর্ণিত হয়েছে, নাবী (ﷺ) হামনা বিনতে জাহ্‌শকে বলেছিলেন:

«إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ، وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ

অর্থাৎ: এটা শয়তানের চক্রান্ত। কাজেই তুমি প্রতি মাসে ছয় বা সাত দিনের জন্য তোমার হায়যের নির্ধারিত দিন গণনা করবে, অতঃপর গোসল করবে এবং তুমি যখন বুঝতে পারবে যে, তুমি উল্লেখিত দিনগুলো অতিক্রম করে পবিত্রতা অর্জন করেছ- তখন তুমি প্রত্যেক মাসের ২৩/২৪ দিন নিয়মিতভাবে সালাত আদায় করবে এবং সিয়াম পালন করবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তুমি প্রত্যেক মাসে এরূপ করবে- যেরূপ অন্যান্য মহিলারা হায়য হতে পবিত্রতা অর্জনের পর করে থাকে।[৭৩১]

---

[৭২৯] সহীহ; মুসলিম (২৬৪ পৃ.–আব্দুল বাকী) আবূ দাউদ (২৭৯), নাসাঈ (১/১১৯)।

[৭৩০] সহীহ; বুখারী (২২৮), মুসলিম (২৬২ পৃ.) প্রভৃতি।

[৭৩১] আবূ দাউদ (২৮৭), ইমাম শাফেঈ প্রণীত "আল উম্ম (১/৫১), ইবনে মাসাহ (৬২২), ইমাম তিরমিযী তহারাত অধ্যায়ে (অধ্যায় ৯৫), সনদ (لين) লাইয়িন, ইরওয়া গ্রন্থে আলবানী এটাকে হাসান বলেছেন (২০৫)।

www.waytojannah.com

Contents

। এমন নারী যে ঋতুস্রাবের অভ্যাসগত সময়সীমা ভুলে গেছে এবং হায়যের রক্তকে ইস্তিহাযার রক্ত কে আলাদাও করতে পারে না।[৭৩২] এ ধরনের নারীর ব্যাপারে উলামাদের বেশ কয়েকটি অভিমত য়েছে। তার মধ্যে অধিক স্পষ্ট অভিমত হলো, তার হুকুম পূর্বোল্লেখিত নতুন ঋতুবতী নারীর হুকুমের ায়, যে রক্তকে আলাদা করতে শিখে নি। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ইস্তিহাযার বিধান (أحكام المستحاضة)

। ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর বিধান পবিত্র নারীর বিধানের মত। সুতরাং ঋতুবতী নারীর উপর যা হারাম, তার পর তা হারাম হবে না।

২। ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারী পবিত্র নারীর মতো সালাত, সিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন স্পর্শ, সাজদায়ে তিলাওয়াত, সাজদায়ে শুকুর প্রভৃতি কাজ করবে। এ ব্যাপারে উলামাদের ইজমা রয়েছে।

৩। ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর জন্যে প্রত্যেক সালাতে ওযূ আবশ্যক নয়, যতক্ষণ না ওযূ ভঙ্গ হয়। কেননা এ সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য প্রমাণগুলো দুর্বল পর্যায়ের।[৭৩৩] তবে আয়িশা সিদ্দীকা বর্ণিত হাদীস মতে, প্রতি সালাতে ওযূ ও গোসল করা ভাল। তিনি (আয়িশা) বলেন, উম্মে হাবীবা ৭ বছর যাবৎ ইস্তিহাযা রোসে ভুগছিলেন। ফলে তিনি রাসূল (ﷺ) কে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে গোসল করার নির্দেশ দেন। অতঃপর বললেন, এটি শিরা নিঃসৃত রক্ত। ফলে তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করতেন।[৭৩৪]

৪। হায়যের সময় ব্যতীত ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর জন্যে তার স্বামীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া বৈধ। যদিও রক্ত নির্গত হওয়া অব্যাহত থাকে। এটাই অধিকাংশ উলামার অভিমত।[৭৩৫]

৫। ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর জন্যে মাসজিদে ইতিকাফ বৈধ।

«اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي»

আয়িশা সিদ্দীকা বলেন: রাসূল (ﷺ) এর সাথে তাঁর কোন এক স্ত্রী ই'তিকাফ করছিলেন। তিনি রক্ত ও হলদে পানি বের হতে দেখতেন আর তার নীচে একটা পাত্র বসিয়ে রাখতেন এবং সে অবস্থায় সালাত আদায় করতেন।[৭৩৬]

ইমাম নাববী শারহে মুসলিমে (পৃ.১/৬৩১) বলেন, এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারীর ই'তিকাফের বিধান পবিত্র নারীর মতই।

---

[৭৩২] বিদ্বানগণ এ সব নারীকে মুতাহায়্যিরাহ (المتحيرة) নামে অবহিত করেছেন।

[৭৩৩] জামিউ আহকামিন নিসা (১/২৩০)।

[৭৩৪] বুখারী (৩২৭), মুসলিম (২৬২) প্রভৃতি।

[৭৩৫] আল মাজমূ' (২/৩৭২), আল-মুগনী (১/৩৩৯)।

[৭৩৬] বুখারী ৩১০,আ.ধু.২৯৯,ই.ফা.৩০৪।

www.waytojannah.com

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য :

১। দরিদ্র ও দুঃস্থ জনসাধারণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান।
২। ইসলামের মৌলিক আদর্শের প্রচার ও গবেষণা করা।
৩। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় সহযোগিতা দান।
৪। ইসলামী বই পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা।
৫। ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা ।
৬। দারিদ্র্যতা দূরীকরণে সহযোগিতা করা।
৭। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।
৮। একই উদ্দেশ্য সম্বলিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা, সহযোগিতা, সমন্বয় ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা।

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত বইসমূহ

১. মুসলিম জাতির প্রতি মহাউপদেশ- ইমাম ইবনে তাইমিয়া
২. যাকাতুল ফিতর- শাইখ সালিহ আল উসাইমীন
৩. নতুন চাঁদের বিতর্ক সমাধান-সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন
৪. সহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড (১ম পর্ব)-আবূ মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম

যোগাযোগঃ

ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ

নির্বাহী পরিচালক

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন

মোবাইল:০১৯১২০০৫১২১

صَحِيحُ
فِقْهُ السُّنَّةِ

وَأَدِلَّتُه وَ تَوْضِيْحُ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ

الجزء الأول (القسم الأول)

أعده أبو مالك كمال بن السيد سالم

مع تعليقات فقهية معاصرة

فضيلة الشيخ/ ناصر الدين الألباني

فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين

الترجمة: معين الإسلام (معين)

المراجعة: د. محمد عبد الرشيد

বইটির বৈশিষ্ট্য :

- এটি কোন মাযহাব ভিত্তিক ফিক্বহ গ্রন্থ নয়।
- এটি বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক ফিক্বহ গ্রন্থ।
- এতে মুজতাহিদ ইমামগণের মতামত উল্লেখ করে অধিকতর বিশুদ্ধ মতামতটি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

পরিবেশনায় : ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী